হিমালয়-ভ্রমণ।

পরিব্রাজক-শ্রীশুদ্ধানন্দব্রহ্মচারী

কর্ত্তৃক

বিরচিত ও প্রকাশিত।

১৯৫।১ নং কর্ণওয়ালিস্ষ্ট্রীট্ শ্রীদেবকীনন্দন যন্ত্রালয়ে
শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

কলিকাতা।

১৩১৯ সাল।

মূল্য ১৲ একটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—এ, এল, বোস এণ্ড কোং
৭৪ নং মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রীট্, বড়বাজার পোঃ অঃ
কলিকাতা।



শ্রী১০৮ শ্রীমৎ পরমহংস যোগাচার্য্য সত্যানন্দ স্বামীজিউ মহারাজ

Engraved & Printed by K. V. Seyne & Bros.

ওঁ

তৎসৎ।

উৎসর্গ পত্র।



পরমারাধ্যতম পূজ্যপাদ গুরুদেব যোগাচার্য্য—

শ্রী১০৮ শ্রীমৎপরমহংস সত্যানন্দস্বামী জিউ মহারাজ,

শ্রীশ্রীচরণসরোজেষু।

বাবা!

শ্রীশ্রীচরণাশ্রিত হতভাগ্য সেবকাধম-বিরচিত এই ভক্তি বিহীন "হিমালয়-ভ্রমণ" পুষ্পাঞ্জলি শ্রীশ্রীচরণসরোজে অর্পিত হইল, এই প্রার্থনা যেন শ্রীশ্রীচরণ কৃপা ও আশীর্ব্বাদ বলে নরাধম সর্ব্ব বাসনা মুক্ত হইয়া অন্তে শ্রীশ্রীপাদপদ্মে স্থান পাইবার উপযুক্ত হয়। ইতি।

শ্রীশ্রীচরণাশ্রিত—

হতভাগ্য সেবকাধম—

শ্রীশুদ্ধানন্দ।

ভূমিকা।

বহুকাল পূর্ব্বে শ্রীযুত জলধর সেন মহাশয় প্রণীত "হিমালয়" পাঠ করিয়া হিমালয় ভ্রমণ ও হিমালয় খণ্ডস্থ সমস্ত তীর্থাদি দর্শন করিবার প্রবল বাসনা হয়। চড়াই উৎরাই সম্বন্ধে শ্রীযুতসেন মহাশয়ের মন্তব্যাদি পাঠে হৃদয়ের উদাম উৎসাহ অনেকটা ক্ষীণ হইয়া আসিলেও প্রায় সকল সময়েই আর্য্য ঋষিগণের সাধন ভজনের স্থান, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণের অলৌকিক কার্য্যাবলী ও কলিযুগের শ্রীশ্রী৺শিবাবতার নিখিলজনগণ-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্রী১১০৮ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য জগদগুরু শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য স্বামীজিউ মহারাজ প্রতিষ্ঠিত কীর্ত্তিমালার দর্শন লালসা সুগভীর অবসাদের মধ্যেও হৃদয়কে কৌতূহল ও আবেগপূর্ণ করিয়া রাখিত, তদনন্তর যখন পরমারাধ্যতম পূজ্যপাদ শ্রী১০৮ শ্রীমদগুরুদেব পরমহংস যোগাচার্য্য শ্রীমৎ সত্যানন্দ স্বামীজিউ মহারাজের শ্রীশ্রীচরণ সরোজে স্থান প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারই কৃপাবলে আশ্রমোচিত নিয়মাবলীর শিক্ষা গ্রহণ করি, তখন পূর্ব্বের বাসনা ঘৃত-পুষ্ট হুতাশনের ন্যায় প্রবলতর হইয়া উঠে। তখন হইতে সদাসর্ব্বদা মনে এই ভাব জাগিয়া উঠিত যে, শ্রীশ্রীগুরু কৃপায় কবে আমার এমন সুদিন আসিবে, যে সময় আমি হিমালয় দেশস্থ সমস্ত প্রসিদ্ধ স্থানাদি ও পূর্ব্বতন পিতৃপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপাদি দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিতে সমর্থ হইব। অবশেষে একদিন সুসময় আসিল। কিন্তু বিশ্ব নিয়ন্তা আমাকে সেই সুসময়টী সুখ শান্তির সহিত উপভোগ করিতে দিলেন না। বিগত ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ১৯শে মাঘ মঙ্গলবার শ্রী৺শ্রীমৎগুরুদেব মহারাজ অকালে ও অসময়ে হতভাগ্য শিষ্যগণকে অকুল সমুদ্রতলে নিমজ্জিত করিয়া স্বেচ্ছায়

সমাধি গ্রহণ করিলে আমি দিশাহারা পথিকের মত অত্যন্ত উন্মনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া যাই। সেই সময়ে তাঁহারই কৃপায় হৃদয়ের আভ্যন্তরীন প্রদেশ হইতে কে যেন বলিয়া দিতে লাগিল 'যাও বৎস তুমি যাঁহাদের বংশধর তাঁহাদের প্রাচীন কীর্ত্তিমালা ও সমসাময়িক মহাত্মাগণের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দর্শন করিয়া আইস, তথায় নিত্য নূতন নূতন স্থানাদির দর্শনলাভে এবং সৎসঙ্গ প্রভাবে মনে নব নব আশার উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়াদির দ্বারা পরিশেষে আপন লক্ষ্য এবং কর্ত্তব্য কি তাহাও স্থির হইয়া যাইবে।' উক্ত আদেশের বশবর্ত্তী হইয়া হিমালয় দর্শন মানসে হিমালয় প্রবেশ-দ্বার শ্রীশ্রীহরিদ্বার ধামে যাইয়া উপস্থিত হই। তথায় কিছুকাল অবস্থানের পর শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র পুরিধামস্থ কড়ারাশ্রম স্বামী শ্রীমৎ স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজিউ মহারাজের শিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে একদল হিমালয় দর্শনকারির সহিত মিলন হয়। উক্ত সম্প্রদায়ের প্রধান শ্রীযুত নটবর দত্ত মহাশয় আমার আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আমাকে সম্পূর্ণ হিমালয় ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপি বদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিতে উপদেশ দেন ও উৎসাহিত করেন এবং কথোপকথনচ্ছলে বলেন যে, এযাবত হিমালয় সম্বন্ধীয় যত প্রকার ভ্রমণ. বৃত্তান্ত সাধারণে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে কেহ কেবল মাত্র শ্রীশ্রীহরিদ্বার ধাম হইতে রওনা হইয়া শ্রীশ্রীবদরিকাশ্রম দর্শন ও তথা হইতে পুনরায় উক্তধামে ফিরিয়া আসিয়াছেন, কেহবা শ্রীশ্রীকেদারনাথ পুরি ও শ্রীশ্রীবদরিকাশ্রম দেখিয়া কাঠ গুদাম বা রামনগর দিয়া ফিরিয়াছেন, আবার কেহবা কেবলমাত্র শ্রীগঙ্গোত্তরী দর্শন করিয়া সেইটুকথানি বর্ণন করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা হিমালয়স্থ সমস্ত প্রসিদ্ধ স্থানাদি দেখিতে চাহেন তাঁহারা

উপরি উক্ত ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রভৃতি পাঠ করিয়া সমস্ত স্থানের বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারেন না, এই সকল অভাব দুরীকরণ মানসে শ্রীশ্রীহরিদ্বার ধাম হইতে শ্রীশ্রীবদরিকাশ্রম, শ্রীশ্রী কেদারনাথপুরি, শ্রীশ্রীগঙ্গোত্তরি, শ্রীশ্রীযমুনোত্তরি, শ্রীশ্রী তুঙ্গনাথ, শ্রীশ্রীত্রিযুগীনারায়ণ, শ্রীশ্রীবুড়াকেদারনাথ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ-ধাম, শ্রীপরাশরাশ্রম শ্রীবশিষ্ঠাশ্রম প্রভৃতি আর্য্য ঋষিদের আশ্রম ও গুহা ইত্যাদির বিবরণ, প্রত্যেক স্থানের দূরত্ব, পথের অবস্থা, বাসপোযোগী চটীর দূরত্ব, আহার্য্য দ্রব্যাদি এবং সর্ব্ব-প্রকার ভোজন ও রন্ধন, পাত্রাদির সরবরাহ,পানীয় জলের ব্যবস্থা, চড়াই উথরাই সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ, হিমালয়বাসীর আচার, ব্যবহার, চরিত্র, সমাজনীতি, ব্যবহার নীতি ইত্যাদি এবং সমস্ত স্থানের বহিরাভ্যন্তরীন অবস্থা ও দুর্দ্দশা প্রভৃতি সমস্ত বিষয় আমার দৈনিক ডায়েরি সহ 'হিমালয় ভ্রমণ' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে একটী প্রধান অভাব মোচিত হইতে পারে; তদনুযায়ী এই পুস্তক রচিত ও প্রকাশিত হইল। এই পুস্তক পাঠে পাঠকবৃন্দের যদি হিমালয় দর্শন করিবার প্রবৃত্তি হয় ও দর্শনকারীগণ কিছুমাত্রও উপকার বোধ করেন এবং যদি কেহ তদভ্যন্তরীন অভাব অভিযোগাদির দূরীকরণে যত্নপর হন তাহা হইলে আমার সকল শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

পরিশেষে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে জ্ঞাপন করিতেছি যে, যাঁহাদের অর্থানুকুল্যে ও উৎসাহে আমার এই পুস্তক খানি সর্ব্বসাধারণে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম আমি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম। আমার পরম শুভানুধ্যায়ী মনীষী বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ও বর্ত্তমান তাহিরপুর রাজকুমারের শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল মহাশয় এবং কলিকাতা মহাকালীপাঠশালার সুযোগ্য তত্ত্বাবধায়ক, বিখ্যাত

সোম-প্রকাশপত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও সাধু-সম্বাদ পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন চৌধুরী কবিভূষণ বি, এ, মহাশয় এই পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত বিশেষ যত্ন সহকারে সংশোধন করিয়া দিয়া আমাকে অত্যন্ত উপকৃত করিয়াছেন। আমার পরম হিতাকাঙ্খী শেষোক্ত সহৃদয় সুহৃৎ পরহিতৈষী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন বাবু পাঠশালার কার্য্যে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও অতি যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে ইহার প্রূফ্ সংশোধন কার্য্যে ও প্রভুত সাহায্য করিয়াছেন। সে জন্য তাঁহাদের উভয়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা পূর্ণ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে এই পুস্তকের উপসত্ব, পুস্তকখানি যাঁহারই শ্রীশ্রীচরণে উৎসর্গীকৃত তাঁহারই কার্য্যে ব্যায়িত হইবে। ইত্যলম্।

কলিকাতা ১৩১৯
২১শে আষাঢ় শ্রীশুদ্ধানন্দ।
শুক্রবার।

সূচীপত্র।

প্রথমখণ্ড। (দৈনিকডায়েরি)। ২—৭৯

—পাণ্ডুকেশ্বরবা যোগবদরী—শেষধারা—হনুমানচটী—ঋষিপ্রয়াগ—শ্রীশ্রী৺বদরিপুরি বা বদরিকাশ্রম—জ্যোতিঃদর্শন—কপালমোচন—বসুধারা—সত্যপথ—স্বর্গারোহণ—অলকাপুরী—কৈলাসপর্ব্বত—মানসসরোবর--আদিবদরি---মেইলচোরী--চৌখুটিয়া--রানীক্ষেত—ভীমতাল—নাইনীতাল প্রভৃতি প্রসিদ্ধতীর্থ ও প্রধান প্রধান স্থানের বিশেষ বিবরণ ও হরিদ্বার হইতে বদরিকাশ্রম পর্য্যন্ত ও কর্ণপ্রয়াগ হইতে কাঠগুদাম পর্য্যন্ত প্রধান প্রধান স্থানের ও সমস্ত বিশেষ বিবরণ।

দ্বিতীয়খণ্ড। (দৈনিক ডায়েরি)। ৬—৮০

শ্রীগোপেশ্বর—শ্রী৺অনসূয়াদেবী—শ্রী৺তুঙ্গনাথ—মুখীমঠ—উখীমঠ—৺মধ্যমেশ্বরনাথ—গুপ্তকাশী—অগস্ত্যাশ্রম---নালাচটী—নারায়ণস্থান--কালীমঠ—মৈখণ্ডা-শ্রীত্রিযুগীনারায়ণ—শোনকপ্রয়াগ—-মুণ্ডকাটাগণেশ—--গৌরীকুণ্ড—-চিরবাসাভৈরব—ভীমসেন—শ্রীশ্রীকেদারনাথপুরি—ভৃগুপতন--মহাপথ প্রভৃতি প্রসিদ্ধতীর্থেরও প্রধান প্রধান স্থানের বিশেষ বিবরণ ও এতন্মধ্যস্থ চটীর দুরত্ব ও বিশেষ বিবরণ।

তৃতীয়খণ্ড। দৈনিক ডায়েরি ১০৭—১৬১

পোঁমালী—শ্রী৺বুড়াকেদারনাথ—বশিষ্ঠাশ্রম—ভাটোয়ারি বা ভাস্করপ্রয়াগ—পরাশরাশ্রম—ঋষিকুণ্ড—হরশিলা—মুখুবা--ধরালী মার্কণ্ডেয়াশ্রম—ভৈরবঝুলা--নীলাংমঠ—শ্রীগঙ্গোত্তরি—গোমুখী—উত্তরকাশীধাম—বারণাবত—বিমলেশ্বর—-বরুণেশ্বর—- ডুণ্ডাতাল থর্শালী—যমুনোত্তরি—গঙ্গানী—প্রতাপনগর—টিহরি—কানাতাল বরখেত-মসূরি-রাজপুর-দেরাদুন প্রভৃতি প্রসিদ্ধতীর্থ ও প্রধান প্রধান স্থানের বিশেষ বিবরণ ও তন্মধ্যস্থচটীর দুরত্ব ও বিশেষ বিবরণ।

চতুর্থ খণ্ড।

বা

পরিশিষ্ট।

হিমালয় প্রবেশ দ্বার হইতে বহির্গমন পর্য্যন্ত প্রধান প্রধান স্থানের দূরত্ব।

হরিদ্বার হইতে বরাবর বদরিকাশ্রম	১৮১	মাইল
” ” রুদ্রপ্রয়াগ হইয়া কেদারনাথ	১৪৪	”
” ” দেবপ্রয়াগ হইয়া গঙ্গোত্তরি	১৯১	”
” ” ” যমুনোত্তরি	১৮৩	”
” ” দেরাদুন হইয়া গঙ্গোত্তরি	১৮৬	”

		মাইল	
হরিদ্বার হইতে দেরাদুন হইয়া যমুনোত্তরি		১৫৮	”
যমুনোত্তরি হইতে উত্তরকাশী হইয়া গঙ্গোত্তরি		৯৩	”
গঙ্গোত্তরি” হইতে ভাটোয়ারি ও বুড়কেদার হইয়া কেদারনাথ		১২০	”
কেদারনাথ হইতে তুঙ্গনাথ হইয়া বদরিকাশ্রম		৯৭	”
বদরিকাশ্রম হইতে কাঠগুদাম		১৬১	”
” ” ”	রামনগর	১৭৩	”
” ” ”	শ্রীনগর হইয়া কোটদ্বার রেলওয়ে	১৫৯	”
হরিদ্বার ”	দেবপ্রয়াগ	৫৮	”
” ”	রুদ্রপ্রয়াগ	৯৫	”
” ”	কর্ণপ্রয়াগ	১১৪	”
বদরিকাশ্রম হইতে কর্ণপ্রয়াগ		৬৭	”
কর্ণপ্রয়াগ হইতে কাঠগুদাম		৯৪	”
” ”	রামনগর	৯৬	”

হরিদ্বার হইতে বদরিকাশ্রম পর্য্যন্ত চটীর নাম ও দূরত্ব ১৮১ মাইল।

চটীর নাম।		মাইল।
(ঝ) হরিদ্বার	(ক) (গ) (ঘ) (জ) (ঝ) (ট)	—
রায়বালা	(ক) (খ) (গ) (ঝ)	৬
(ঝ) সত্যনারায়ণ	(ক) (খ) (গ)	৭
(ঝ) হৃষিকেশ	(ক) (গ) (জ) (ঝ) (ট)	১৪
(ঝ) লছমন ঝুলা	(ক) (খ) (গ)	১৭
(ঞ) ফুলবাড়ী		২১

চটীরনাম		মাইল
গুলর চটী	(খ) (ঞ)	২৩
মোহনা ”	(ক) (ঙ) (ঝ)	২৬
ছোট বিজনী	(চ) (ঞ)	২৭॥০
বড় ”	(গ) (চ) (জ) (ঞ)	২৯
কুণ্ড চটী	(ছ) (ঞ)	৩২
বাঁদরমায়ি	(ঙ) (ঞ)	৩৫
মহাদেব	(ক) (গ) (জ) (ঞ)	৩৮
রামচটী	(চ)	৪২
মারু ”	(চ)	৪৩
কাণ্ডী চটী	(গ) (চ) (ছ) (ঞ)	৪৫
ব্যাসঘাট জংসন	(ক) (খ) (গ) (ঝ)	৪৮
ছালুড়ী		৫১
উমরাসু		৫৪
সৌর চটী	(খ)	৫৬॥০
দেবপ্রয়াগ জংসন	(ক) (খ) (গ) (জ) (ঝ) (ট)	৫৮
রাণীবাগ	(জ)	৬৫
রামপুর		৬৮
বিল্লকেদারজংসন	(খ)	৭৩
শ্রীনগর জংসন	(ক) (গ) (ঘ) (জ) (ঝ) (ট)	৭৬
সুকরতা	(ট)	৮০
মহারাজ		৮১॥০
ভট্টীছিড়া	(গ) (ঙ) (ছ) (জ)	৮৩॥০
খাঁখরা	(ঙ) (ছ)	৮৭
নরকোটা	(ঙ) (ছ)	৯০
গুলাবরাই		৯৩

চটিরনাম		মাইল
উদীস	(চ)	১৬২
সিঙ্গুধার জংসন	(চ)	১৬৩
শ্যামাচটী		১৬৪
যোশীমঠ জংসন	(গ) (ঘ) (চ) (ছ) (জ) (ঝ) (ট)	১৬৪
বিষ্ণুপ্রয়াগ	(খ)	১৬৫
বলদোড়া	(ক) (খ) (ঝ)	১৬৬
ঘাটচটী		১৬৯
পাণ্ডুকেশ্বর	(ক) (গ) (ঝ)	১৭১
শেষধারা	(ক) (খ) (জ) (ঝ)	১৭১৷৹
লামবগড়	(ক) (খ)	১৭৪
হনুমান চটী	(ক) (খ) (ঙ)	১৭৭
শ্রীবদরিকাশ্রম	(ক) (খ) (গ) (ঘ) (চ) (জ) (ঝ) (ট)	১৮১

হরিদ্বার হইতে রেলপথে দেরাদুন হইয়া গঙ্গোত্তরি ১৮৬ মাইল।

নাম।		মাইল।
হরিদ্বার জংসন	(ক) (গ) (ঘ) (জ) (ঝ) (ট)	—
দেরাদুন রেলপথে	(ক) (গ) (ঘ) (জ) (ঝ) (ট)	৪৮
রাজপুর	(ক) (গ) (ঘ) (ঙ) (জ) (ট)	৫৫
মসূরি	(ক) (গ) (ঘ) (চ) (ছ) (জ) (ঝ) (ট)	৬২
ঝালকী	(ক) (চ)	৬৯
ধনোটী	(ক) (গ) (চ) (জ)	৭৮
কানাতাল	(ক) (গ) (চ) (ছ) (ঝ)	৮৭
ভাড়লান জংসন	(ক) (খ)	৯৬
ছাম	(ক) (জ)	১০৪

চটীরনাম		মাইল
নগুনা	(ক)	১০৭
ধরাসু জংসন	(ক) (খ) (গ) (জ) (ঝ)	১১২
ডুণ্ডা	(ক)	১২১
উত্তরকাশী জংসন	(ক) (খ) (গ) (জ) (ঝ) (ট)	১৩০
নেতালা		১৩৬
মানেরি	(ক)	১৪০
ভাটোয়ারি জংসন	(ক) (খ) (জ) (ঝ)	১৪৮
ভূখী	(খ)	১৫২
গঙ্গাননী	(ক) (খ) (ঝ)	১৫৮
লোহরিনাগ	(ক) (খ) (ঙ)	১৬৩
সুখীঝালা	(ক) (খ) (চ) (জ)	১৬৮
হরশিলা	(খ) (গ) (জ)	১৭১
ধরালী	(ক) (ঝ)	১৭৩
জঙ্গলচটী	(খ) (ঙ) (জ)	১৭৬
ভৈরবঘাট জংসন	(ক) (খ) (ঙ)	১৮০
গঙ্গোত্তরি	(ক) (খ) (ঙ) (চ) (ঝ)	১৮৬
গোমুখী		২০৪

ধরাসু হইতে যমুনোত্তরী ৪৬ মাইল।

নাম		মাইল
ধরাসু জংসন	(ক) (গ) (ঙ) (জ) (ঝ)	—
ব্রহ্মখাল	(খ) (চ)	৭
গঙ্গানী	(ক) (খ)	১৯
ওজিরি	(ক) (খ) (চ)	২৮
রাণীগাঁও	(ক) (খ) (চ)	৩৪

নাম		মাইল
খর্শালি	(ক) (খ) (ঙ) (চ) (ঝ)	৪০
যমুনোত্তরি	(ক) (খ)	৪৬

যমুনোত্তরি হইতে উত্তরকাশী ৩৮ মাইল।

যমুনোত্তরি	(ক) (খ)	—
খর্শালি	(ক) (খ) (ঙ) (চ) (ঝ)	৬
ধাঙ্গর	(ক) (ঙ)	১২
উপরিকোট	(ক) (ছ)	২৮
উত্তরকাশী জংসন	(ক) (খ) (গ) (জ) (ঝ) (ট)	৩৮

রুদ্রপ্রয়াগ হইতে শ্রীকেদারনাথ পুরী ৪৯ মাইল।

ছতোলি		৪॥০
মঠচটী		৬
রামপুর		৭
অগস্ত্যাশ্রম	(খ)	১০॥০
চন্দ্রাপুরি		১৪
ভৌরী চটী		১৭
কুণ্ড ,,	(ঙ)	২০
গুপ্তকাশী	(ক) (গ) (চ) (ট)	২৩
নালা চটী জংসন	(খ)	২৪
নারায়নকোটী		২৫
ব্যুঙ্গচটী		২৭
মৈখণ্ডা	(চ)	২৯
ফাটাচটী	(ক)	৩০
বাদলপুর		৩২
রামপুর		৩৩

নাম		মাইল
ত্রিযুগী নারায়ণ জংসন	(ক) (চ) (ঝ)	৩৬
শৌনক প্রয়াগ জংসন	(খ) (ঙ) (চ)	৩৫
গৌরীকুণ্ড	(ক) (ঙ)	৪০
রামবাড়া	(ঙ)	৪৫
শ্রীকেদারনাথপুরি	(ক) (খ) (ঝ)	৪৯

নালাচটী হইতে লালসাঙ্গা ৩৩ মাইল।

চটীর নাম।		মাইল।
নালা চটী জংসন	(খ)	০
উখীমঠ	(ক) (খ) (গ) (জ) (ঝ) (ট)	৩
ব্রহ্মচটী		৬
দুর্গাচটী	(খ) (ঙ)	৮
দরিয়া	(চ)	৯
পোথিবাসা	(চ)	১১
গকুল	(চ)	১১॥০
বাণকোটী	(চ)	১৩
চৌবত্তা	(ক) (চ)	১৪॥০
শ্রীতুঙ্গনাথ	(ক) (চ) (ছ)	১৭
ভীমচটী	(ছ)	১৯
পাঙ্গরবাসা	(ক) (ছ)	২১॥০
মণ্ডল চটী	(খ)	২৫
আরাম	(ক)	২৭
রামচটী		২৮
বীরচটী	(খ)	২৯
গোপেশ্বর	(ক)	৩১
লালসাঙ্গা জংসন	(খ) (গ) (ঘ) (জ) (ট)	৩৩

ভাটোয়ারি হইতে শৌনক প্রয়াগ ৭০ মাইল।

নাম।		মাইল।
ভাটোয়ারি জংসন	(ক) (খ) (জ) (ঝ)	০
ছুনা	(ক) (চ) (ঝ)	৯
বেলক	(ছ)	১৩
পাঙ্গরানা	(ক)	১৮
ঝালা	(খ)	২৩
বুড়াকেদার	(ক) (ঝ)	২৮
টোলা	(ঙ)	৩২
ভৈরবচটী	(চ)	৩৪
ভামোটী	(চ)	৩৭
পাণিহাটী		৪১
কুড়েহান		৪৩
গুপ্ত বা রঘুনাথ	(ক) (খ)	৪৪
গোয়ানা	(ঙ)	৪৫
গোয়ানমাঢ়ে	(চ)	৪৮
দোফান্দ	(চ)	৫১
পৌমালী	(ক) (চ)	৫৪
মঙ্গু	(ছ)	৬৩
ত্রিযুগীনারায়ণ জংসন	(ক) (ছ) (ঝ)	৬৮
শৌনকপ্রয়াগ জংসন	(ঙ) (ছ)	৭০

কর্ণপ্রয়াগ হইতে কাঠগুদাম (রেলওয়ে ষ্টেসন ৯৪ মাইল।

কর্ণপ্রয়াগ জংসন	(ক) (খ) (গ) (ঘ) (ঝ) (ট)	০ (+) ১
সেমলি		৩॥০
ভটোলী		৫
আদিবদরি		৯

চৌখুটীয়া হইতে রামনগর (রেলওয়ে ষ্টেশম)

৬২ মাইল।

নাম		মাইল
বুড়াকেদার	(খ)	১২
নৌলা	(ক)	১৭
ভিখিয়াসেন	(ক) (খ)	১৯
সিরকোট		২২
বাসকোট		২৪
খেলথান	(ক)	২৭
গুজরঘটী		৩০
কর্পূর নৌলা		৩২
দেজখনার	(ক)	৩৫
গোদীর		৩৭
টোটি		৪৩
সৌরাল		৪৫
কুমারিয়া		৪৯
মৌহান		৫২
গর্জ্জিয়া		৫৬
ঢিকল	(ক)	৫৮
রামনগর	(খ) (গ) (ঘ) (জ) (ট)	৬২

দেবপ্রয়াগ হইতে টিহরি ৩৩ মাইল ও তথা হইতে ভাড়লান ১২ মাইল।

যে সব স্থানের নামের শেষে জংসন শব্দ লিখা আছে তথা হইতে অন্য একটী রাস্তা বাহির হইয়া কোন প্রসিদ্ধ স্থানে যাইয়া পৌঁছিয়াছে বা আসিয়া মিলিয়াছে।

কেদারনাথের পথে রামপুর হইতে বরাবর শৌনক প্রয়াগ ২ মাইল।

বদরিকাশ্রমের পথে সিঙ্গুধার চটী হইতে দুইটী রাস্তা বাহির হইয়াছে প্রথমটী শ্যামাচটী হইয়া দ্বিতীয়টী যোশীমঠ হইয়া বিষ্ণুপ্রয়াগে পৌঁছিয়াছে।

মুদ্রাকর প্রমাদ।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
৬—৮০	৮০—১০৬	।/০	৯
গুরুমহারজকি	গুরুমহারাজকি	২	৩
দেবতলে	দেবতল	”	১৪
১৬ই	২০শে	৪	৮
প্রাক্ষিণ	প্রদাক্ষিণ	৬	১৭
কালীবাবার	কালীকম্বলীবাবার	২২	১২
গড়বানের	গঢ়বালের	৩১	৪
”	”	ঐ	১০
”	”	ঐ	১৭
দুয়াল	দয়াল	৩২	১৬
মঠের	মাঠের	৩৮	২১

(ক) চিহ্নিত স্থানে ধর্ম্মশালা আছে।

(খ) চিহ্নিত স্থানে বা নিকটে ঝুলা বা পুল আছে।

(গ) চিহ্নিত স্থানে পোষ্টআফিস বা চিঠির বাক্স আছে।

(ঘ) চিহ্নিত স্থানে টেলিগ্রাফ্ অফিস আছে।

(ঙ) চিহ্নিত স্থানে বা পরে চড়াই আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) চিহ্নিত স্থান চড়াইর পথে বা চড়াইর উপর সমান রাস্তার উপরে স্থিত।

(ছ) চিহ্নিত স্থান হইতে উৎরাই আরম্ভ বা উৎরাইতে স্থিত কিম্বা চড়াই পর উৎরাই।

(জ) চিহ্নিত স্থানে বা নিকটে ডাকবাঙ্গলা আছে।

(ঝ) চিহ্নিত স্থানে সাধু সন্ন্যাসীর জন্য অন্নছত্র বা সদাব্রত আছে।

(ঞ) চিহ্নিত স্থানে বা নিকটে জলছত্র আছে।

(ট) চিহ্নিত স্থানে হস্‌পিটাল্ ও ঔষধালয় আছে।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
লজাস্নুচটী	লঙ্গাস্নুচটি	৪১	
গঙ্গাসাধু	গঙ্গা, সাধু	৪২	১৪
নানাচটি	নালাচটি	৪৬	২
আমোদের	আমাদের	৫৪	১৩
কর	করা	,,	১৫
সম্পূন	সম্পূর্ণ	৫৬	১
গৃহে	গাত্রে	৬৩	২২
শ্রযুত	শ্রীযুত	৭২	৫
সিন্ধুধার	সিঙ্গুধার	৭৫	২১
মোহনচোরী	মেইলচোরী	৭৭	২০
মিলিটারি	সেনিটারি	৮২	১১
কুন্ত	কুণ্ড	৮৪	৫
মদীয়	সঙ্গীয়	,,	১৯
শ্রীশ্রী৺ডুঙ্গনাথ	শ্রীশ্রী৺তুঙ্গনাথ	৮৬	১৯
হইতেছিল	হইতেছিলেন	৯১	১৭
নিবেতে	নিবিতে	৯৫	১৪
এক	একবার	৯৯	৫
স্বর্ণদ্বারি	স্বর্গদ্বারী	১০১	১১
রামবাড়ীতে	রামবাড়াতে	১০৫	২১
গোলক	শোনক	১০৬	১
পাচমাইল	পাঁচমাইল	১০৯	১৮
গোয়ালমাঢ়ে	গোয়ানমাঢ়ে	১১০	২১
গোয়ালা	গোয়ানা	১১১	৫
বাত্রিতে	রাত্রিতে	১১৮	৩
কবির	কাঠের	১২১	১৫

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
কুন্ত	কুণ্ড	১০৫	১
মহারাণা	মহারাণী	১৫২	২
পড়ন	পড়ুন	১৬৫	২২
ষাহারা	যাহারা	১৬৭	২
চলিরা	চলিয়া	১৬৯	২১
ষত	যত	১৭৯	২
উঠাইয়া	উঠিয়া	”	২২
পাঠিকা	পাঠিকাগণ	১৮১	৬
বিশেয	বিশেষ	১৮২	৫
দন্ন	দলু	”	৮
থর্যালি	থর্শালি	১৮৭	৯
নিয়ম	নিয়মং	২০৭	১২
হেসব	যেসব	২১০	৭
আদি সর্ব্বসাধারণের	সর্ব্বসাধারণের	”	৯
কস্তুরি, মৃগ	কস্তুরিমৃগ	২১১	২০
কলাতাল	কাণাতাল	২১৩	৪
হিমালয়বাসী	হিমালয়বাসীর	২১৫	৩
বদি	যদি	২১৭	৪
কাহাদের	তাহাদের	”	১৯
যহাশয়েরা	মহাশয়েরা	২২২	৯
এত	অতি	২২৮	৪
গঙ্গানল	গঙ্গাননী	২৩০	৭
উতয়ই	উভয়ই	২৩৮	৭
কিছুমানহানি	কিছুমাত্রহানি	২৪৫	১৮

—*:*—

ওঁ

তৎসৎ।

হিমালয় ভ্রমণ।

মঙ্গলাচরণম্।

ওঁ অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

যিনি জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকা দ্বারা অজ্ঞানান্ধকারে অন্ধ জীবের চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেন, সেই শ্রীশ্রীগুরুদেবকে নমস্কার। এই বিশ্ব-সংসারে জীব মাত্রই শ্রীশ্রীগুরুদেব-কৃপাবলে প্রকৃত জ্ঞান কি, তাহা লাভ করিতে পারে ও তদ্দ্বারা ভব-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায়, বিশেষতঃ আরও দেখা যায় যে, এই বিশ্ব-ভূমণ্ডলে যদি কাহারও সহিত বন্ধন থাকে প্রকৃতপক্ষে তাহা একমাত্র শ্রীশ্রীগুরুর সহিত আছে, কারণ ইহা জন্মজন্মান্তর হইতে আরম্ভ করিয়া যতদিন পর্য্যন্ত জীব মুক্তিমার্গের অধিকারী হইতে না পারে ততদিন পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদ থাকিবেই থাকিবে। অন্যান্য যে সকল বন্ধন আছে তাহা দেহের ক্ষয়ের সহিত অবসান হইয়া যায়। অতএব যাঁহার শ্রীশ্রীচরণ-কৃপাবলে এই পাপদেহ হইতে একদিন মুক্তিলাভে সক্ষম হইব এবং যাঁহার শ্রীশ্রীচরণে এই দেহ

মন প্রাণ সমস্তই সমর্পিত, সেই পরমারাধ্যতম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্-গুরুদেবের শ্রীশ্রীচরণ-সরোজে শতকোটি ভূমিগত সাষ্টাঙ্গ প্রণাম পূর্ব্বক লেখনী হস্তে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলাম। ভরসা—তিনি, তাঁহারই শ্রীশ্রীচরণাশীর্ব্বাদে সফল মনোরথ হইব। জয় শ্রীশ্রীগুরুমহারজকি জয়!!

প্রথম খণ্ড।

জব্বলপুর।

জব্বলপুর বা জাবালপুর রেবাখণ্ডের মধ্যপ্রদেশস্থ একটী প্রসিদ্ধ স্থান। এই স্থান প্রায় চতুর্দ্দিকে জাবাল বা পর্ব্বতশ্রেণী দ্বারা বেষ্টিত বলিয়া জাবালপুর নামে খ্যাত হইয়াছে। বর্ত্তমান নাম জব্বলপুর। এখনও স্থানীয় লোকেরা কাগজে পত্রে বা কথায় জাবালপুরই বলিয়া থাকে। জব্বলপুর পরম রমনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী সহর। এখানকার সেনানিবাস, অদূরবর্ত্তী পর্ব্বতোপরি একখানি প্রস্তরের উপর মদনমহল নামে খ্যাত দ্বিতল পাকা বাড়ী, পর্ব্বতমধ্যস্থিত নির্জ্জন দেবতলে ভূমি, ভৃগুমুনির আশ্রম, চৌষট্টী যোগিনী পরিবৃত শ্রীশ্রী৺গৌরীশঙ্কর দেবের মন্দির, নর্ম্মদা নদীর তীরস্থ বনভূমি প্রভৃতি স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ। রাজা গকুলদাস ও বল্লভদাস প্রতিষ্ঠিত কাপড়ের কল, ওয়াটার ওয়ার্কস, বারণ কোম্পানী ও পার্ফেক্ট পটারি কোম্পানির মাটীর দ্বারা নানাবিধ জিনিস পত্রাদি তৈয়ারের কারখানা, কাচের কারখানা, গানক্যারেজ ফেক্টারী, সহর হইতে

তের মাইল দূরবর্ত্তী ভেড়াঘাটস্থ ওয়াটারফল, মার্ব্বেল রক, সোপষ্টোন ও চূণের কারখানা। এই সকল দেখিবার জন্য নানাদেশ হইতে বহুলোকে প্রায়ই জব্বলপুরে আসিয়া থাকেন। জব্বলপুর ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে, গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্‌সুলা রেলওয়ে ও বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের সন্ধিস্থল। এই স্থানটীতে অনেক বড় বড় ধনীলোকের বসতি আছে, অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোকও কার্য্যোপলক্ষে এখানে বাস করিতেছেন, এবং বর্ত্তমান সময়ে অনেক পেন্সনপ্রাপ্ত ইউরোপীয় ভদ্রলোক আবাসস্থান করিতেছেন। প্রাচীনকালে এই স্থানের নিকটবর্ত্তী গড়মণ্ডলা নামক স্থানে ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধা বীরাঙ্গনা রাণী দুর্গাবতীর রাজধানী ছিল ও প্রসিদ্ধ ডাকাতের সর্দ্দার তান্তীয়া ভীলের আবাসস্থান ছিল। এখানে সাধারণতঃ তিনটী ঋতু দেখা যায়—শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা। প্রত্যেক ঋতুর আপনাপন সময়ে বিশেষ প্রাখর্য্য দেখা যায়। এখানকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়গুলি নানা আকৃতিবিশিষ্ট প্রস্তর পরিপূর্ণ। এখানে আহার্য্য দ্রব্যাদি ও সর্ব্ব রকমের ফল ইত্যাদি পাওয়া যায়। অতিথি অভ্যাগতের জন্য অনেক ধর্ম্মশালা স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে। এখানকার অনেক দেবালয়ে, মঠাদিতে এবং নর্ম্মদাতীরে অনেক সাধু সন্ন্যাসীর দর্শন লাভ ঘটে। প্রত্যেক স্নানঘাটেই সাধুদিগের থাকিবার উপযোগী ধর্ম্মশালাদি আছে। পরমারাধ্যতম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমৎগুরুদেব মহারাজজিউ কর্ত্তৃক জব্বলপুর আমার কর্ম্মস্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলে তাঁহারই আদেশক্রমে ১৩১৫ সালে কার্ত্তিক

মাসে তথায় যাইয়া তদনুযায়ী কার্য্যাদি করিতে থাকি। তদনন্তর সেইস্থানে তাঁহারও শুভাগমন হইয়াছিল। ১৩১৬ সনে ১৯শে মাঘ মঙ্গলবার তিনি এই মর জগতের কার্য্যাদি সমাধা করিয়া যখন অনন্ত ধামে গমন করিলেন তখন আমি দিশাহারা পথিকের মত কর্ত্তব্য কি, স্থির করিতে না পারিয়া অত্যন্ত চঞ্চলচিত্ত হইয়া পড়ি, এইরূপ সময়ে এক মহান আদেশবানী আমার মনের গতি ফিরাইয়া দিল।

হিমালয় ভ্রমণ ও দর্শন উপলক্ষে যাত্রা

তথাকার উপস্থিত কার্য্যাদি সমাপনান্তে ১৬ই ফাল্গুন শুক্রবার সন্ধ্যার সময় সমস্ত বন্ধু বান্ধবগণকে সময়োচিত আলাপ ও ব্যবহারাদির দ্বারা সাধ্যমত সন্তুষ্ট করিয়া হিমালয় দর্শন ও ভ্রমণ উপলক্ষে তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করি। রাত্রি ৯টার সময়ে যাত্রা করি। গাড়ীতে সহযাত্রীরা প্রায় সকলেই আমার উপস্থিত মনের ভাব অবগত হইয়া আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করেন। সমস্ত রাত্রি গাড়ীতে অতিবাহিত করিয়া ২১শে ফাল্গুন প্রাতে পাঁচটার সময় এলাহাবাদ ষ্টেশনে গিয়া পৌঁছি।

প্রয়াগরাজ বা এলাহাবাদ

ষ্টেশন হইতে পদব্রজে প্রয়াগের ত্রিবেণী ঘাটে যাইয়া উপনীত হই। প্রয়াগ হিন্দুমাত্রেরই একটী প্রধান তীর্থস্থান। এ স্থানের ত্রিবেণীনামক স্থানে উত্তরদিক হইতে গঙ্গা, পশ্চিমদিক হইতে যমুনাও দুর্গমধ্য হইতে অন্তঃসলীলাসরস্বতী মিলিত হইয়া ত্রিবেণী বা যুক্তবেণী স্বজন করিয়াছেন। এই তীর্থ শাস্ত্রে তীর্থরাজ প্রয়াগ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

এখানে দ্বাদশ বৎসর অন্তর কুম্ভমেলা ও সাধুসমাগম হয়। সর্ব্ব-সাধারণ যাত্রীগণ ত্রিবেণী তীর্থে মুণ্ডন, দুর্গমধ্যে অক্ষয় বট ও সরস্বতী কুণ্ড দর্শন, এবং শ্রীশ্রীবেনীমাধব, শ্রী৺অলোপীদেবী ও মহামুনি ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রম প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া থাকেন।*অনেক যাত্রী সাধুদর্শন মানসে বাঘাম্বরী বাবার গদী ও গঙ্গার অপর পারস্থ ঝুসীতে গমন করিয়া থাকেন। ঝুসীতে অনেক সাধু মহাত্মার আশ্রম আছে, তন্মধ্যে হংসের আস্তান কোট গুহা, সমুদ্রকূপ প্রভৃতি স্থান প্রসিদ্ধ। এলাহাবাদ যুক্তপ্রদেশের রাজধানী এবং অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী নগর। এখানে দুর্গ হাইকোর্ট, কোম্পানীর বাগান, যমুনার উপরিস্থিত লৌহ সেতু প্রভৃতি স্থান বিশেষরূপে দেখিবার উপযুক্ত। এ স্থানও তিনটী রেলওয়ের সন্ধিস্থল। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে, আউধ এণ্ড রোহিলখণ্ড রেলওয়ে ও বেঙ্গল নর্থ ওয়েষ্টারেন রেলওয়ে এখানে মিলিত হইয়াছে। সঙ্গমস্থলের পশ্চিমদিকে ই, আই রেলওয়ের যমুনার উপর লৌহসেতু বিদ্যমান আছে, এবং উত্তর দিকে গঙ্গার উপর বি, এন ডব্লিউ রেলওয়ের নূতন লৌহসেতু নির্ম্মিত হইতেছে। শেষোক্ত সেতু প্রস্তুত হইয়া গেলে সর্ব্ব-সাধারণ যাত্রীদের বিশেষ সুবিধা হইয়া যাইবে।

এখানে সকাল বেলায় ত্রিবেণী তীর্থে প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপনান্তে আহারাদি করিয়া বৈকাল বেলায় গঙ্গার অপর পারস্থিত ঝুসীতে

* এখানে প্রতি মাঘমাসে এক মহা মেলা হয়। সমাগত সাধু মহাত্মা ও যাত্রীগণ গঙ্গার চড়াভুমির উপর কুশ-নির্ম্মিত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া কল্পবাস করিয়া থাকেন।

যাইয়া শ্রীশ্রীমৎ মোহন্তমহারাজ মাধবানন্দ গিরিজিউর আস্তানে আসন গ্রহণ করি। বর্ত্তমান মোহন্ত শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দ গিরিজিউ মহারাজ একজন বৈদান্তিক পণ্ডিত। প্রত্যহ ২০।২৫ জন সাধুকে মধুপুরি ভিক্ষা দিয়া থাকেন ও আস্তানে প্রত্যহ ১২।১৪ জন সাধু দুই বেলা পরমানন্দে আহারাদি ও স্ব স্ব কার্য্যের অনুষ্ঠানাদি করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীনানকপন্থী উদাসী সাধুর আস্তানধারী বর্ত্তমান মোহন্ত শ্রীশ্রীমৎস্বামী দয়ারাম পরমহংসজিউ বেশ সজ্জন মহাপুরুষ। তাঁহার বালকবৎ ব্যবহার বিশেষ প্রশংসনীয়। তদীয় শিষ্যপ্রবর শ্রীমৎস্বামী ধর্ম্মানন্দজিউ মহারাজের সহিত আমার বিশেষ আলাপ পরিচয় হয়, তিনি পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমৎগুরুদেবের সমাধিগ্রহণ কথা শুনিয়া অত্যন্ত মনোবেদনা প্রকাশ করেন। এখানকার সমস্ত সাধুমহাত্মাগণ আমাকে হিমালয় ভ্রমণে অত্যন্ত উৎসাহিত করেন ও নিঃসম্বল পর্য্যটনের প্রতিবাদ করেন। শ্রীমৎ স্বামী ধর্ম্মানন্দ জিউ আমাকে একখানি কম্বল ও উলের টুপি দান করেন। এখানে পরমানন্দে বার দিন অতিবাহিত হয় এবং নিত্য নিত্য অনেক সাধুমহাত্মার দর্শনে ও আলাপনে নানা বিষয়িণী অভিজ্ঞতা লাভ হয়।

বৃন্দাবন ধাম।

এই স্থানটীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অত্যন্ত মনোরম। সমস্ত সাধু মণ্ডলী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ৩রা চৈত্র বৃহস্পতিবার বৃন্দাবন যাত্রা করি। শ্রীমৎস্বামী ধর্ম্মানন্দজিউ এলাহাবাদ ষ্টেশন পর্য্যন্ত সহগমন করিয়া আন্তরিক সৌজন্য ও কৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া বিদায় গ্রহণ

করেন। বেলা ৩৷৷০ সাড়ে তিনটার গাড়ীতে রওনা হই। গাড়ীর মধ্যে অনেকগুলি নব্য শিক্ষিত যুবকের সহিত বিবিধ ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনাদিতে কালাতিপাত করিতে থাকি। রাত্রি প্রায় ১০।১১ টার সময় হাট্রস জংসনে গাড়ী বদলাইয়া মথুরার গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতে থাকি, রাত্রি প্রায় ৩টার পর গাড়ী আসিয়া উপনীত হয়। গাড়ীতে উঠিবার সময় মথুরার এক পাণ্ডাজীর দুর্ব্যবহারে একটু কষ্ট অনুভব করি। প্রাতে মথুরা জংসনে গাড়ী বদল করিতে হয় ও বৃন্দাবনগামী গাড়ীতে বসিয়া বেলা ৭৷৷৮ টার সময় বৃন্দাবন পৌঁছি। বৃন্দাবন পরম রমণীয় স্থান। ইহার উত্তর ও পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া কল কল নাদে যমুনা প্রবাহিত হইয়া যাই-তেছে। এই বৃন্দাবন এক সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বাল্য এবং কৈশোর ক্রীড়াস্থল ছিল। বর্ত্তমান তালবন, তমালবন, কুঞ্জবন, নিধুবন, রাধাকুঞ্জ, শ্যামকুণ্ড, মান-সরোবর, গিরিগোবর্দ্ধন, গোকুল প্রভৃতি স্থান সর্ব্বসাধারণের মনে পবিত্র স্মৃতি জাগরিত করিয়া দেয়। এখানে ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী, রাসলীলা ও দোলযাত্রা উপলক্ষে মহামেলা হইয়া থাকে। ভাদ্রমাসে ও কার্ত্তিকমাসে বনভ্রমণ ও বৃন্দাবন-প্রদক্ষিণ উপলক্ষে স্থানে স্থানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের লীলার অভিনয় ইত্যাদি হইয়া থাকে। উভয় সময়ে বহুযাত্রীর সমা-গম হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে লালাবাবুদের মঠ, শেঠেদের বাড়ী ও মঠ, ব্রহ্মচারিজিউ মহারাজের আশ্রম ও অন্যান্য অনেক প্রসিদ্ধ মঠ ও প্রভুপাদ গোস্বামী মহারাজগণের গদী আছে। বর্ত্তমান সময়ে বৃন্দাবন ধামের সেই পূর্ব্বকালীন ঘটনা ও কার্য্যবিধির স্মৃতি-

মাত্র আছে। এখন উক্ত স্থানে জলে স্থলে নানাবিধ উৎপাতের প্রাতুর্ভাব হইয়াছে। তন্মধ্যে পাণ্ডা মহারাজগণের ধৃষ্টতা প্রবঞ্চনা প্রভৃতি গুণাবলী, বাঁদরের উৎপাত, চোর ডাকাতের উপদ্রব ও যমুনাতে কচ্ছপের উৎপাত বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। এখন বৃন্দাবনধামে সর্ব্বত্রই সদা-সর্ব্বক্ষণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের গোপিনীদের সহিত লীলা খেলার অভিনয় হইতেছে।

এখানে প্রাতে যমুনাতে স্নানাদি প্রাতঃক্রিয়া সমাপনান্তে শ্রীশ্রীমৎস্বামী কেশবানন্দজিউর রাধাবাগস্থিত আশ্রমে আসন গ্রহণ করি, তথায় শ্রীমান্ ব্রহ্মচারী দুর্গানন্দজিউর সহিত আলাপ ও আচার ব্যবহারে পরমানন্দ লাভ করি, ব্রহ্মচারী জিউর স্বভাব-চরিত্র ও সৌজন্য বিশেষ প্রশংসনীয়। তথায় আহারাদি করা হয়। তৎকালে আশ্রমে শ্রীশ্রীমৎস্বামীজিউ মহারাজের অনুপস্থিতি হেতু তাঁহার দর্শন লাভে বঞ্চিত হইয়া ক্ষুণ্নমনে হরিদ্বার গমনের জন্য প্রস্তুত হই। প্রাতে ব্রজবাসী এক পাণ্ডাবালকের প্রতারণা করিবার চেষ্টার কথা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। বেলা ৩টার সময় ষ্টেশনে যাইয়া উপস্থিত হই। তথায় পরিব্রাজক শ্রীমৎ মন্মথানন্দ ব্রহ্মচারীজিউ মহাশয়ের সহিত দেখা হয়। তিনি নানপ্রকার ধর্ম্ম উপদেশের দ্বারা উৎসাহিত করেন ও নিঃসম্বল পর্য্যটনের ঘোর প্রতিবাদ করেন। সন্ধ্যা ছয়টার গাড়ীতে হরিদ্বার যাত্রা করি, মথুরা, হাথ্রাস, আলিগড়, চান্দোসী, মুরাদাবাদ, লুকসার প্রভৃতি স্থানে গাড়ী বদলাইতে হইয়াছিল। গাড়ীতে ব্রজবাসী একজন

পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবতের অনেকগুলি বিষয়ের ব্যাখ্যা করেন, চান্দোসীতে একজন শেঠ জল্‌খাবার জন্য কতকগুলি খাদ্য দ্রব্য কিনিয়া দেন। মুরাদাবাদ হইতে লুকসার পর্য্যন্ত গাড়ীতে অত্যন্ত ভিড় হওয়ার দরুণ কিছু কষ্ট পাইতে হয়। গাড়ীতে ভিড় হইবার কারণ ঐ সময়ে রুরকী নামক স্থানে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীদের একটী মহামেলা বসিয়াছিল। ৫ই চৈত্র শনিবার বেলা ৩॥০ টার সময় হরিদ্বারে উপনীত হই।

হরিদ্বার

হরিদ্বার বা স্বর্গদ্বার পরম পবিত্র তীর্থস্থান। ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পরম রমণীয়। হিমালয় পর্ব্বত হইতে কুলুকুলুনাদিনী গঙ্গা এইস্থানে আসিয়া ত্রিধারাবিশিষ্টা হইয়া পুনরায় কনখলে যাইয়া মিলিতা হইয়াছেন। এখানে প্রতি দ্বাদশ বৎসর অন্তর কুম্ভমেলা ও সাধু সমাগম হইয়া থাকে এবং প্রতি বৈশাখ মাসে বহু-যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। হরিদ্বার সধুমহাত্মার সাধন ভজনের স্থান। এইস্থানে গৃহস্থ লোকের বাস নাই এমন কি হরিদ্বারের পাণ্ডামহারাজগণের বাস হরিদ্বার হইতে ৩ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে জোয়ালাপুর নামক স্থানে অবস্থিত। এখানে সমাগত যাত্রীগণ ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান, শিবপিড়ি প্রদক্ষিণ, কুশাবর্ত্তঘাটে পিণ্ডদান, ভীম-গোড়া, সপ্তস্রোতা, জ্ঞানগোধরি, সর্ব্বনাথশিব, সূর্য্যকুণ্ড, নীল্লো-কেশ্বর শিব, বিল্লোকেশ্বর শিব, পিছোড়নাথ শিব, মায়াদেবী, ভৈরব-নাথ, গৌরীকুণ্ড, চণ্ডীপাহাড়, চণ্ডীদেবী ও নীলধারা প্রভৃতি দর্শন করিয়া থাকেন। সাধু মহাত্মাগণের মধ্যে শ্রীমৎ মোহন্ত মহা-রাজ শ্রী ১০৮ স্বামী বলবন্ত গিরিজিউ মহারাজ শ্রীমৎ পরমহংস

শ্রী ১০৮ শ্রীমৎস্বামী ভোলানন্দ গিরিজিউ মহারাজ শ্রীমৎ প্রেমানন্দস্বামীজিউ ও জ্ঞানবৃদ্ধ ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ পরমার্থনাথ চট্টোপাধ্যায় মহারাজগণ সর্ব্বজন প্রশংসিত। এস্থানে সাধু সন্ন্যাসীদের অনেক গুলি আশ্রম ও আখেরাদি আছে। তন্মধ্যে জুনা আখেরা, নির্ব্বানি আখেরা, নিরঞ্জনী আখেরা, স্বামীভোলানন্দ গিরিজিউর আশ্রম, স্বামীকেশবানন্দ জিউর আশ্রম, ভৈরব নাথের আখেরা, জ্ঞানগোধরি, রাধাগোবিন্দ জিউর মঠ, প্রভৃতি স্থানে অনেক সাধু-মহাত্মা স্ব-স্ব কার্য্যাদির অনুষ্ঠানে রত থাকেন। এখানে জ্ঞানগোধরিতে ও ব্রহ্মনালের নিকট ঘাটের উপর ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতা গান ইত্যাদি হইয়া থাকে। ব্রহ্মনালের মৎস্যের ক্রীড়া দেখিতে অতীব সুন্দর। সমবেত যাত্রীগণ নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য জলে ছড়াইয়া খেলা দেখেন। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় অনেক সাধুমহাত্মার দর্শন লাভ ঘটে। হরিদ্বারে অবস্থিতির জন্য অনেক প্রধান প্রধান ধর্ম্মশালা আছে তন্মধ্যে রায়বাহাদুর সুরযমল, রায়বাহাদুর বদরিদাস, মাড়োয়ারী পঞ্চায়তী ধর্ম্মশালা প্রভৃতির বন্দোবস্ত বিশেষ সুবিধাজনক। অনেক ভাড়াটীয়া বাড়ীও পাওয়া যায়। এখানে শীতকালে যেমন প্রচণ্ড শীত তেমন গ্রীষ্মকালে তদনুরূপ গ্রীষ্ম অনুভূত হয়, দিনের বেলায় অত্যন্ত মাছির উৎপাত, এখানে পাণ্ডামহারাজগণ ষ্টেশন প্রাঙ্গন হইতে সমাগত যাত্রীগণকে স্ব-স্ব অভিরুচি মত স্থাতে রাখিয়া ক্রিয়া কলাপাদি সম্পন্ন করাইয়া দেন, তাঁহাদের ব্যবহারাদি সম্বন্ধে অনেক কিছু বলিবার আছে। * এখানে

* পরিশিষ্টে পাণ্ডাগণের ব্যবহার ইত্যাদি প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

শ্রী৺ বিল্লোকেশ্বর শিবের স্থান বেশ নির্জ্জন ও সাধন ভজন-উপ-যোগী, এইখানে বাঁনরের উৎপাতও সাধারণ মত আছে তবে সাব-ধানের কোন বিপদ নাই। ষ্টেশন হইতে খানিক দক্ষিণ প্রান্তে মায়াপুরে ঋষিকুল ব্রহ্মচারী আশ্রম বর্ত্তমান যুগে একটী দেখিবার উপযুক্ত বিষয়। এখানকার সমস্ত ক্রিয়াকলাপাদি বেদোক্ত মতে সম্পাদিত হয়। ব্রহ্মচারী বালকদের দেখিলে প্রাচীন কালের ঋষিদের আশ্রমের কথা যাহা পুরাণাদিতে শোনা গিয়াছে তাহাই স্মরণ হয়, আশ্রমের বন্দোবস্তাদি বিশেষ প্রশংসনীয়। এখানে রুগ্ন যাত্রীদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য ঔষধালয় ও হাঁসপাতাল ইত্যাদি আছে। এস্থান হইতে প্রায় এক ক্রোশ দক্ষিণে কন্‌খল্। এই-রূপ জনশ্রুতি আছে যে, এইস্থান পুরাকালে দক্ষরাজার রাজ-ধানী ছিল। বর্ত্তমান দক্ষযজ্ঞকুণ্ড, দক্ষেশ্বর প্রজাপতি শিব, সতী-কুণ্ড প্রভৃতি স্থান তাঁহারই কীর্ত্তি স্মৃতি মানসপটে জাগাইয়া দেয়, এখানে সাধুমহাত্মাদের জন্য অনেকগুলি আশ্রম ও তাঁহাদের আহারের জন্য অনেকগুলি অন্নসত্র আছে। এখানে পণ্ডিত কেশবানন্দ স্বামীজির আশ্রম, অবধূত চেতন দেবের আশ্রম, রাম-কৃষ্ণ মিশনের সেবাশ্রম ইত্যাদি সর্ব্বজন প্রশংসিত ও দেখিবার উপযুক্ত। জোয়ালাপুর ও কনখলের অদূরবর্ত্তী প্রদেশে শ্রীমৎস্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীজিউ মহারাজ প্রতিষ্ঠিত গুরুকুল ব্রহ্মচারী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত আছে। আশ্রমস্থ সর্ব্বসাধারণের আচার ব্যবহার বিশেষ প্রশংসনীয়। প্রতি বৎসর চৈত্রমাসে গুরুকুল আর্য্যসমাজের বার্ষিক সভা হয় তদুপলক্ষে উক্ত সমাজের

একটী বহুদিন ব্যাপী মেলা বসে ও বহুলোক সমাগম হয়। হরি-দ্বারে শ্রীযুত রায় বাহাদুর সুরযমল শিবপ্রসাদ প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম-শালায় আমরা আসন গ্রহণ করি। ধর্ম্মশালার দারোগা সাহেব বেশ সজ্জন ও কার্য্যদক্ষ লোক। এখানে অবস্থিতি কালে এখানকার ও কনখলের প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দেখা হয়। শ্রীমৎস্বামী ভোলানন্দ গিরীজিউ মহারাজের আশ্রমে ও রাধাগোবিন্দ জিউর মঠে সাধু মহাত্মাদের ভাণ্ডারা দর্শনে পরম আনন্দ লাভ করি। ১০ই চৈত্র বৃহস্পতিবার আর্য্য সমাজের মেলা দেখিতে যাওয়া হয় ও তাঁহাদের সভাতে যোগদান করি, ঐ দিন সায়ংকালে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে পুরীধামস্থ কড়ারাশ্রম স্বামী শ্রী১০৮শ্রীমৎ-স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজিউ মহারাজের শিষ্য সম্প্রদায়ের সহিত শুভ মিলন হয়। তাঁহারা সকলেই ক্রিয়াবান ও হিমালয় দর্শনাভিলাষী জানিতে পারিয়া মনে এক নূতন সাহসের উদয় হয়। তাঁহাদিগের জন্যও উক্ত ধর্ম্মশালায় বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। এখানে শ্রীশ্রীমতী নর্ম্মদা ভৈরবী মায়িজির সহিত বিশেষ পরিচয় হয়, তাঁহার উদারতা ও রাধাগোবিন্দ জিউ মঠের বৃদ্ধা বেনী দাসীর ব্যবহার বিশেষ প্রশংসনীয়। এস্থান হইতে কতকগুলি স্থানীয় সুন্দর জিনিষ আশীর্ব্বাদ সহ জব্বল-পুরস্থ এক গুরু ভগ্নীকে পাঠান হয়। কলিকাতার স্বনামখ্যাত বড়লোক শ্রীযুক্ত বঙ্কুলাল ধর মহাশয় ও দারোগাসাহেব শ্রীযুত প্রেমসিং বাবু আমাকে হিমালয় ভ্রমণোপযোগী যৎকিঞ্চিৎ পাথেয় দিয়া সাহায্য করেন। এখানে ফটো তোলা হয়। হরিদ্বার ও

কন্‌খলে বিদ্যার্থী বালকগণের জন্য অনেকগুলি অন্নসত্র আছে এবং সর্ব্বত্রই বিশেষ ভাবে বিদ্যাচর্চ্চার জন্য পাঠশালাদি আছে। চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের সময় কন্‌খলে অনেক সাধু মহাত্মা বাস করেন। অনেকগুলি বাগান সংযুক্ত বড় বড় বাড়ী তাঁহাদের জন্য নিয়োজিত আছে। এখানেও বার দিন পরমানন্দে সাধুসঙ্গ ও নানাস্থান দর্শন ও ভ্রমণ করা হয়। এখানকার প্রায় সমস্ত সাধু মহাত্মাই নিঃসম্বল পর্য্যটনের প্রতিবাদ করেন ও হিমালয় সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ের উপদেশ দেন। হরিদ্বার হইতে খাল কাটাইয়া গঙ্গার একটী জল স্রোত রুড়কী প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থানের কৃষি কার্য্যের সুবিধার জন্য বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে। উক্ত খালটী কানপুরে আসিয়া আবার গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই স্থানে কাণ্ডী, ঝাম্পান প্রভৃতি হিমালয় গমনোপযোগী যান পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীবদরিনারায়ণের ও শ্রীশ্রী৺কেদার নাথের অনেক পাণ্ডা মহারাজ যাত্রী সংগ্রহার্থে হরিদ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া থাকেন। এই স্থান হইতে হৃষীকেশ পর্য্যন্ত একাগাড়ী, টম্‌টম্‌ ও গরুরগাড়ী ইত্যাদি পাওয়া যায়। যে সব যাত্রীরা কেবলমাত্র হৃষীকেশ দর্শন করিয়া ফিরিতে চাহেন তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারের যানাদির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ১৬ই চৈত্র বুধবার প্রাতে সমস্ত সাধু মহাত্মাগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণান্তর শ্রীমৎস্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজিউ মহারাজের শিষ্য সম্প্রদায় সকলেই হুগলী জেলার অন্তঃপাতী শ্রীরামপুর সৎসঙ্গ সভার সদস্য ও পরিব্রজ্যাবলম্বনকারী সাধু মহাত্মাগণ সহ হিমালয়া-

ভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকি। দক্ষিণ পার্শ্বস্থিতা কল কলনাদিনী গঙ্গার দর্শনে ও বাম পার্শ্বস্থিত পর্ব্বতগাত্রে তাহার প্রতিধ্বনি শ্রবণে প্রাণ মন পুলকিত হইতেছিল। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া ছয় মাইল দূরবর্ত্তী রায়বালা বা হৃষীকেশ রোড ষ্টেশনে উপনীত হই। এই স্থানে যাত্রীদের বিশ্রামার্থ ধর্ম্মশালা ও সর্ব্বপ্রকারের খাদ্য দ্রব্য সমন্বিত দোকান পাঠ ইত্যাদি আছে। যাঁহারা রেলপথে হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশ যাত্রা করেন তাঁহাদিগকে এস্থানে নামিতে হয় ও যানাদির বন্দোবস্ত করিয়া বা পদব্রজে হৃষীকেশ যাইতে হয়। আর যাহারা দেরাতুন ও মসূরি হইয়া হিমালয়ে প্রবেশ করিতে চাহেন তাঁহাদের হৃষীকেশ দর্শন করিতে হইলে এস্থানে গাড়ী হইতে নামিয়া হৃষীকেশ দর্শনান্তে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হয়।

রায়বালা বা হৃষীকেশ রোড

এই স্থানের এক মাইল উত্তরে শ্রীশ্রী৺ সত্যনারায়ণ দেবের মন্দির। মার্ব্বেল প্রস্তর নির্ম্মিত শ্রীশ্রী৺ সত্যনারায়ণ ও লক্ষ্মী দেবীর মূর্ত্তি অত্যন্ত রমণীয়। স্থানটীর প্রাকৃতিক দৃশ্যও পরম সুন্দর। এখানে নানাবিধ মিঠাই মণ্ডা ও খাদ্য দ্রব্যাদির দুইটী দোকান আছে। দুই তিনটী বৃহৎ ধর্ম্মশালা আছে। প্রত্যহ অভ্যাগত সাধু মহাত্মাগণকে তৈয়ারি খাবার দেওয়া হয়, আর যাঁহারা কাঁচা সিধা লইতে চাহেন তাঁহারাও তদনুরূপ পাইয়া থাকেন। সন্ধ্যার সময়ও সাধারণমতে জলযোগের ব্যবস্থা আছে। এই স্থানের জলের বন্দোবস্ত বেশ সুবিধাজনক, যাঁহারা নদীতে স্নান করিতে চাহেন

সত্যনারায়ণ

তাঁহারাও খানিকটা উত্তর দিকে বা দক্ষিণ দিকে গেলেই নদী পাইবেন। এইখানে আমরা মধ্যাহ্নকৃত্যাদি সমাপণান্তে সকলেই শ্রীশ্রী৺সত্যনারায়ণ দেবের প্রসাদ গ্রহণ করি। আহারাদির পর কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তে হৃষীকেশ অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকি। খানিক দূরে শ্রীযুত রায় বাহাদুর সূরজমলের প্রতিষ্ঠিত সৌম নদীর উপর লৌহ নির্ম্মিত সেতু অতিক্রমকালীন প্রতিষ্ঠাতার মহান দানশীলতার বিষয় স্মরণ করিতে করিতে হৃদয় আনন্দরসে পরিপূর্ণ হয়। হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশ পর্য্যন্ত অনেক ছোট বড় নদী ও ঝরণা আছে। প্রায় সমস্তের উপর পুল তৈয়ার হওয়াতে যাত্রীদের যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইয়া গিয়াছে। পথি মধ্যে সাধারণ এক পশ্‌লা বৃষ্টি হয়। ক্রমশঃ বিবিওয়ালা ধর্ম্মশালা ও ঢুঢুধর্ম্মশালা অতিক্রম করিয়া ও কয়েকটী ছোট বড় পুল পার হইয়া বেলা পাঁচটার পর হৃষীকেশ ধামে উপনীত হই।

হৃষীকেশ।

হৃষীকেশ প্রবেশ পথে শ্রীশ্রীমৎপরমহংস ভারতী মহারাজ জিউর নব প্রতিষ্ঠিত আশ্রমটী দেখিতে পরম সুন্দর, বেশ নির্জ্জন ও সাধন ভজনোপযোগী হৃষীকেশ পরম রমণীয় তপোভূমি। এই স্থানে শীত ঋতুতে যেমন শীতাধিক্য তদনুরূপ গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে গ্রীষ্ম ও বর্ষার আধিক্য দেখা যায়। ইহার পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণ প্রদেশ হইতে গঙ্গা ত্রিধারা বিশিষ্টা হইয়া দক্ষিণ পশ্চিম কোণে যাইয়া মিলিত হইয়াছেন; এই স্থানটীর নাম ত্রিবেণী ঘাট। এই ঘাটের উপর অনেক সাধু মহাত্মা সাধন ভজনে রত আছেন। উক্ত ঘাটে সংখ্যাতীত বড়

বড় মাছ আছে, উহাদের খেলা দেখিবার জন্য যাত্রীগণ নানাবিধ আহার্য্য দ্রব্য জলে ছড়াইয়া দিয়া থাকেন। এখানেও অসংখ্য বাঁদর আছে, ঘাটের সাধুগণ ও সমবেত যাত্রীরা তাহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে খাবার দিয়া থাকেন। তপোবন পরম রমণীয় স্থান, এখানে অনেক সাধু মহাত্মা আপনাপন সাধন ভজনে রত আছেন। প্রত্যহ বৈকালে অনেক স্থানে সৎগ্রন্থাদি পাঠ,উপদেশ দান, ভগবৎ বিষয়ক গান ও ভজনাদি হইয়া থাকে, তাহাতে সর্ব্ব সাধারণের সাধু সঙ্গ করিবার বিশেষ সুবিধা হয়। এ স্থানে তপোবনে সাধুসঙ্গ, ত্রিবেণী ঘাটে স্নান, ভরত জিউর মন্দির, কুব্জা কুণ্ড ও নারায়ণের মন্দির প্রভৃতি সকলে দর্শনাদি করিয়া থাকে। এই স্থানে সর্ব্ব সাধারণ যাত্রীদের অবস্থান উপযোগী অনেকগুলি বড় বড় ধর্ম্মশালা আছে, তন্মধ্যে কালী কম্বলী বাবার ধর্ম্মশালা ও পাঞ্জাবী ছত্রের ধর্ম্মশালা সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও বহুসংখ্যক যাত্রীর আশ্রয়োপযোগী। এখানে অনেকগুলি কাপড় চোপড়, তৈজসপত্র, মিঠাই মণ্ডা ও বিবিধ খাদ্য দ্রব্যাদি সম্বলিত দোকান পাঠ আছে। সাধু মহাত্মাদের জন্য অতি উত্তম বন্দোবস্ত ও ব্যবস্থাদি আছে। সাধুদের নিত্য আবশ্যকীয় সমস্ত রকমের দ্রব্যাদি কালী কম্বলী বাবার ছত্র হইতে ও কয়েক রকমের পাঞ্জাবী ছত্র হইতে সরবরাহ করা হয়। সাধন করিবার জন্য পর্ণ কুটীর, পাতিবার জন্য মাদুর ও কম্বল,জলপাত্র বা কমণ্ডলু ইত্যাদি এবং কৌপীন,ব্যবহার উপযোগী গামছা ও বহির্ব্বাস,গেরুমাটী,সাবান,জ্বালানী তেল, গায়ে মাখিবার তৈল, পক্ষান্তে ক্ষৌরকার্য্য নিষ্পত্তির জন্য নাপিতের বন্দোবস্ত

প্রভৃতি যাহা কিছু প্রয়োজন সমস্তই কম্বলী ছত্র ও পাঞ্জাবী ছত্র হইতে ব্যবস্থা করা হয়। আহারের বন্দোবস্তও তদনুরূপ। প্রাতে সাধু মহাত্মাগণ সকলে এই চারি ছত্রে মাধুকরী করিয়া থাকেন, সন্ধ্যার সময় এক মায়ির (১) ছত্রে ভিক্ষা করেন। সাধু মহাত্মাদের সুবন্দোবস্ত হৃষীকেশে যে রকম দেখা যায়, সেরূপ আর কোথায়ও নাই। কম্বলী ছত্র বার মাস খোলা থাকে। বর্ষার প্রারম্ভে হৃষীকেশের জল বায়ু অত্যন্ত খারাপ হইয়া যায়, ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, তাই সেই সময়ে অধিকাংশ সাধু কনখলে গিয়া বাস করেন। ঐ সময়ে পাঞ্জাবী ছত্র কনখলে উঠিয়া যায় ও অপর তিনটী বন্ধ থাকে। তখন অল্প সংখ্যক সাধু হৃষীকেশে থাকেন, তাঁহাদের জন্য কম্বলী ছত্র হইতে সর্ব্বপ্রকারের বন্দোবস্তাদি হইয়া থাকে। এই কম্বলী ছত্রের প্রতিষ্ঠাতার জীবনী এবং শেঠ সূরজমলের জীবনী পরিশিষ্টে দেখুন। এস্থানে শ্রীমৎ পরমহংস ব্রহ্মানন্দ স্বামীজিউ, শ্রীমৎ স্বামী ধনরাজ গিরিজিউ (২) ও শ্রীমৎ পরমহংস ভারতী মহারাজ জিউর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে অনেক সাধু মহাত্মা আপনাপন ক্রিয়ায়

---

(১) এই ছত্রটী মহাকালীর পাঠশালার স্থাপয়িত্রী মাতাজী মহারাণী তপস্বিনী মহোদয়ার প্রতিষ্ঠিত। এখানে খাদ্যদ্রব্যের বিশেষ বন্দোবস্ত আছে।

(২) এই মঠে ব্রহ্মচারী ও বিদ্যার্থীগণের বিশেষ সুবিধা আছে। স্বয়ং মঠস্বামী আপন ব্যয়ে শাস্ত্র চর্চ্চাদির রীতিমত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার উদ্যম ও যত্ন বিশেষ প্রশংসনীয়।

রত থাকেন। আশ্রমগুলি দেখিতে পরম রমণীয় ও সর্ব্বত্র পরিচিত। আমি এই স্থানে সঙ্গীয় সাধু মহাত্মাগণ সহ ত্রিবেণী ঘাটের সন্নিহিত বারাকে আশ্রয় গ্রহণ করি। এখানে আহারাদির অত্যন্ত সুবন্দোবস্ত আছে। দিবাভাগে বেশ গ্রীষ্ম অনুভূত হইত ও মাছির উৎপাত অত্যন্ত বেশী কিন্তু রাত্রিতে প্রবল শীত, সেই ঠাণ্ডার জন্য কম্বল গায়ে দিতে হইত। এখানকার পাণ্ডাগণ তত লোভী বা অত্যাচারী নহেন। প্রত্যহ বৈকালে সাধু-দর্শন ও সৎসঙ্গ-মাঁনসে তপোবনে বেড়ান হইত। ১৯শে চৈত্র লছ্‌মন্ ঝুলা দেখিতে যাওয়া হয়। প্রতিষ্ঠাতা রায় বাহাদুর শেঠ সূরজমল শিবপ্রসাদ ঝুনঝুন ওয়ালার মহানুভাবতা ও নির্ম্মাতার কার্য্য-দক্ষতা এবং বুদ্ধি-কৌশলের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়। তথাকার পাহাড়ীদের নদী পার হওয়ার উপযোগী চর্ম্ম-নির্ম্মিত বয়াগুলি দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর; উহারা সেই বয়ার উপর বসিয়া হস্ত ও পদ দ্বারা জল কাটিয়া নদীর একপার হইতে অপর পারে চলিয়া যায়। ২১শে চৈত্র প্রাতে বাঁদরের অপত্যস্নেহ দেখিয়া প্রাণ মন পুলকিত হয়। ২৫শে চৈত্র গুরু ভাই শ্রীমান বসন্তানন্দ জিউ আসিয়া মিলিত হন। তাঁহাকে স্ব ব্যয়ে একটী গরম উলেন্ গেঞ্জি, কম্বল ও গ্লাস দেওয়া হয়। ত্রিবেণী ঘাটের উপর শ্রীমৎ চৈতনব্রহ্মচারী মহারাজ বা ভঙ্গিয়া বাবা অনেক সময়ে নানা বিষয়ে সদুপদেশ দিতেন। তিনি একজন উন্নতমনা, শিক্ষিত, ত্যাগী ও ক্রিয়াবান সাধু। হিমালয়-পথের অনেক খবর ও সুবিধা ইত্যাদির কথা তিনি

আমাদিগকে বলিয়া দেন। শ্রীমৎ স্বামী ভারতী মহারাজের আশ্রমের কিছু দক্ষিণ দিকে শ্রীমৎ সত্যানন্দ স্বামীজিউ মহারাজের এক পর্ণ কুটীর আছে, তিনিও একজন শিক্ষিত ও উন্নত ক্রিয়াবান মহাপুরুষ এবং অত্যন্ত উগ্রতপা। তিনি নানা বিষয়ে উপদেশ দেন ও মন স্থির করিবার কয়েকটী উপায় বলিয়া দেন। তাঁহার সৌজন্য ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহার এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। পাঞ্জাবী ছত্রের ফটকদ্বারে রামকৃষ্ণ মিশনের একটী সেবাশ্রম এবং কম্বলী ছত্রের পার্শ্বে একটী দাতব্য আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় আছে। উভয় স্থান হইতে রুগ্ন ব্যক্তির সেবা শুশ্রূষা ও পথ্যাদির বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। কম্বলী ছত্র হইতে বিদ্যার্থীগণের জন্যও সর্ব্বপ্রকারের সুবন্দোবস্ত আছে। এখানে ভিক্ষালব্ধ অন্নে কয়দিন অতিথি সেবা করান হয়। এই সময়ে দুইজন গুরুভাই আমার পাথেয়র জন্য দুইটী মণিঅর্ডার পাঠান। হিমালয় যাত্রীদের কাণ্ডী ও ঝাম্পানের বন্দোবস্তাদি অনেকে এস্থানে করিয়া থাকেন। ৩রা বৈশাখ শনিবার পর্য্যন্ত পরমানন্দে নানাস্থান ভ্রমণ, সাধুদর্শন, সৎসঙ্গ ও সদালাপনে অতিবাহিত করিয়া পরিচিত সাধুসন্তগণের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক সঙ্গীয় সাধু মহাত্মাগণ সহ বেলা সাড়ে তিন ঘটিকার সময়ে হিমালয়ের তৃতীয় সোপান হৃষীকেশ হইতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে আরম্ভ করি। এইস্থানে গবর্ণমেণ্ট ডাকবাঙ্গলা, পুলিশচৌকী ও পোষ্টঅফিস ইত্যাদি আছে।

অতঃপর মুনিরেতী ও শ্রীশত্রুঘ্নদেবের মন্দিরাদি অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ তিন মাইল দূরবর্ত্তী লছ্‌মন ঝুলা নামক স্থানে উপনীত হই *। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, ত্রেতা যুগে শ্রীশ্রীলক্ষণদেব এই স্থানে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইবার জন্য দুই গাছি লৌহের শিকল পর্ব্বত-মধ্যদেশে ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন। অতি কষ্টে ও বিশেষ সাবধানের সহিত ঐ সময় উহা পার হইতে হইত। বিগত ১৮৮৮ সালে ধর্ম্মাত্মা শেঠপ্রবর রায় বাহাদুর শ্রীযুত সূরজমল যখন তাঁহার বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণীকে লইয়া বদরিকাশ্রম দর্শনে যাইতেছিলেন তখন তিনি উক্ত ঝুলা পার হইতে না পারিয়া আপন পুত্রকে তথায় এক পুল নির্ম্মাণ করাইয়া দিতে আদেশ করেন। রত্নগর্ভা মাতার উপযুক্ত পুত্র মাতৃ আজ্ঞায় বহু অর্থ ব্যয় করিয়া উক্ত লৌহনির্ম্মিত সেতু প্রস্তুত করাইয়া দেন। এখন অনেক বড় বড় ঘোড়া উষ্ট্র প্রভৃতি মাল বোঝাই লইয়া উক্ত ঝুলা পার হইয়া যায়। এস্থানে ভাগিরথী গঙ্গা দক্ষিণবাহিনী হইয়া প্রবাহিতা। উভয়-পার্শ্বে সাধু মহাত্মা ও যাত্রীদের জন্য ধর্ম্মশালা প্রভৃতি বিদ্যমান আছে এবং সাধু সন্ন্যাসীদের জন্য সদাব্রতেরও বন্দোবস্ত আছে। সর্ব্বপ্রকার আহার্য্য দ্রব্য সমন্বিত দুইখানি দোকান

লছমন ঝুলা বা লক্ষণ ঝোলা।

---

* এইস্থানে টিহরি মহারাজের তরফের কাণ্ডী ও ঝাম্পানবাহী কুলীগণের নিকট হইতে মাশুল আদায় করা হয়। একটী সোজা রাস্তা পার্ব্বত্য প্রদেশ দিয়া টিহরি রাজধানী পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। এই রাস্তাটী আমাপাটা রাস্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ ও দুই দিনে টিহরি যাইয়া পৌঁছে। এখান হইতে টিহরি রাজ্যের সীমা আরম্ভ হয়।

আছে। এখানে শ্রীশ্রীলক্ষ্মণ জিউর মন্দির আছে। পুলিশ-চৌকী ও ডাকঘর আছে।

আমরা সকলে এই স্থান পূর্ব্বে একবার দেখিয়াছি সুতরাং আর কাল বিলম্ব না করিয়া ঝুলা পার হইয়া তথা হইতে চারি মাইল দূরবর্ত্তী ফুলবাড়ী চটীতে সন্ধ্যা সাতটার সময় যাইয়া উপনীত হই। এই স্থানে একটী প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষের ছায়াতে ৫।৭ খানা খুব বড় বড় ঘর আছে, উহা গঙ্গার উপরেই অবস্থিত। চটীওয়ালারা বেশ ভাল লোক, সর্ব্বপ্রকারের খাদ্য দ্রব্যাদি পাওয়া যায়, জলখাবার-উপযোগী মিঠাই ইত্যাদিও মিলে। এইস্থানে রাত্রি যাপন ও সাধারণ জলযোগের ব্যবস্থা করা হয়। ৪ঠা বৈশাখ প্রাতঃকৃত্যাদি

ফুলবাড়ী চটী।

সমাপনান্তে উভয় পার্শ্বস্থ পর্ব্বত শ্রেণীর শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে দুই মাইল দুর গুলর চটীতে যাইয়া পৌঁছি। এখানে ৩।৪ খানি ঘর ও খাদ্য দ্রব্যাদির দোকান আছে। ইহার নিম্নদেশ দিয়া হিউলি নদী প্রবাহিতা। পথি মধ্যে কালী কম্বলী বাবার জল-সত্র আছে। হিউলি নদীর উপর এইস্থানে এক লৌহ-নির্ম্মিত সেতু আছে। উহা পার হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বস্থ কূলে হিউলী নদীতে জলের স্রোতের বেগে যাঁতা ঘুরান গম ভাঙ্গা কল গুলি দেখিতে দেখিতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী "মোহনা চটী"তে উপনীত হই। এখানে একটী প্রকাণ্ড টিনের ছাউনী বিশিষ্ট ধর্ম্মশালা ও ৩।৪খানি ঘর এবং দোকান পাঠ আছে। ইহারও পার্শ্বদেশ দিয়া হিউলী

গুলর চটী ও মোহন চটী।

নদী বহিয়া যাইতেছে। এই স্থান হইতে চড়াই সুরু হইয়া থাকে। এক মাইল চড়াইয়ের পর কালী কম্বলী বাবার জলসত্র আছে। তাহার কিছুদূরে ছোট বিজলী চটী। বেলা ১১টার সময় তথায় যাইয়া পৌছি। এখানে ৩।৪টী ঘর ও দোকানাদি আছে। চটীর সম্মুখ দিয়াই জলের ঝর্ণা ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে। এখানে আহারাদির বন্দোবস্ত করা হয়। সবে মাত্র নূতন চড়াই করিয়া সঙ্গীয় সাধু মহাত্মাগণ ক্লান্ত হইয়া পড়েন। এখানকার চটীওয়ালাগণ বেশ ভদ্র-লোক। কিন্তু জিনিষ পত্রের মূল্য কিছু অধিক দিতে হইল। আহা-রান্তে অল্প বিশ্রামের পর দেহের অবসাদ দূরীভূত হইলে আবার সকলে চলিতে আরম্ভ করি। এই স্থান হইতে এক মাইল চড়াইয়ের পর গবর্ণমেণ্ট ডাক বাঙ্গলা আছে, তাহার একটু পরে কালী বাবার জলসত্র আছে তথায় অল্পক্ষণ বিশ্রামান্তে বড় বিজলী চটীতে পৌছিয়া যাই। এস্থানে ৫।৬ খানা ঘর, দোকান আছে। সাধারণ জল খাবারের দ্রব্যাদিও মিলে। ডাকঘরের একটী পত্র-পেটিকাও আছে। এখানে একটী ক্ষুদ্র জলের ঝরণা নীরবে প্রবাহিতা হইতেছে। পর্ব্বতোপরি বিজলী গ্রামের শোভা পরম রমণীয় দেখা যাইতেছিল। তথা হইতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হই। দুই মাইল দূরে কালী কম্বলী বাবার আর একটী জলসত্র আছে, এই স্থানটী পর্ব্বত শিখরোপরি। এখান হইতে অতি নিম্নতম প্রদেশ দিয়া প্রবাহিতা গঙ্গার দৃশ্যটী মনোমুগ্ধকর। অনেক দূর পর্য্যন্ত পর্ব্বতগাত্রে অবস্থিত গ্রাম-

ছোট বিজলী চটী।

বড় বিজলী চটী।

গুলির শোভা বেশ সুন্দর দেখা যাইতেছিল। এই স্থান হইতে এক মাইল দূরে কুণ্ড চটী। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় এই চটীতে পৌঁছিয়া যাই। এ স্থানে ৩।৪ খানি ঘর ও খাদ্য দ্রব্যের

কুণ্ড চটী।

এবং সাধারণ জল খাবারের দোকান আছে। খানিক নিম্নদেশে একটী ঝরণা আছে। জল অতি সুমিষ্ট ও সদ্‌গন্ধ বিশিষ্ট। এখানে সাধারণ জলযোগের ব্যবস্থা ও রাত্রি যাপন করা হয়।

৫ই বৈশাখ প্রাতঃ-জলযোগের পর ক্রমশঃ উথরাই করিতে

বাঁদর মায়ি চটী।

আরম্ভ করি। উথরাইর মধ্যদেশে পথি-পার্শ্বে একটী সাধুর পর্ণ কুটীর ও পরিষ্কার জলের ঝরণা আছে। বেলা ৮টার সময় তিন মাইল দূরবর্ত্তী বাঁদর মায়ি চটীতে পৌঁছিয়া যাই। এই স্থানটী একবারে গঙ্গার উপর অবস্থিত। ৭।৮ খানা সুন্দর ঘর, আহার্য্য দ্রব্যের ও সাধারণ জলখাবারের দোকান পাঠ আছে। এখানে একটী প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে, তাহার পাদদেশ বেশ বান্ধান ও বসিবার উপ-যুক্ত। এখানে ঘণ্টাধিক কাল বিশ্রাম ও জলযোগ করা হয়। এখানে শ্রীশ্রীকেদারনাথের এক পাণ্ডা মহারাজের সহিত পরিচয় হয়। এস্থান হইতে ধীরে ধীরে আর একটী পাহাড়ের উপর চড়াই করিতে থাকি। এক মাইল উপরে কালী কম্বলী বাবার একটী জল-সত্র আছে। তথায় কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তে আবার ক্রমে উথরাই করিতে থাকি। পথি মধ্যে একটী পাহাড়ী ব্রাহ্মণ বালিকার

ভিক্ষার রকমারি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে দুই মাইল দূরবর্ত্তী মহাদেব চটীতে যাইয়া উপনীত হই। এইস্থানে মহাদেবের

মহাদেব চটী।

মন্দির, কালী কম্বলী বাবার ধর্ম্মশালা, ডাকের বাক্‌স্‌ ও ৮।১০ খানি ঘর, আহার্য্য দ্রব্যের ও সাধারণ জল খাবারের দোকান পাঠ আছে। চটীওয়ালাগণ বেশ ভাল লোক। ইহার পার্শ্ব দিয়া কল কল নাদে গঙ্গা প্রবাহিতা। এখানে পার্ব্বত্য দেশে গমনোপ-যোগী এক রকম জুতা পাওয়া যায়। এই চটীতে মধ্যাহ্নে আহারাদি সমাপনান্তে কিছু বিশ্রাম করা হয়। বেলা ৩টার সময় ধীর পদে পুনরায় অগ্রসর হইতে থাকি। এক মাইল সাধা-রণ চড়াইয়ের উপরিস্থিত স্থানে সরকারি ডাক বাঙ্গলা ও কালী কম্বলী বাবার জলসত্র আছে। ঐ স্থান হইতে সাধারণ উথরাই করিয়া আবার ক্রমোচ্চ একটী পাহাড়ে চড়াই করিতে থাকি। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় চারি মাইল দূরবর্ত্তী রাম চটীতে যাইয়া উপনীত হই। এই চটী পর্ব্বত-মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত। এখানে ৪।৫ খানি ঘর, আহার্য্য

রাম চটী।

দ্রব্য ও সাধারণ জলখাবারের দোকান পাঠ আছে। সাধারণ একটী জলের ঝরণা আছে, উহার জল বেশ ঠাণ্ডা ও সুমিষ্ট। এখানে সাধারণ জল যোগের ব্যবস্থা ও রাত্রিযাপন করা হয়। এখানকার চটীওয়ালারা বেশ ভাল লোক।

৬ই বৈশাখ প্রাতে জল যোগের পর বরাবর পর্ব্বত-মধ্যদেশ দিয়া অগ্রসর হইতে থাকি। এক মাইল দূরে মারু চটী। এখানে ২।৩ খানি ঘর, আহার্য্য দ্রব্যাদির দোকান ও বেশ পরিষ্কার জলের একটী ঝরণা আছে। পর্ব্বত গাত্রের উপরে ও নিম্নদেশস্থ গ্রামগুলির শোভা দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে থাকি। পথি মধ্যে একদল পাহাড়ী ব্রাহ্মণ বালক নৃত্য করিতে করিতে শ্রীবদরিনারায়ণ দেবের স্তোত্র শুনাইয়া ভিক্ষা চাহিল। তাহাদিগকে সময়োচিত আলাপ ব্যবহার ও দানে সন্তুষ্ট করিয়া তাহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণান্তে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া দুই মাইল দূরবর্ত্তী কাণ্ডী চটীতে উপস্থিত হই। এই স্থানটীর উপরে ও নীচে গ্রামের দৃশ্য মনোমুগ্ধকর। রাস্তার দুই পার্শ্বে আম্র কানন এবং সাধারণের বসিবার জন্য বেঞ্চ পাতা আছে। এখানে শ্রীশ্রীগোপাল জিউর মন্দির, ১০।১২ খানি ঘর, একটী ঔষধালয়, এবং সর্ব্বপ্রকারের খাদ্য দ্রব্য ও জল খাবারের দোকান পাঠ আছে। অদূরে একটী ধর্ম্মশালা ও পার্শ্বে পরিষ্কার জলের ঝরণা আছে। এই স্থানে কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে দুই মাইল সোজা পথে চলিয়া যাওয়া হয়; এই স্থানে দুইজন নাথ সম্প্রদায়ের সাধুর সঙ্গে দেখা হয়। তদনন্তর-এক মাইল উথরাইর পর ব্যাস গঙ্গার উপর লৌহ-নির্ম্মিত সেতু পার হইয়া যাই। এই স্থান হইতে একটী রাস্তা ব্যাস ঘাট হইয়া দেবপ্রয়াগ এবং অপরটী নিজামাবাদ অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। এই পথ দিয়া বহু

মারু চটী।

কাণ্ডী চটী।

মালপত্র হিমালয় প্রদেশে আমদানী হইয়া থাকে। এই ঝুলার অল্প দূরে ব্যাসগঙ্গা এবং গঙ্গার সঙ্গমস্থলে ব্যাস ঘাট চটী। এই স্থানে শ্রীশ্রীমন্মহর্ষি ব্যাস দেবের মূর্ত্তি আছে। কালী কম্বলী

ব্যাস ঘাট চটী।

বাবার ধর্ম্মশালা, অতিথি অভ্যাগতের জন্য সদাব্রতের বন্দোবস্ত, ১৫।১৬ খানি ঘর, সর্ব্বপ্রকারের খাদ্য দ্রব্য ও জল খাবারের দোকান পাঠ, এবং চটীর মধ্যভাগ দিয়া একটী সাধারণ জলের ঝরণা আছে। যাত্রী মাত্রেই সকলেই গঙ্গাতে অবগাহন স্নান ও গঙ্গাজল পান করিয়া থাকে। এখানে আমরা রাত্রিযাপন করি।

এই চটীতে মধ্যাহ্নকৃত্যাদি সমাপন ও আহারাদি করিয়া সেই

ছালুড়ী চটী।

দিনের জন্য অবস্থান করা হয়। রাত্রিতেও সাধারণ জলযোগের ব্যবস্থা করা হয়। ৭ই বৈশাখ প্রাতে জলযোগের পর গঙ্গার তীর দিয়া সোজা পথে অগ্রসর হইতে থাকি ও তিন মাইল দূরবর্ত্তী ছালুড়ী চটীতে পৌঁছিয়া যাই। এই স্থানে ৩।৪ খানা ঘর, খাদ্য দ্রব্যের ও সাধারণ জল খাবারের দোকান, জলের ঝরণা ইত্যাদি আছে। এই স্থানে সাধারণ বিশ্রাম করতঃ চলিতে আরম্ভ করিয়া তিন মাইল দূরবর্ত্তী উমরাসু চটীতে পৌঁছিয়া যাই। এই চটীর দৃশ্য

উমরাসু চটী।

পরম রমণীয়, পার্শ্বে আমের বাগান, জলের ঝরণা, বড় বড় ৪।৫টী সুন্দর পরিষ্কার ঘর, খাদ্য দ্রব্য ও জল খাবারের দোকান আছে। এই চটীতে পার্শ্ব-

বর্ত্তী গ্রামবাসীরা দুগ্ধ বিক্রয় করিতে আনে, এইস্থানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আবার চলিতে চলিতে আড়াই মাইল দূরবর্ত্তী সৌর চটীতে উপনীত হই।

সৌর চটী।

এস্থানের দৃশ্যও বেশ সুন্দর, ৩।৪ খানি ঘর, খাদ্য দ্রব্য ও জল খাবারের দোকান, পার্শ্বে জলের ঝরণা ইত্যাদি আছে। দেবপ্রয়াগ হইতে পাণ্ডা মহারাজগণ এইস্থান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া যাত্রীদের আদর অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত করিয়া লইয়া যান। এখানে খানিক বিশ্রামের পর অগ্রসর হইতে থাকি; পথিমধ্যে একটী ঝরণার উপর যে পুল ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে অল্লাধিক "উথরাই" ও "চড়াই" করিতে হইয়াছিল। ইহার মধ্যস্থলে একটী লোক বসিয়া যাত্রীগণকে রঘুনাথজির বাজনা শুনাইয়া পয়সা ভিক্ষা করিতেছিল। খানিক অগ্রসর হইবার পর অদূরবর্ত্তী পর্ব্বত গাত্রে দেবপ্রয়াগ সহরের দৃশ্য পরম সুন্দর দেখা যাইতে লাগিল। রাস্তার পার্শ্বে গঙ্গার ধারে অনেক ফল ফুলের বাগান আছে। সেই রমণীয় শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে আনন্দিত মনে বেলা সাড়ে দশটার সময় দেবপ্রয়াগে যাইয়া উপনীত হওয়া গেল।

দেবপ্রয়াগ।

দেবপ্রয়াগ অতি প্রাচীন ও সমৃদ্ধিশালী সহর, এইস্থানে শ্রীশ্রীবদরিনাথ হইতে আগতা অলকানন্দা গঙ্গা ও গঙ্গোত্তরি হইতে আগতা ভাগীরথী গঙ্গার সঙ্গমস্থল। সমাগত যাত্রীগণ সঙ্গমস্থলে স্নান, পিণ্ডদান, আদি বিশ্বেশ্বর, রঘুনাথ জিউ, ব্রহ্মতীর্থ, বশিষ্ঠগুহা, বরাহতীর্থ, সূর্য্যতীর্থ প্রভৃতি অনেক স্থান দর্শন করেন। এই পবিত্র

স্থানটীর—অলকানন্দার পূর্ব্ব পার টিহরি মহারাজের ও পশ্চিম পার ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের রাজ্য। উভয় পার্শ্বে প্রায় দুই শতের অধিক দ্বিতল ত্রিতল বাটী আছে। শ্রীশ্রীবদরিনাথের পাণ্ডা-মহারাজগণ এখানে বাস করেন। দেবপ্রয়াগ টিহরি রাজ্যের একটী সবডিভিসন। এখানে একজন ডিপুটী কালেক্টর, ফরেষ্টের আড্ডা ও পুলিশ চৌকী আছে। অলকানন্দার উপর লৌহ-নির্ম্মিত একটী সেতু আছে। উভয় স্থানে সর্ব্বপ্রকার খাদ্য দ্রব্যের, মনোহারি জিনিষের, বিবিধপ্রকার কাপড়, মিঠাই-আদি মিষ্টান্ন প্রভৃতির অনেকগুলি দোকান আছে। কালী কম্বলী বাবার ধর্ম্মশালা, তৎসংলগ্ন দাতব্য ঔষধালয়, অতিথি অভ্যাগতের সদাব্রতের বন্দোবস্ত, পোষ্ট আফিস, জুতার দোকান ইত্যাদি আছে। ধর্ম্মশালার পার্শ্বে প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে। হৃষীকেশ হইতে বাহির হইবার পর যাত্রীগণ এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শনে এবং সাধারণ লোকের আচার ব্যবহারে পরম সন্তোষ লাভ করেন। এইস্থান হইতে দুইটী রাস্তা, প্রথমটী গঙ্গা পার্শ্ব দিয়া টিহরি হইয়া গঙ্গোত্তরি ও যমুনোত্তরির দিকে, অপরটী অলকানন্দার পার্শ্ব দিয়া বরাবর শ্রীশ্রীবদরিনারায়ণের দিকে চলিয়া গিয়াছে। এখানকার পাণ্ডামহারাজগণ সমাগত যাত্রীগণকে শ্রীশ্রী৺কেদার বদরিনাথ তীর্থের মাহাত্ম্য শুনাইয়া থাকেন *। সন্ধ্যার সময় পাণ্ডা বালকেরা আরতির সম্ভার লইয়া আসিয়া যাত্রীগণকে আশীর্ব্বাদ করেন ও নানাবিধ দেব-

* এখানকার পাণ্ডাদিগের আচার ব্যবহার পরিশিষ্টে ঐ নামীয় প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

মূর্ত্তি দর্শন করাইয়া থাকেন। অলকানন্দাতে পাথরের সিঁড়ি বান্ধান একটী প্রকাণ্ড স্নান ঘাট এবং সঙ্গমস্থলেও একটী মজবুত ঘাট আছে। তথায় যাত্রীগণ একটী লৌহার শিকল ধরিয়া স্নান করিয়া থাকে। সঙ্গমস্থলে মৎস্যের ক্রীড়া পরম রমণীয় দৃশ্য। এখানকার চটীর বন্দোবস্ত বেশ ভাল এবং চটীওয়ালাগণও ভদ্র-লোক, জিনিষ পত্রও একটু সস্তা মিলে। এখানকার সব বাড়ী-গুলি শ্লেট পাথরের ছাউনি বিশিষ্ট এবং দেখিতে বেশ সুন্দর। এইস্থানে তিন দিন বাস করা হয় ও সব স্থানগুলি বিশেষ করিয়া দেখা হয়। একদিন গঙ্গার উপরিস্থিত দড়ির ঝুলা পার হইয়া জলের স্রোতের জোরে গম পেশা কল ও তাহার কারিগরি দেখা হয়। কয়েকজন সাধু মহাত্মার দর্শন ও উপদেশ লাভ ঘটে। স্থানীয় পাণ্ডা-মহারাজ শ্রীযুত রামলাল জিউর আচার ব্যবহার ও সৌজন্য প্রশংসনীয়। ১০ই বৈশাখ শনিবার প্রাতে জল-যোগের পর সঙ্গীয় সাধু মহাত্মাগণ সহ অলকানন্দার পার দিয়া সর্ব্বপ্রথমেই বদরিকাশ্রমে যাওয়া হইবে ইহাই স্থির করিয়া অগ্রসর হইতে থাকি। পথিমধ্যে সর্ব্বপ্রথম ছাগল ও ভেড়ার পিঠে মাল বোঝাই ও চালকদিগের বন্দোবস্তাদি দেখিয়া পরম আনন্দ লাভ করি। ব্যাস ঘাট চটীর পর হইতে পথ বেশ সুগম; চড়াই উথরাই বিশেষ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

প্রাতঃকালে পর্ব্বত গাত্রে ধবল মেঘের শোভা পরম রমণীয় দেখা যাইতেছিল। বেলা নয়টার সময় সাত মাইল দূরবর্ত্তী

রাণীবাগ চটীতে যাইয়া উপস্থিত হই। এই চটীতে ৩।৪ খানি ঘর, খাদ্য দ্রব্য ও জল খাবারের দোকান এবং বেশ পরিষ্কার জলের একটি ঝরণা আছে।

রাণীবাগ চটী

এই স্থানে ক্ষণেক বিশ্রামের পর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকি। বেলা সাড়ে দশটার সময় দুই মাইল দূরবর্ত্তী রামপুর চটীতে পৌঁছিয়া যাই। এই চটীতে ৪।৫ খানা বেশ বড় বড় ঘর, খাদ্যদ্রব্য ও জল খাবারের দোকান এবং পরিষ্কার জলের ঝরণা আছে। এখানে বেশ দুধ মিলে। চটীওয়ালারা বেশ ভাল লোক। এই স্থানে মধ্যাহ্ন কৃত্যাদি সমাপনান্তে আহারাদি করা হয়। বৈকালবেলা এক পস্‌লা বৃষ্টি হয়, সে জন্য রাত্রিতে বেশ ঠাণ্ডা অনুভূত হয়, রাত্রিতে সাধারণ জলযোগের ব্যবস্থা করা হয় ও ধুনী জ্বালিতে হইয়াছিল। ১১ই বৈশাখ রবিবার প্রাতে জলযোগের পর অগ্রসর হইতে থাকি। এই স্থানের রাস্তাটী আমাদের দেশের গ্রাম্য রাস্তার মত বোধ হইতে লাগিল। বেলা ৮টার সময় বিল্বকেদার চটীতে যাইয়া পৌঁছি। এই স্থানের অপর একটী নাম ঢুংঢম্ প্রয়াগ, কারণ উক্ত নামীয় একটী নদী ঐ স্থানে আসিয়া অলকানন্দার সহিত মিলিত হইয়াছে। সঙ্গমস্থলে একটী লৌহ ও কাষ্ঠ-নির্ম্মিত পুল; তাহার পার্শ্বে শ্রী৺বিল্বকেদার শিবালয় আছে। এই চটীতে ২।৩ খানি ঘর ও খাদ্যদ্রব্য এবং জল খাবারের দোকান আছে। ইহার সম্মুখে অলকানন্দার অপর পারে বর্ত্তমান টিহরি-নরেশ-প্রতিষ্ঠিত

রামপুর চটী

বিল্বকেদার চটী

স্বনামীয় কীর্ত্তিনগর অবস্থিত আছে। এইস্থানে অলকানন্দার উপর একটী লৌহ-নির্ম্মিত সেতু আছে ও একটী পাকা রাস্তা টিহরি রাজধানী পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। কীর্ত্তিনগর বেশ সমৃদ্ধি-শালী ও সুন্দর স্থান। ব্রিটীশ গড়বানের হেড্ কোয়াটার পৌড়ি হইতে টেলীগ্রাফের তার এই স্থান দিয়া টিহরি পর্য্যন্ত পৌঁছি-য়াছে। এইস্থান হইতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকি, পথিমধ্যে পাহাড়ী বালক বালিকাগণের নাচিয়া নাচিয়া শ্রী৺বদরি নারায়ণের স্তোত্র পাঠ অতি সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল।

শ্রীনগর

বেলা দশটার সময় তিন মাইল দূরবর্ত্তী শ্রীনগরে যাইয়া উপনীত হই। শ্রীনগর প্রাচীন গড়বানের রাজধানী ছিল, এ স্থানে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি আছে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বিরহী নদীর বাঢ় * বহিয়া এই নগরটী ভাসাইয়া লইয়া যায়। বর্ত্তমান শ্রীনগর ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের স্থাপিত, অতি সুন্দর ও শ্রীসম্পন্ন সহর। বিশেষ এ স্থানটী পূর্ব্বে ব্রিটীশ গড়বানের হেড কোয়াটার ছিল, সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইতে এই স্থান হইতে নয় মাইল দূরবর্ত্তী পৌড়ী নামক স্থানে

* লালসাঙ্গার ৪ মাইল উপরে যেখানে বাবলা চটী অবস্থিত তাহার সমান বিরহি নামীয় একটী নদী অলকানন্দার সহিত মিলিয়াছে। ১৮৯৩ সালে বর্ষাকালে উহার মুখস্থিত পাহাড় ধসিয়া পড়িয়া মুখ বন্ধ হইয়া যায়। তাহাতে ঐ নদীর ভিতরে এত জল জমিয়া যায় যে প্রায় ২০।২৫ মাইল ব্যাপী একটী হ্রদের মত হইয়া ১৮৯৪ সালের একদা রাত্রিতে হঠাৎ ঐ বাঢ় ভাঙ্গিয়া যায় ও তাহার প্রবল স্রোতের বেগে প্রাচীন শ্রীনগরকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। হিমালয় পর্ব্বতের ভিতরে শ্রীনগর সহরটা তখন অতি নিম্ন ভূমিতে ছিল, বর্ত্তমান সহর তদপেক্ষা ২০।২৫ হাত উচ্চ ভূমিতে স্থাপন করা হইয়াছে।

উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে। অলকানন্দা কিছু দূরদেশ দিয়া ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছেন। এখানে সরকারী ডাক বাঙ্গলা, পোষ্ট ও টেলীগ্রাফ অফিস, দাতব্য চিকিৎসালয়, হাঁসপাতাল, এণ্ট্রান্স-স্কুল, কয়েকটী হিন্দি ও সংস্কৃত পাঠশালা, কালী কম্বলী বাবার ধর্ম্মশালা ও অতিথি অভ্যাগতের জন্য সদাব্রতের বন্দোবস্ত এবং সাধারণ যাত্রীদের থাকিবার জন্য আরও কয়েকটী ধর্ম্মশালা, খ্রীষ্টান মিশনারির আড্ডা ও স্কুল, সর্ব্বপ্রকার আহার্য্য দ্রব্য ও মিঠাই, পেড়াদির দোকান এবং বিবিধ প্রকারের জিনিষ পত্রাদির অনেক গুলি দোকান পাঠ ইত্যাদি আছে। এ স্থানে জলের কষ্ট একটু বেশী। দুটী মাত্র ছোট ঝরণার জলে অভাব পূর্ণ হয় না। শ্রীনগরে অনেকগুলি দেব মন্দির আছে, তন্মধ্যে শ্রীশ্রী৺শঙ্করনাথ, শ্রীশ্রী৺কমলেশ্বর শিবের মঠ সর্ব্ব প্রসিদ্ধ। শ্রীশ্রী৺কমলেশ্বর শিবের মঠে যাইতে আমের বাগানটী অত্যন্ত সুন্দর। উক্ত শিবের অনেক জমিদারি আছে। পূর্ব্বতন মোহান্ত মহারাজগণ তাহা সাধু সেবাতেই নিয়োজিত রাখিতেন; বর্ত্তমান মোহান্ত মহারাজ শ্রীমৎ দুয়াল পুরিজিউ একজন পুত্রপৌত্রাদি সমন্বিত পাকা-পাকি গৃহস্থ জমিদার। তবে তিনি বর্ত্তমান সময়ে অতিথি অভ্যাগতগণকে একেবারে বিমুখ করেন না, সকলকে কিছু কিছু শুকনা আটা ও নূন দিয়া পরিতোষ করিয়া থাকেন। আকারে প্রকারে হঠাৎ কেহ যে তাঁহাকে সন্ন্যাসী মোহান্ত বলিয়া চিনিয়া লইবেন তাহার সাধ্য নাই। নাতি ও নাতনী পরিবেষ্টিত হইয়া যখন বসেন তখন পরম ত্যাগ ও ভোগ-বিলাস-বিহীনতার বিশেষ

লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইয়া থাকে। সাধু সমাজের এই কলঙ্কগুলি কখন্ যে অপসারিত হইবে তাহা সেই সর্ব্বনিয়ন্তারই বিদিত; তবে আলাপে ব্যবহারে সন্তুষ্ট করিবার গুণটুকু আছে, না হ'লে যে পসার বজায় থাকে না। এখানকার লোকসাধারণের চরিত্র প্রশংসনীয়। এই স্থানে শ্রীমৎ রামশরণ ব্রহ্মচারী মহারাজ একজন বেশ কর্ম্মঠ ও অধ্যবসায়ী মহাত্মা। তিনি আপন চেষ্টায় একটী ধর্ম্মশালা ও কতকগুলি দেব দেবীর মঠ স্থাপন করিয়া সদা সর্ব্বদা ভজন পূজনে ব্যাপৃত থাকেন। তিনি আমাদিগকে অতি আদরের সহিত তাঁহার আপনার আসনের কাছেই থাকিবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন। এখানে পরমানন্দে আহারাদি করা হয়, জিনিষ পত্রও বেশ সস্তা। কিন্তু এস্থানে আসিয়া হঠাৎ নাকের ভিতরে ও হাঁটুতে বেদনা করিতে থাকে। স্থানীয় হাঁসপাতালের এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুত খড়গ্ বাহাদুর মহাশয়ের প্রযত্নে ও সঙ্গীয় সাধু মহাত্মাগণের সেবা শুশ্রূষায় শীঘ্রই সুস্থতা লাভ করি। ডাক্তার বাবু বেশ সদালাপী ও সজ্জন এবং বিশেষ যত্ন সহকারে রুগ্ন ব্যক্তিদের চিকিৎসাদি করেন। এখানে একজন পর্য্যটক সাধুর মৃতদেহ * পরীক্ষার্থ

* শ্রীমৎ লহরানন্দ গিরি নামক জনৈক পর্য্যটক সাধু ভ্রমণ করিতে করিতে এস্থান হইতে ২৯ মাইল দূরবর্ত্তী ভাটোয়ারিগ্রামে শ্রীমৎ আত্মানন্দ গিরি নামীয় এক পাহাড়ী সাধুর আস্তানে যাইয়া পৌঁছেন। তিনি তথায় সপরিবারে বাস করিতেছিলেন। পূর্ব্বোক্ত সাধুর সহিত তাঁহার মনোমালিন্য হওয়াতে তিনি তাঁহাকে বহু প্রহার করিয়া পরিশেষে

আনীত হয়। তাঁহার শোচনীয় পরিণামের কথা ভাবিতে ভাবিতে আত্মহারা হইয়া যাই। গুরু ভাই শ্রীমান বসন্তানন্দজিউ অসুস্থ হইয়া এই হাঁসপাতালে আশ্রয় লইয়াছিলেন এ সংবাদ ডাক্তার বাবুর মুখে জানিতে পারিয়া তাঁহাকে দেখিতে যাই। ডাক্তার বাবুকে তাহার অবস্থাদির বিশেষ পরিচয় দিয়া ভালরূপে চিকিৎসা ও পথ্যাদির সুবন্দোবস্ত করা হয়। এই স্থানে দুইদিন থাকা হয় এবং প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দেখা হয়।

পৌড়ী

বর্ত্তমান বৃটীশ গড়বালের হেড কোয়াটার পৌড়ী নগর শ্রীনগর হইতে নয় মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে ডিপুটী কমিশনরের অফিস ও সরকারী বড় বড় অনেক অফিস, সেনা-নিবাস প্রভৃতি আছে। শ্রীনগরে একবার লুঠপাঠ হওয়ার দরুণ সমস্ত অফিসাদি এখানে উঠাইয়া আনা হইয়াছে। এই নগর হইতে একটী রাস্তা বরাবর কোটদ্বার রেলওয়ে পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদের মধ্যে যদি কেহ হিমালয় ভ্রমণ করিতে গমন করেন অথবা শিকারাদি করিতে উপস্থিত হন তাঁহারা প্রায় এই পথেই হিমালয়ে প্রবেশ করিয়া থাকেন। টিহরি রাজ্যের পলিটিক্যাল এজেণ্ট এই স্থানেই বাস করেন। পৌড়ীর জলবায়ু বেশ স্বাস্থ্যপ্রদ। সহরের মত নানাবিধ দোকান পাঠ ও সর্ব্বপ্রকারের রাজকীয় অফিসাদি আছে।

১৩ই বৈশাখ মঙ্গলবার প্রাতে জলযোগের পর ডাক্তার বাবু ও

গাত্রে পাথর বান্ধিয়া অলকানন্দাতে ডুবাইয়া দেন। উক্ত স্থানের জমিদার শ্রীযুত গবর সিংজি বহু অনুসন্ধানের পর উক্ত মৃতদেহ জল হইতে তুলিয়া পরীক্ষার্থ শ্রীনগরে চালান দেন।

ব্রহ্মচারী মহারাজের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকি। এ স্থান হইতে সুদূরবর্ত্তী বরফাবৃত পাহাড়ের দৃশ্য পরম সুন্দর দেখা গিয়াছিল। বরাবর সোজা পথ চলিয়া চারি

সুকরতা চটী

মাইল দূরবর্ত্তী সুকরতা চটিতে যাইয়া পৌঁছি। এই চটির সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড আম গাছ আছে। চটিটি অলকানন্দার উপরই অবস্থিত। ২।৩ খানা ঘর, আহার্য্য দ্রব্যের ও জলখাবারের দোকান ইত্যাদি আছে। এখানে কিয়ৎকাল বিশ্রামান্তে অগ্রসর হইতে থাকি। সাধারণ ক্রমোচ্চ প্রদেশ দিয়া যাইতে যাইতে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম ও কৃষি ক্ষেত্রগুলির শোভা পরম সুন্দর দেখা যাইতেছিল। ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে

মহারাজ চটী বা সুস্থা চটী

দেড় মাইল দূরবর্ত্তী মহারাজ বা সুস্থা চটিতে যাইয়া পৌঁছি। এই স্থানে দুই খানি ঘর ও সাধারণ দোকান পাঠ আছে, জলের ঝরণা বেশ সুন্দর ও অনেকগুলি লহর দুই দিকে কৃষি ক্ষেত্রে নীত হইয়াছে। এই স্থান হইতে বরাবর চলিতে চলিতে দুই মাইল দূরবর্ত্তী ভট্টীসেরা চটিতে

ভট্টি সেরা

যাইয়া উপনীত হই। এই স্থানে ২।৩টি দ্বিতল ও ২।৩ খানি বড় ঘর আছে, রাস্তার পার্শ্ব দিয়া জলের লহর বহিয়া যাইতেছে। এই চটিতে সাধারণ সর্ব্বপ্রকারের আহার্য্য দ্রব্য, মিঠাই, পেড়া ও দুধ ইত্যাদি পাওয়া যায়। চটিওয়ালা-গণ বেশ ভাল লোক। এখানে লহরের পার্শ্বস্থিত দ্বিতল বাড়ীতে থাকা হয় ও মধ্যাহ্ন কৃত্যাদি সমাপনান্তে আহারাদি করা হয়। বৈকাল বেলায় এক পসলা বৃষ্টি হইয়া রাত্রিতে

সাধারণ ঠাণ্ডা অনুভব হয়। রাত্রিকালে জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া এই চটিতেই রাত্রি যাপন করি।

১৪ই বৈশাখ বুধবার প্রাতে জলযোগের পর একটি চড়াই আরম্ভ করি, এই চড়াইয়ের উপরিভাগে সরকারী ডাক বাঙ্গলা আছে, ঐ স্থান হইতে আবার দুই মাইল উথরাই করিয়া খাঁথরা চটীতে যাইয়া পৌঁছি। এই চটীতে যথেষ্ট পরিমাণ দুগ্ধ পাওয়া যায়। সঙ্গীয় এক সাধু মহারাজ সকলকে দুধ পান করান। এই চটীতে পরিষ্কার জলের ঝরণা, ৪।৫ খানা বড় ঘর আছে। আহার্য্য দ্রব্য ও মিঠায়ের দোকান পাঠ আছে। চটীওয়ালাগণ বেশ ভাল লোক। এ স্থানে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তে আর একটী চড়াই করিতে আরম্ভ করি; প্রায় এক মাইল চড়াইর পর উথরাই করিয়া দুই মাইল দূরবর্ত্তী নরকোটী চটীতে যাইয়া পৌঁছি। এই স্থানে সাথী এক সাধু মহারাজ কিঞ্চিৎ অসুস্থতা অনুভব করার জন্য এই চটীতে মধ্যাহ্ন-কৃত্য ও আহারাদির বন্দোবস্ত করা হয়। এই চটীতে ৪।৫ খানি ঘর, আহার্য্য ও জলখাবারের দোকান এবং পরিষ্কার জলের ঝরণা আছে। এই স্থানের চটীওয়ালাগণও বেশ ভাল লোক। দুপুরের পর সামান্য গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হয়; রাত্রিতে জলযোগের বন্দোবস্ত করা হয়। এ স্থানে অনেক বিভিন্ন স্থানীয় যাত্রীর সহিত নানাবিষয়িণী আলাপে সময় অতিবাহিত করা হয়। এখানে শ্রীশ্রী৺কালী দেবীর একটী মূর্ত্তি আছে।

খাঁথরা চটী

নরকোটী চটী

১৫ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার প্রাতে জলযোগের পর আবার সাধারণ

একটী চড়াইতে উঠিতে আরম্ভ করি। উথরাইর আরম্ভেই শ্রী৺গরুড় জিউর এক মূর্ত্তি আছে। এই স্থান সাধারণ উথরাই ও সমতল দেশ দিয়া তিন মাইল দূরবর্ত্তী গুলাবরাই চটীতে যাইয়া পৌঁছি।

গুলাবরাই চটী

এই স্থানে আম ও কলার বাগান, ৩।৪ খানি ঘর, আহার্য্য দ্রব্য ও জলখাবারের দোকান এবং পরিষ্কার জলের ঝরণা আছে। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তে বরাবর সোজা পথে অগ্রসর হইতে থাকি। বেলা দশটার সময় দুই মাইল দূরবর্ত্তী রুদ্রপ্রয়াগে যাইয়া পৌঁছি। রুদ্রপ্রয়াগ শ্রীশ্রী৺বদরি-

রুদ্র প্রয়াগ

কাশ্রম হইতে প্রবাহিতা অলকানন্দা ও শ্রীশ্রী৺ কেদারনাথ পুরি হইতে বহির্গতা মন্দাকিনী গঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। অলকানন্দার উপরিস্থিত লৌহনির্ম্মিত সেতু পার হইয়া সঙ্গমস্থলে আসিতে হয়। সঙ্গমস্থলের উপরিস্থ প্রদেশে শ্রীশ্রী৺রুদ্রনাথ, নারদেশ্বর, গোপালেশ্বর, সোমেশ্বর মহাদেবের ও শ্রীশ্রী৺অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দির আছে। শ্রীমৎ মোহান্ত রামানন্দ জিউ মহারাজ এখানকার অধ্যক্ষ স্বরূপে থাকিয়া আপন সাধন ভজনে কালাতিপাত করেন। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, এ স্থানে ভগবান ত্রিপুরারি ভক্ত চুড়ামণি দেবর্ষি নারদ মুনিকে সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই স্থানে সরকারী ডাক বাঙ্গলা, পোষ্টাফিস, কালীকম্বলী বাবার ধর্ম্মশালা, অতিথি অভ্যাগতের জন্য সদাব্রত, সর্ব্বপ্রকার আহার্য্য দ্রব্যের দোকান আছে। দুগ্ধ ও মিঠাই, মিষ্টান্নাদির এবং নানাবিধ বস্ত্রাদির ও মনোহারি জিনিষের দোকান পাট সহ প্রায় কুড়ি খানা ঘর আছে। সঙ্গম-

স্থলে নামিবার সিঁড়ি বেশ সুবিধাজনক। এস্থলে দুই তিন জন পাণ্ডা মহারাজ সমাগত যাত্রিগণের কার্য্যাদি করাইয়া থাকেন। শ্রীশ্রী৺রুদ্রনাথের সিঁড়ির পার্শ্বস্থিত দ্বিতল বাড়ীতে আমরা আসন গ্রহণ করি। এখানে মধ্যাহ্ন কৃত্যাদি সমাপনান্তে আহরাদি করা হয়। দিবা দুই প্রহরের পর হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হইতে থাকে। এই স্থানে রাত্রি যাপন ও জলযোগের ব্যবস্থাদি করা হয়। এই স্থান হইতে একটী রাস্তা বরাবর মন্দাকিনীর পার দিয়া শ্রীশ্রী৺কেদারনাথ পুরিতে এবং অপরটী অলকানন্দার পার দিয়া শ্রীশ্রী৺বদরিকাশ্রমের দিকে চলিয়া গিয়াছে। সঙ্গীয় সাধু মহাত্মাগণের শারীরিক দুর্ব্বলতা নিবন্ধন আমাদের সর্ব্বপ্রথমে শ্রীশ্রীবদরিকাশ্রমে যাওয়া স্থিরীকৃত হয়। এই স্থান হইতে শ্রীশ্রী৺কেদার পুরি পর্য্যন্ত সমস্ত চটীর নাম ও দূরত্ব চটীর তালিকায় দেওয়া হইয়াছে।

১৬ই বৈশাখ প্রাতে জলযোগের পর সাধারণ ক্রমোচ্চ প্রদেশস্থ পথে চলিতে আরম্ভ করি। পথি মধ্যে প্রকাণ্ড একটী উপত্যকা ভূমি অতিক্রম করিতে হয়। তাহার অনতিদূরে

শিবানন্দী চটী

শিবানন্দী চটী। এই স্থানে প্রকাণ্ড একটী দ্বিতল বাড়ী, দোকান ও অন্য দুইটী সাধারণ ঘর আছে। পার্শ্বে পরিষ্কার জলের একটী ঝরণা আছে; এখানে কিয়ৎকাল বিশ্রামান্তে সাধারণ চড়াই ও উথরাই করিয়া একটী মঠের মধ্যদেশস্থ পথে অদূরবর্ত্তী পর্ব্বত গাত্রে বাঁদরের খেলা দেখিতে দেখিতে চারি মাইল দূরবর্ত্তী কামড়া চটীতে যাইয়া

উপনীত হই। এই চটীর পথে সরকারি ডাকবাঙ্গলা অবস্থিত।

কামড়া চটী

কামড়া চটীতে দুইখানি বড় ঘর, খাদ্য দ্রব্যাদির দোকান পাঠ আছে। দুই দিকে দুইটী পরিষ্কার জলের ঝরণা আছে। চটীওয়ালা মহারাজ বেশ সজ্জন ও সুপণ্ডিত। এই স্থানে পৌঁছিবার পর হইতেই বৃষ্টি আরম্ভ হয় ও অত্যন্ত ঠাণ্ডা অনুভব হইতে থাকে। এই স্থানে মধ্যাহ্ন কৃত্যাদি সমাপনান্তে আহারাদি এবং রাত্রিতে জলযোগের ব্যবস্থাদি করা হয়। এখানে শ্রীশ্রী৺বদরিনারায়ণের মেলা উপলক্ষে গবর্ণমেণ্টের তরফের তত্ত্বাবধায়ক মহাশয়ের সহকারী শ্রীযুত দুর্গাপ্রসাদ আঁগরওয়ালা মহাশয়ের সহিত বিশেষ আলাপ পরিচয় হয়। তিনি বেশ সজ্জন ও সদালাপী। এই দিন রাত্রিতেও খুব বৃষ্টি হয় ও অত্যন্ত ঠাণ্ডা অনুভূত হয়।

১৭ই বৈশাখ শনিবার প্রাতে জলযোগের পর অগ্রসর হইতে থাকি। উক্ত দিন সঙ্গীয় সাধু মাহাত্মাগণ যেন একটু দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের বল ও উৎসাহ-বৃদ্ধির জন্য "অভাবে স্বভাব নষ্ট ও অভাবে স্বভাব পুষ্ট" বিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে চারি মাইল দূরবর্ত্তী ছোট পিপ্পল চটীতে যাইয়া পৌঁছি। এস্থানে অলকানন্দা অতিক্রম করিবার জন্য একটী লৌহনির্ম্মিত সেতু আছে। চটীতে ২।৩ খানা ঘর, আহার্য্য, মিষ্টান্ন দ্রব্যাদি ও কাপড়ের দোকান পাঠ আছে। পার্শ্বে পরিষ্কার জলের ঝরণাও আছে। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রা-

ছোট পিপ্পল চটী

মের পর সাধারণ ক্রমোচ্চ দেশস্থ পথে অগ্রসর হইতে হইতে

বেলা ১১টার সময় চারি মাইল দূরবর্ত্তী কর্ণ প্রয়াগে যাইয়া পৌঁছি। কর্ণ প্রয়াগ, কর্ণ গঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গম-স্থলে অবস্থিত। এ রকম কিম্বদন্তী আছে যে, পুরাকালে কর্ণ মহারাজ এই স্থলে এক মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রী৺উমাদেবীর মন্দির ও কর্ণকুণ্ড এখানকার তীর্থ। স্থানীয় পাণ্ডা মহারাজ যাত্রিগণকে কার্য্যাদি করাইয়া থাকেন। কর্ণ প্রয়াগ তিনটী প্রধান রাস্তার সন্ধিস্থল। এখানে একটী রাস্তা হরিদ্বার হইতে, অপর দুইটীর একটী শ্রী৺বদরিকাশ্রম ও অপরটী কাঠ গুদাম বা রামনগর হইতে আসিয়া মিশিয়াছে। শ্রীশ্রী৺বদরিকাশ্রম প্রত্যাগত যাত্রিগণ শেষোক্ত পথে কাঠ গুদাম বা রামনগরে অথবা প্রথমোক্ত পথে শ্রী৺হরিদ্বার ধামে ফিরিয়া যান। ছোট পিপ্পল ও কর্ণ প্রয়াগের মধ্যবর্ত্তী স্থান অতিরিক্ত বৃষ্টির দরুণ উপরিস্থিত পাথর গড়াইয়া ভাসিয়া যায়। গবর্ণমেণ্টের ঝটিতি বহুলোক লাগাইয়া মেরামতের বন্দোবস্তটী প্রশংসনীয়। এখানে সরকারী ডাকবাঙ্গলা, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আফিস, পুলিশ চৌকী, দাতব্য ঔষধালয়, হাঁসপাতাল, কালীকম্বলী বাবার ধর্ম্মশালা আছে। অতিথি অভ্যাগতের জন সদাব্রতের বন্দোবস্ত বড় সুন্দর। সর্ব্বপ্রকারের আহার্য্য দ্রব্য ও মিঠাই মিষ্টান্নের, কাপড়ের ও অন্যান্য মনোহারি মাল পত্রের দোকান সহ প্রায় ১৫।২০ খানা ঘর আছে। পরিষ্কার জলের ঝরণা একটী আছে। এখানকার লোকজন বেশ শান্ত ও আমোদপ্রিয়। চটীওয়ালাগণও বেশ ভদ্র লোক। আমরা কালীকম্বলী বাবার ধর্ম্মশালায় আসন

কর্ণ প্রয়াগ

নির্দ্দেশ করি। মধ্যাহ্ন কৃত্যাদি সমাপনান্তে আহারাদি ও বিশ্রাম করা হয়। সন্ধ্যার সময় অর্দ্ধ সাহেব সাজা একটী মহাত্মার সাক্ষাৎ হয়। পরিচয়ে জানিতে পারিলাম তাঁহার নাম শ্রীশ্রীমৎ কুলানন্দ পুরী স্বামী, তিনি বর্ত্তমান শ্রীনগরের শ্রীশ্রী৺কমলেশ্বর মহাদেবের শ্রীমৎ মোহাণ্ড মহারাজ দয়ালপুরি জিউর পৌত্র। পারিষদবর্গ সহ পিসিমাতা ঠাকুরাণীর বাড়ীতে বেড়াইতে যাইতেছেন। তখন কালের কুটীল গতির অনন্ত প্রভাব ও সময়ের ফল ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মনে নানাবিধ ধিক্কারের উদয় হয় এবং ভগবৎ সমীপে তাঁহাদের কল্যাণ কামনা করি। রাত্রিতে জলযোগের ব্যবস্থার পর নানাবিধ সদালাপে রাত্রি যাপন করা হয়।

১৮ই বৈশাখ প্রাতে জলযোগের পর, সাধুর ব্যবহার, প্রেম, প্রীতি, আনন্দ, সরলতা ও উদারতা-বিষয়িণী সদ্‌বিষয়ের আলাপনে সঙ্গীয় সাধু মহারাজগণকে নূতন বলে প্রণোদিত করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাকি। অলকানন্দার তীরের সাধারণ উচ্চ প্রদেশস্থ পথে চলিতে চলিতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী জয়কাণ্ডী চটীতে উপনীত হই। এই স্থানে দুটী সুন্দর ঘর, খাদ্য দ্রব্যের দোকান ইত্যাদি আছে। পার্শ্বস্থিত ঝরণার জল বেশ পরিষ্কার। এই স্থানে খানিক বিশ্রামান্তে বরাবর চলিতে চলিতে সাড়ে তিন মাইল দূরবর্ত্তী লঙ্গাসু চটীতে যাইয়া পৌঁছি। এখানেও ২।৩ খানি ঘর, আহার্য্য দ্রব্যাদির দোকান ও পরিষ্কার জলের ঝরণা ইত্যাদি আছে। এই স্থান হইতে সাধারণ উচ্চ প্রদেশস্থ পথে অগ্রসর

জয়কাণ্ডী চটী

লঙ্গাসু চটী

হইতে হইতে আড়াই মাইল দূরবর্ত্তী হড়াকোটী চটীতে যাইয়া পৌঁছি। এখানে সাধারণ ২।৩ খানা খাদ্য দ্রব্যের ও মিষ্ট দ্রব্যাদির দোকান এবং জলের ঝরণা ইত্যাদি আছে। খানিক বিশ্রামের পর সাধারণ চড়াই করিয়া পর্ব্বত গাত্রস্থিত রাস্তায় যাইতে যাইতে দুই মাইল দূরবর্ত্তী সনোলা চটীতে যাইয়া উপনীত হই। এই স্থান একটু উন্নত দেশ। সরকারি ডাকবাঙ্গলা ও চটীতে ৩।৪ খানি দোকান আছে; এখানে আহার্য্য দ্রব্যাদি ও মিষ্ট দ্রব্যাদি সাধারণ মত পাওয়া যায়। পার্শ্বে জলের একটী ঝরণা আছে, জল তত ভাল নহে। এই স্থানে মধ্যাহ্ন-কৃত্যাদি সমাধা করিয়া আহারাদি করা হয় ও পাহাড়ী মেয়েদের কম্বল বুনার তাঁত দেখিয়া এবং তাহাদের স্বাবলম্বন ও কার্য্য কুশলতার প্রশংসা করি। আহারান্তে অল্প বিশ্রাম করিয়া দুই মাইল দূরবর্ত্তী নন্দ-গঙ্গার উপর লৌহ সেতু অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যা ছয়টার সময় নন্দ প্রয়াগে যাইয়া পৌছি। এই পথে চলিতে চলিতে দূরবর্ত্তী পর্ব্বত শৃঙ্গে বরফস্তুপ অতিশয় মনোরম দেখা যাইতেছিল আর অধস্তন প্রদেশে অর্থাৎ পর্ব্বত গাত্রে শ্রেণীবদ্ধ শোভাময় চির ও দিবদারু বা দীপতরু বৃক্ষগুলি মৃদুমন্দ পবনান্দোলিত হইয়া শোঁ শোঁ শব্দে যাত্রিগণের পথশ্রান্তি দূর করিবার জন্য যেন নানাবিধ উপদেশ বাক্যে মনের স্থিরতা সম্পাদন করিয়া দিতে-ছিল। নন্দ-প্রয়াগ, নন্দগঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। সঙ্গম স্থলের উপর শ্রী৺চণ্ডিকাদেবী, নন্দ, যশোদা,

হড়াকোটী চটী

সনোলা চটী

নন্দ প্রয়াগ

কৃষ্ণ, বলরাম ও লক্ষ্মী দেবীর মূর্ত্তি প্রভৃতি আছে। মন্দিরের পূজারিগণই সমস্ত দর্শনাদি করাইয়া থাকেন। পর্ব্বতমধ্য-প্রদেশে অবস্থিত ক্ষুদ্র নগরীর শোভা পরম রমণীয়। প্রাচীন কালে মহর্ষি কণ্ব এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন এ জন্য ইহার অপর নাম কণ্বাশ্রম। এই স্থানে একটী লাইব্রেরী, পোষ্টা-ফিস, কয়েকটী মনোহারী জিনিষ ও পুস্তকের দোকান এবং সর্ব্বপ্রকারের আহার্য্য দ্রব্য ও মিঠাই আদির দোকান সহ প্রায় ২০।২৫ খানি ঘর, স্থানে স্থানে অনেক গুলি ঝরণা আছে। এখানকার অধিকাংশ গৃহাদি কাঠের ছাউনি বিশিষ্ট। এই স্থানে জলযোগের ব্যবস্থা ও রাত্রি যাপন করা হয়।

সোমবার প্রাতে একদল ভূটীয়া* গ্রীষ্ম ঋতুর আগমনে আপনা-দের আবাস স্থানে ফিরিয়া যাইতেছিল, সর্ব্বপ্রথম তাহাদের কাছে দুইটী চমরি গাই দেখি। তাহাদের কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক বা বালক বালিকা সকলেই পিঠে এক একটী বোঝা লইয়া যাইতে-ছিল। ছেলে মেয়ে গুলির শরীরের রং টুক্ টুকে ফরসা, দেখিতে যেন বোধ হয় কৃষ্ণনগরের কুম্ভকারদিগের প্রস্তুত কার্ত্তিক ও লক্ষ্মী সরস্বতী বিশেষ বা বিধাতা যেন স্বহস্তে তাহাদিগকে এত রূপের ও গুণের সমষ্টি দিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মধ্যাহ্নে

* তিব্বত বা ভারতের উত্তর সীমান্ত পাহাড়ী লোকদিগকে স্থানীয় লোকেরা ভূটিয়া বলে। তাহারা শীতের সময় নীচের দিকে নামিয়া আসে, আবার শীতাবসানে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া যায়। তাহারা গ্রীষ্মাধিক্য প্রদেশে থাকিতে ভাল বাসে না; কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলেই দেখিতে পরম সুন্দর, কর্ম্মঠ ও স্বাধীনচেতা।

সঙ্গমস্থলে স্নান ও ঠাকুর দেবতাদি দর্শন এবং আহারাদি কার্য্য সম্পন্ন করা হয়, বৈকাল বেলায় বাজারে বেড়াইতে যাওয়া হয়। রাত্রিতেও জলযোগের ব্যবস্থাদি করা হয়। এখানে বেশ ঠাণ্ডা অনুভব হইতেছিল।

২০শে বৈশাখ মঙ্গলবার প্রাতে জলযোগের পর পর্ব্বত-মধ্য-দেশস্থ পথে চলিতে আরম্ভ করিয়া চারি মাইল দূরবর্ত্তী মিঠানা বা মঠিয়ানা চটীতে যাইয়া পৌছি। এই স্থানে ২।৩ খানা ঘর, পরিষ্কার জলের ঝরণা, খাদ্য দ্রব্য ও জলখাবারের দোকান আছে। এখানে সাধারণ বিশ্রামের পর বরাবর সোজা পথে চলিতে থাকি। পথে দেরাদুন প্রবাসী একজন সাহেব বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তিনি তথা হইতে শীকার করার পাশ লইয়া বদরিকাশ্রমের উপরে আরও ১৬ মাইল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবেন ও শীকার আদি করিবেন, বলিলেন। তিনি, বদ্রীনাথ, গঙ্গাসাধু ও যোগী কাহাকে বলে? এই সকল বিষয়ে প্রশ্ন করেন। তাঁহাকে যথাসাধ্য সমস্ত নামগুলির ব্যাখ্যা করিয়া বুঝান হয়। পরিশেষে গঙ্গাজলের গুণের বিশেষত্ব ও এ প্রকার সর্ব্বগুণ সম্পন্ন জলবিশিষ্টা নদী পৃথিবীর আর কুত্রাপি নাই। সর্ব্বত্রই গুণের আদর আছে; তজ্জন্য আর্য্য ঋষিগণ ইহার এত প্রশংসা ও গুণের আদর বা পূজা করিতেন এবং আমরাও তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণ করি, ইত্যাদি বিষয়ে অনেক আলোচনা হয়। পরিশেষে পরম সন্তোষ লাভ করিয়া সাহেব বিদায় গ্রহণ করেন ও আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে ধাবিত

মিঠানা বা মঠিয়ানা চটী

হন। আমরাও সকলে তিন মাইল দূরবর্ত্তী কুহেড় চটীতে পৌঁছিয়া একটী অশ্বত্থ গাছের তলায় বিশ্রামার্থে উপবেশন করি। এখানে ৩।৪ খানি ঘর, পরিষ্কার জলের ঝরণা, খাদ্য দ্রব্যের দোকান ও সাধারণ জলখাবারের দোকানাদি আছে। নন্দপ্রয়াগ হইতে সুদূরবর্ত্তী পর্ব্বত শৃঙ্গস্থ ধবল তুষার রাশির সহিত ঈষৎ কৃষ্ণাভ মেঘমালার সন্মিলন জনিত পরম রমণীয় দৃশ্যের শোভা সন্দর্শনে হৃদয়ে পরমানন্দ অনুভূত হইতেছিল।

কুহেড় চটী

এই স্থান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সাধারণ পথে চলিতে চলিতে বেলা সাড়ে নয় ৯॥০ টার সময় তিন মাইল দূরবর্ত্তী লালসাঙ্গাতে যাইয়া পৌঁছি। লালসাঙ্গার অপর নাম চমোলী, ইহা অপার গড়বালের হেড কোয়ার্টার। এখানে একজন সবডিভিসনাল অফিসার থাকেন। আদালত গৃহ, সরকারী দুখানা ডাক বাঙ্গলা, পুলিশ চৌকী, দাতব্য ঔষধালয়, হাঁসপাতাল, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস, বালকের পাঠশালা, সর্ব্বপ্রকার খাদ্য দ্রব্য ও মিষ্টান্নের দোকান ইত্যাদি সহ ২০।২৫ খানি খুব বড় টীনের ও শ্লেট পাথরের ছাউনি বিশিষ্ট দ্বিতল ও ত্রিতল পাকা বাড়ী আছে। এখানে কোন বিশেষ ধর্ম্মশালাদি নাই, চটীওয়ালাগণ বেশ ভাল লোক ও বন্দোবস্তাদি ভাল। ঘরগুলি বেশ পরিষ্কার। সর্ব্বসাধারণ অলকানন্দার জলই ব্যবহার করিয়া থাকেন। হাঁসপাতালের পাশে একটী জলের নল আছে; সব সময়ে তাহাতে জল

লালসাঙ্গা বা চমোলী।

পাওয়া যায় না। লালসাঙ্গা একটী প্রধান সন্ধি স্থল, শ্রী৺কেদার-নাথের পথ নানা চটী হইতে একটী পথে আসিয়া এখানে মিলিত হইয়াছে। এই স্থানে শ্রীবদরিনারায়ণ দর্শনাভিলাষী যাত্রিগণ বরাবর সিধা পথে আগত এবং শ্রী৺কেদারনাথ হইতে আগত ও শ্রী৺বদরিনারায়ণ দর্শনান্তে দেশাভিমুখে প্রত্যাগত সর্ব্বপ্রকার যাত্রীর সম্মিলন হইয়া থাকে। অলকানন্দার উপর লৌহ নির্ম্মিত সেতু আছে। নদীর কিনারায় উভয় পার্শ্বস্থ শ্বেত প্রস্তরের শোভা অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। এখানে একটী দ্বিতল বাড়ীতে আসন গ্রহণ করিয়া মধ্যাহ্ন কৃত্য সমাপনান্তে আহারাদি করা হয়। বৈকাল বেলায় অলকানন্দার ধারে বেড়াইতে যাওয়া হয়। রাত্রিতে জলযোগের ব্যবস্থাদি হয়। প্রায় দশটার সময় হইতে প্রবল ঝড় বহিতে থাকে ও তদনন্তর এক পসলা বৃষ্টি হয় ও ঠাণ্ডা অনুভব হইতে থাকে। এখানে বস্ত্রাদির দোকানও আছে।

২১শে বৈশাখ প্রাতে জলযোগের পর লালসাঙ্গা হইতে বহির্গত হই, সঙ্গীয় একজন সাধু মহারাজ হঠাৎ কটিদেশে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিতে থাকেন, তাঁহার কম্বলাদি সমস্ত নিজে বান্ধিয়া লইতে হয়। সাধারণ একটু চড়াই করিয়া দুই মাইল দূরবর্ত্তী মঠ চটীতে যাইয়া পৌঁছি। এই চটীতে ৩।৪ খানি ঘর, খাদ্য দ্রব্যাদির দোকান ও পরিষ্কার জলের ঝরণা এবং পার্শ্বে একটী কলার বাগান আছে। এস্থানে উক্ত সাধু মহারাজের শুশ্রূষার্থে কতক্ষণ অপেক্ষা

মঠ চটী।

করিতে হয়। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া চলিতে সক্ষম হইলে আবার অগ্রসর হইতে থাকি। ক্রমশঃ সাধারণ একটু চড়াইর পর দুই মাইল দূরবর্ত্তী বমোনা বা বাবলা চটীতে যাইয়া পৌঁছি। এই চটীর সম্মুখেই বিরহী নদী আসিয়া অলকানন্দার সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহারই বাঢ় ভাঙ্গিয়া যে প্রবল জল-স্রোত বহিয়াছিল তদ্দারা সমতল ক্ষেত্রে অবস্থিত শ্রীনগরকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল।

বমোনা বা বাবলা চটী।

এই চটীতে ২।৩ খানি বড় ঘর, খাদ্য দ্রব্য ও মিষ্ট দ্রব্যাদির দোকান এবং পার্শ্বে পরিষ্কার জলের ঝরণা আছে। চটীওয়ালা বেশ বিশ্বাসী লোক। এস্থানে সাধারণ বিশ্রামের পর চলিতে আরম্ভ করিয়া দুই মাইল দূরবর্ত্তী সিয়াহার চটীতে যাইয়া পৌঁছি। পথি-পার্শ্বস্থ একটী ঝরণার জলধারা দেখিতে যেন দুগ্ধ ধারার মত বোধ হইতে লাগিল। এই চটী একটী প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় অবস্থিত। ৩।৪ খানি ঘর, খাদ্য দ্রব্য ও জলখাবারের দোকান, পার্শ্বে জলের ঝরণা আছে। এই চটীতে বেশ দুধ পাওয়া যায়। এখানে মধ্যাহ্ন কৃত্যাদি সমাপনান্তে আহারাদি ও বিশ্রাম করা হয়। চটীওয়ালা মহারাজ বেশ সজ্জন।

সিয়াহার চটী।

বৈকালে ৩টার সময় আবার চলিতে আরম্ভ করি। এস্থান হইতে এক মাইল দূরে হাট চটী, এখানে একটী ছোট মন্দিরে বিল্লেশ্বর শিব, ২।৩ খানি ঘর, খাদ্য দ্রব্য ও জল খাবারের দোকান এবং পার্শ্বে জলের ঝরণা আছে। এখানে অনেকগুলি বিল্ব বৃক্ষ আছে। এস্থানে

হাট চটী।

অল্প বিশ্রাম করিয়া একটী লৌহ সেতু পার হওতঃ একটী চড়াই করিতে আরম্ভ করি। প্রায় দেড় মাইলের উপরে যাইয়া পিপ্পলকোটী চটীতে যাইয়া পৌঁছি। এস্থানে সরকারি ডাক বাঙ্গলা, পোষ্ট অফিস, ১৫।২০ খানি বৃহৎ গৃহ, সর্ব্বপ্রকার খাদ্য দ্রব্য ও মিঠাই পেড়ার দোকান, বস্ত্রাদি ও মনোহারি জিনিষের বিপণি প্রভৃতি আছে। এখানকার জল একটু দূর হইতে আনিতে হয়। পর্ব্বত-মধ্যস্থিত পিপ্পলকোটী স্থানটীর প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। এখানে অনেকগুলি অশ্বত্থ গাছ ও সুন্দর ছোট খাট একটী বাগানের মধ্যে একটী শিবালয় আছে। তথায় কয়েক জন সাধু মহাত্মা থাকেন, তাহারই পার্শ্বে একটী ধর্ম্মশালা অবস্থিত। এখানে রাত্রিতে জলযোগের ব্যবস্থাদি করা হয়। চটীওয়ালা-গণ বেশ ভাল লোক ও চটীর বন্দোবস্ত বেশ ভাল।

পিপ্পলকোটী চটী।

২২শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার প্রাতে জলযোগের পর বরাবর পর্ব্বত গাত্রস্থ পথে অগ্রসর হইতে থাকি। বরাবর সোজা পথে চলিবার পর সাধারণ উথরাই করিয়া গরুড় গঙ্গা নামক স্থানে যাইয়া পৌঁছি। এইস্থান দিয়া যে নদী বহিয়া যাইতেছে তাহার নাম গরুড় গঙ্গা, প্রায় যাত্রিগণ সর্পভয় নিবারণ হেতু এই নদীতে স্নান করেন ও নদীর ছোট ছোট প্রস্তরখণ্ড গুলি স্ব স্ব গৃহে লইয়া যান। এখানে শ্রীশ্রীগরুড় জিউর মন্দির, কালী কম্বলী বাবার ধর্ম্মশালা, ৮।১০ খানি বড় বড় ঘর, খাদ্য দ্রব্য ও মিঠাই আদির দোকান আছে।

গরুড় গঙ্গা।

এই স্থানে সামান্য বিশ্রাম করিবার পর সাধারণ একটী চড়াইতে উঠিতে আরম্ভ করি। এইস্থানে শ্রীশ্রীবদরিনারায়ণ দেবের রাওল সাহেব মহোদয়ের প্রধান জ্যোতিষী পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার মুখে বর্ত্তমান রাওল সাহেবের গুণাবলী শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অতি শীঘ্র দেখিবার ইচ্ছা হয় ও তাঁহার কল্যাণের নিমিত্ত ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করা হয়। ক্রমশঃ চলিতে চলিতে দুই মাইল দূরবর্ত্তী টাঙ্গনী চটীতে যাইয়া পৌঁছি। এখানে ২।৩ খানা ঘর, খাদ্য দ্রব্যের দোকান ও জলের ঝরণা ইত্যাদি আছে। এইস্থান হইতে বরাবর পর্ব্বত মধ্যস্থিত পথে এক মাইল দূরে দেওয়ার চটী। এখানেও দুইখানা ঘর আছে, তবে জলের বন্দোবস্তটী ভাল নহে, খাদ্য দ্রব্যের দোকানাদিও আছে। এই পথে চলিতে চলিতে মৃদু মন্দ সমীরণে শরীরে বেশ শান্তি দিতেছিল। এইস্থান হইতে ১ মাইল দূরে সাধারণ উথরাই করিয়া পাতাল গঙ্গা চটীতে যাইয়া পৌঁছি। ইহার অপর নাম গণেশ গঙ্গা। এখানে শ্রীশ্রীগণেশ জিউর একটী ছোট মন্দির, ৭।৮ খানি বড় ঘর, খাদ্য দ্রব্য ও মিষ্টান্নের দোকান আছে। পাতাল গঙ্গার জল অত্যন্ত ঠাণ্ডা। এস্থানে মধ্যাহ্ন কৃত্যাদি সমাপনান্তে আহারাদি করা হয়। এইস্থানে শ্রীমৎ রামানন্দ স্বামীজিউ নামক এক জন পরমহংস আমাদের সঙ্গে আহারাদি করেন। দুপুরের পর হইতে আকাশে ঘন কাল মেঘ দেখা দিতে লাগিল, ক্রমশঃ চতুষ্পার্শ্বস্থ পাহাড়গুলি তাহার

টাঙ্গনী চটী ও দেওয়ার চটী।

পাতাল গঙ্গা।

মধ্যে ডুবিয়া গিয়া অত্যন্ত ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতে লাগিল, সন্ধ্যার সময় এক পসলা বৃষ্টি হইয়া যায়, রাত্রিতে অতিরিক্ত ঠাণ্ডার জন্য ধুনী জ্বালিতে হয়। সাধারণ জলযোগের ব্যবস্থাদি করিয়া এখানে রাত্রি যাপন করা হয়।

২৩শে বৈশাখ শুক্রবার প্রাতে জলযোগের পর সাধারণ একটী চড়াই করিতে আরম্ভ করি। তদনন্তর সাধারণ উথরাই পর দুই মাইল দূরবর্ত্তী গুলাবকোটী চটীতে যাইয়া পৌঁছি। এস্থানে সরকারী ডাক বাঙ্গলা, ৪।৫ খানি ঘর, খাদ্য দ্রব্য, জল খাবারের দোকান, জলের ঝরণা ইত্যাদি আছে। এস্থানে সাধারণ বিশ্রামান্তে অগ্রসর হইতে থাকি। এস্থানে আর একটী সাধারণ চড়াই আছে। এই পর্ব্বতগাত্রস্থিত শ্বেত প্রস্তরগুলির শোভা পরম সুন্দর, মধ্যে মধ্যে অনেকগুলি পাথরের গায়ে অভ্র ও তামার অংশ দেখা যাইতেছিল। ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে দুই মাইল দূরবর্ত্তী কুমহাড় চটীতে যাইয়া উপনীত হই। এস্থান হইতে একটী পাহাড়ী পথে শ্রী৺কল্পেশ্বর বা পঞ্চম কেদারনাথে যাওয়া যায়। স্থানীয় লোক সঙ্গে থাকিলেই ভাল হয়। এখানে পোষ্ট অফিস, ৮।১০ খানা বড় ঘর, খাদ্য দ্রব্য ও মিঠাই আদির দোকান এবং জলের ঝরণা ইত্যাদি আছে। এ স্থান হইতে প্রায় ২০০ গজ দূরে কর্ম্মনাশা গঙ্গা প্রবাহিতা, যাত্রীগণ জন্ম জন্মান্তরীয় সঞ্চিত কর্ম্মনাশের জন্য উক্ত নদীতে স্নান করিয়া থাকেন। এই স্থানের দৃশ্য পরম সুন্দর। পূর্ব্ব,

গুলাবকোটী চটী।

কুমহাড় চটী।

উত্তর ও পশ্চিমস্থিত পর্ব্বত শৃঙ্গের ধবল তুষার রাশির উপর পতিত সূর্য্য কিরণের অপূর্ব্ব শোভা, প্রাণ-মন সুশীতল করিয়া সমস্ত পথ-ক্লান্তি দুরীভূত করিতেছিল। এস্থানে মধ্যাহ্ন কৃত্যাদি সমাপনান্তে আহারাদি করা হয়। এখানে একজন সাধুকে মাধুকরী ভিক্ষা ও একজন দাক্ষিণাত্য প্রদেশীয় সাধুকে আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হয়। এখানকার চটীওয়ালারা বেশ ভাল লোক। এই চটীতে একজন রামানন্দী সাধুর ধৃষ্টতা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তাহাকে সাধারণের সহিত ব্যবহার কি রকমে করিতে হয় এই বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলিয়া বোধ হয়। পরিচয়ে জানিতে পারিলাম তিনি একজন মঠধারী মোহন্ত মহারাজ ও বিশেষ টাকা পয়সার অধিকারী, সর্ব্বশেষ পয়সার গরমে তিনি এরূপ ব্যবহার করেন, তাঁহার ভাবভঙ্গীও কথা বার্ত্তাতেই এ কথা প্রকাশ পাইতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় সমাগত একদল সাধু মহাত্মা 'ওঁ হর হর মহাদেব' এই স্তোত্রটী পাঠ করেন। তাঁহাদের পাঠের কায়দা এত সুমধুর হইয়াছিল যে, চটীস্থ সকলে আপনাপন কার্য্য ত্যাগ করিয়া অনন্য মনে স্তোত্র পাঠ শুনিতেছিলেন। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম তাঁহারা হৃষীকেশ ধামস্থ প্রসিদ্ধ মঠধারী শ্রীমৎ পরমহংস ধনরাজ গিরিজিউ মহারাজের শিষ্য সম্প্রদায়,সম্প্রতি শ্রীশ্রী৺বদরি নারায়ণ দর্শনাভিলাষী। তাঁহাদের সহিত আলাপাদিতে পরম আনন্দ লাভ করিলাম। রাত্রিতে জলযোগের বন্দোবস্তাদি করা হয়। রাত্রিতে বেশ ঠাণ্ডা অনুভূত হয়।

২৪শে শনিবার প্রাতে জলযোগের পর কর্ম্মনাশা গঙ্গা অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে একটী চড়াইতে উঠিতে থাকি; তদনন্তর পর্ব্বত মধ্যস্থ প্রদেশে চলিতে আরম্ভ করিয়া দুই মাইল দুরবর্ত্তী খানাটী চটীতে উপনীত হই। এই স্থান হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল নিম্নদেশে বৃদ্ধ বদরি বা প্রাচীন বদরিকাশ্রম। অতি পূর্ব্বে এই তীর্থ-যাত্রীগণ এই পর্য্যন্ত আসিয়া শ্রীশ্রীনারায়ণ দেবের দর্শন করিয়া ফিরিয়া যাইতেন, ইহার উপরে শীতাধিক্য ও বরফের স্তূপ থাকার দরুণ আর অগ্রসর হইতে পারিতেন না। এখন এস্থানে অত্যন্ত অল্প লোকের সমাগম হইয়া থাকে, এমন কি অধিকাংশ যাত্রী ইহার খবরও জানেন না। এই চটীতে ৩।৪ খানা ঘর, খাদ্য দ্রব্য ও জল খাবারের দোকান এবং জলের ঝরণা আছে। প্রাচীন বদরিকাশ্রম দর্শন করিয়া যাত্রীগণকে এস্থানে ফিরিয়া আসিতে হয়। এস্থানে সাধারণ বিশ্রামান্তে সঙ্গীয় সাধু মহারাজগণের পথশ্রান্তি নিবারণ কল্পে ভক্তের মান ও তীর্থ পর্য্যটনের উদ্দেশ্য বিষয়ক গল্প বলিতে বলিতে দুই মাইল দুরবর্ত্তী উদীসচটীতে যাইয়া পৌঁছি। এই চটীতে ২।৩ খানি ঘর, খাদ্য দ্রব্য ও জল খাবারের দোকান এবং জলের ঝরণা ইত্যাদি আছে। এইস্থান হইতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া এক মাইল দুরবর্ত্তী সিঙ্গুধার চটীতে যাইয়া পৌঁছি। এ চটী হইতে একটী পথ নিম্নদেশ দিয়া শ্যামা চটী হইয়া বিষ্ণু প্রয়াগে পৌঁছিয়াছে। অপরটী সোজা যোশীমঠ অভিমুখে

খানাটী।

উদীস চটী।

সিঙ্গুধার চটী

চলিয়া গিয়াছে। এই চটীতে ২।৩ খানা ঘর খাদ্য দ্রব্য ও জল খাবারের দোকান, পার্শ্বে জলের ঝরণা আছে। এখানে সাধারণ বিশ্রামান্তে এক মাইল দূরবর্ত্তী যোশীমঠে বেলা ১০টার সময় যাইয়া উপস্থিত হওয়া গেল।

যোশী মঠ।

যোশীমঠ বা জ্যোতিষী মঠকে স্থানীয় লোকেরা জ্যোতির্ম্মঠ বলে। শ্রী১১০৮ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য জগদ্‌গুরু শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য স্বামীজিউ মহারাজ প্রতিষ্ঠিত চারি ধামের চারিটী প্রধান মঠের * মধ্যে উত্তরাখণ্ডস্থ ইহা একটী প্রধান মঠ। অপর তিনটী ধামে যে প্রকার শঙ্করাচার্য্য মহারাজের গদী আছে এখানে তেমন কিছুই নাই, কেবলমাত্র নামটী আছে। সর্ব্বপ্রথমে যখন শ্রীশ্রীমদ্‌গুরুদেব মুখে যোশী

* শ্রী ১১০৮ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য জগদ্‌গুরু শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য স্বামী জিউ মহারাজ 'একমেবা দ্বিতীয়ম্' সনাতন ধর্ম্ম প্রচারার্থে ভারত খণ্ডের চারিটী প্রধান স্থানে চারিটী মঠ স্থাপন ও চারিটী প্রধান শিষ্যকে আচার্য্য ও প্রচারক কার্য্যে ব্রতী করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে উত্তরাখণ্ডে বা হিমালয়ে জ্যোতিষী মঠ বা যোশীমঠ, পশ্চিম প্রান্তে দ্বারকাধামে সারদা মঠ, দাক্ষিনাত্যে মহীশূর অঞ্চলে শৃঙ্গগিরি বা শৃঙ্গেরি মঠ; পূর্ব্ব প্রান্তে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে ভোগবর্দ্ধন বা গোবর্দ্ধন মঠ ও চারজন প্রধান শিষ্য বা আচার্য্য যথাক্রমে—তোটক, হস্তামলক, সুরেশ্বরাচার্য্য ও পদ্মপাদ—চারি মঠে ১০ জন শিষ্য করেন, তোটকের শিষ্য গিরি, পর্ব্বত ও সাগর; হস্তামলকের শিষ্য তীর্থ ও আশ্রম; সুরেশ্বরাচার্য্যের শিষ্য সরস্বতী, ভারতি ও পুরি এবং পদ্মপাদের শিষ্য বন ও আরণ্য ইত্যাদি উপাধিতে বিভূষিত হয়েন। তাঁহারাই বর্ত্তমান দশনামী সন্ন্যাসী নামে খ্যাত। শেষোক্ত তিন মঠে এখন শ্রীমৎ শঙ্কর স্বামীর গদী আছে এবং উক্ত আসনে যাঁহারা বসেন তাঁহারাই তাঁহার পবিত্র নামেই অভিহিত হন।

মঠের নাম শুনিয়াছিলাম তখন মনে মনে কত কি ভাবিয়াছিলাম তাহার ইয়ত্তা নাই, এখানে আসিলে কত সাধু মহাত্মার দর্শন ও সঙ্গলাভে জীবন সার্থক করিব, কিন্তু সশরীরে উপস্থিত হইয়া তাহার কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আজ ভারতবর্ষের সাধু সম্প্রদায়ের অর্দ্ধেকের অপেক্ষাও বেশী যোশী মঠের সাধু বলিয়া সর্ব্বসাধারণকে আপন প্রতিভা ও জ্ঞানবলে বলীয়ান করিতেছেন, হে জ্ঞানী সাধু মহাত্মাগণ! একবার আপনারা সকলে আপনাপন দলবল সহ আসিয়া দেখুন যে মঠের সাধু মহাত্মা বলিয়া পরিচয় দিয়া আজ সর্ব্বসাধারণ হইতে বিশেষ আদর সম্মান ও পূজা পাইতেছেন, সেই মঠের অবস্থা একবার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন, একবার চাক্ষুষ হইলে মরমে মরিয়া যাইবেন, সংসারে অসম্ভব কিছুই নাই, বিহিত যত্ন ও চেষ্টার ফলে অসাধ্য সাধন হইয়া যায়, এখন আমোদের উন্নতির দিন, এই বিশ্ব ভূমণ্ডলের নূতন যুগের সূচনা দেখিয়াও কি আমাদের নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা উচিত? এ কাজ নূতন কিছুই নহে, কেবল নষ্টোদ্ধার কর মাত্র, অন্য তিনটী ধামে যে প্রকার শ্রীমচ্ছঙ্কর স্বামীর তিনটী গদি আছে ও তিনজন মহাত্মা আজও তাঁহারই পবিত্র নামে সর্ব্বত্র শ্রীমদ্ জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য মহারাজ বলিয়া পূজিত হইতেছেন, এই যোশীমঠে কি তাহার বিহিত বন্দোবস্ত হইতে পারে না? সকলের সমবেত চেষ্টার ফলে ইহা নিশ্চয় সাধিত হইবে। এখন সর্ব্বসাধারণ পাঠক-বৃন্দের অবধানার্থ যোশী মঠের বর্ত্তমান দুর্দ্দশাও তাহার কারণ বর্ণন করিতেছি। যোশীমঠ

বা জ্যোতিষী মঠের দুরাবস্থা বর্ণন করিতে লেখনী অগ্রসর হই-তেছে না, হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে এ প্রকার ব্যবস্থা ছিল যে, এই যোশীমঠের অধ্যক্ষ বা শ্রীশ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য স্বামীজিউ মহারাজের আসনে যিনি থাকিবেন তিনি শ্রীশ্রী৺বদরি-নারায়ণ দেবের রাওল * থাকিবেন, তিনি গ্রীষ্মের ছয়মাস অর্থাৎ বৈশাখী শুক্লা অক্ষয়া তৃতীয়া হইতে দেওয়ালি পর্য্যন্ত শ্রীশ্রী-বদরিকাশ্রমে থাকিয়া তথায় শ্রীশ্রী৺নারায়ণ দেবের পূজা ইত্যাদির ব্যবস্থাদি করিবেন এবং বাকী ছয় মাস শীতের সময় যখন উক্ত স্থান বরফে আবৃত হইয়া যাইবে তখন এই যোশী মঠে থাকিয়া শ্রীশ্রী৺নারায়ণ দেবের পূজাদির বন্দোবস্তাদি করিবেন, শ্রীশ্রী৺-বদরিনারায়ণ দেবের সেবা পূজার জন্য যে প্রকার জায়গা জমি আছে এ রকম বোধ হয় অন্য তিন মঠে আছে কিনা সন্দেহ। ক্রমশঃ রাওল মহোদয়েরা স্বপথ ভ্রষ্ট হইতে লাগিলেন। কালের কুটিল গতিতে সরস্বতী দেবী তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইলেন ; নানা রকমের অবিদ্যা শক্তি আসিয়া তাহাদিগকে মোহিত করিতে লাগিল। এই স্থানের একটী গুণ যাহা আমি স্বয়ং অনুভব করিয়াছি তাহাই প্রকাশ করিতেছি, এখানকার জল বায়ুর এমনই গুণ যে, সাধারণ মত আহারাদিতেও শরীরে বিশেষ শক্তি সঞ্চার করিয়া দেয়। যাঁহারা আত্মক্রিয়াপরায়ণ তাঁহাদের এস্থানে উন্নতির চরম স্থান। এখানে আত্মোন্নতির

* এখানে মোহান্তকে রাওল নামে অভিহিত করা হয়।

চেষ্টা অতি সহজে সফল হয় এবং তদ্বিপরীতে ফলও সম্পূর্ণ বিপরীত হয়। সর্ব্বশেষ রাওল যিনি ছিলেন তাঁহার সমাধির পর তাঁহার আসনে আর উপযুক্ত লোক মিলিল না ও তাঁহারও কোন সাধু শিষ্য ছিল না। তখন উক্ত আসনে কে বসিবেন তাহা লইয়া মহা হৈ চৈ উঠিল, তদুপরি উক্ত স্থানও এক রকম দুর্গম ছিল। তখন তত্রত্য রাজা (বর্ত্তমান টিহরি রাজের পূর্ব্ব পুরুষ) অন্য তিন ধামে এ বিষয়ে খবর পাঠাইলেন ও উপযুক্ত মহাপুরুষের নির্ব্বাচনের জন্য অনুরোধ করিলেন, তখন অপর তিন মঠ ও সেই বিষয়ে বিশেষ নজর দিলেন না, পরিশেষে শৃঙ্গেরি মঠ এই মত দিলেন যে শ্রীশ্রীমৎ শঙ্করাচায্য মহারাজের স্বগোত্রীয় কেহ যদি উক্ত আসনে বসেন তাহা হইলেও হইবে, কিন্তু তাহাদিগকে চিরব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ পূর্ব্বক থাকিতে হইবে। বস্তুতঃ তাহার বংশাবলির এ রকম নিয়ম আছে যে, কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্র বংশরক্ষার্থ দার পরিগ্রহ করিবেন কিন্তু অপর সকলে চিরব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক আত্মক্রিয়াপরায়ণ হইয়া কালাতিপাত করিবেন। উক্ত নির্দ্দেশক্রমে তাঁহারই বংশের একজন রাওল-পদে বৃত হইলেন ও কার্য্যাদি চালাইতে লাগিলেন। এখন তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে গৃহস্থ হইয়া গিয়াছেন (বর্ত্তমান রাওলের জীবনী পরিশিষ্টে উক্ত নামীয় প্রবন্ধ দেখুন), তাই এখন মঠের এরূপ দুরাবস্থা হইয়া উঠিয়াছে যে, দুজন সাধু সন্ন্যাসী যাইয়া দুই চারদিন তথায় স্থান পাইবেন সেইরূপ বন্দোবস্তও নাই। আর আদৌ যেস্থান যোশীমঠ বলিয়া খ্যাত, সেখানে কিছুই

নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সব যোশী মঠ নামীয় গ্রামের ভিতরে আসিয়াছে, উক্ত স্থানে একখানা অতি জীর্ণ ঘরে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য মহারাজ প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺জ্যোতিষীশ্বর শিব আছেন অতি সাধারণ মত পূজা * হয়, কোন ভোগরাগের ব্যবস্থা নাই, একজন মাত্র পূজারি আছে তাহার রকম দেখিলে মঠের অবস্থা সব বোঝা যায়, রাওল সাহেব ভুলেও একবার ঐ দিকে যান কিনা সন্দেহ। বিশেষতঃ তাঁহারও এখন সময়াভাব, সদা সর্ব্বদা আপন বিলাস-ভবনে মো সাহেব ও স্ত্রী পুত্ত্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া আমোদ আহ্লাদেই দিন অতিবাহিত হইয়া যায়। শিবালয়ের দক্ষিণাংশে সাধারণ একটী ঘর আছে, তথায় হঠাৎ কোন সাধু সন্ন্যাসী আসিয়া পড়িলে অবস্থান করেন, কিন্তু তাহাকেও ভিক্ষার্থে বাহির হইতেই হইবে। ইহার সংলগ্ন আরও একটী দেবালয় আছে, তাহারও অবস্থা তদ্রূপ। কিন্তু পর্ব্বত মধ্যস্থিত স্থানটীর প্রাকৃতিক শোভা দেখিলে আত্মহারা হইয়া যাইতে হয় ও প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। এখানে অনেক রকমের ফুল ও ফলের বাগান আছে,মন্দিরের উপর একটী প্রাচীন বহুশাখা বিশিষ্ট বৃক্ষ ও দক্ষিণ পার্শ্বে পরিষ্কার জলের একটী ঝরণা আছে। দুই জন সাধু কখনও বা গ্রামে কখনও বা এখানে আসিয়া

* শিবের পূজার জন্য সাধারণ দেবোত্তর সম্পত্তি পূজারি মহারাজের তত্ত্বাবধানে আছে ও তদ্দ্বারা অতি কষ্টে তিনি আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। রাওল সাহেব হইতে কোন রকমের সাহায্যাদি করা হয় না। পূজারি মহারাজের সহিত আলাপে এ খবর জানা গেল।

থাকেন, তাহাদের দুরাবস্থার অবধিই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এসমস্ত দেখিয়া ও উক্ত সাধুদের কাছে শুনিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। শ্রীশ্রীমৎশঙ্কর স্বামীর নাম উচ্চারণ করিয়া তাঁহারই শ্রীশ্রীচরণে বিহিত নিবেদন করিলাম। এই প্রকার একটী প্রধান স্থানের এরূপ দুরাবস্থা দেখিলে কাহার না প্রাণে ব্যথা লাগে। যাহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করা হইল তাহা সর্ব্বসাধারণের অবগতি ও প্রতিকারের জন্য এখানে লেখা হইল।

যোশীমঠ নামীয় গ্রামে শ্রী৺নরসিংহ দেবের মন্দির, বাসুদেব ও দুর্গাদেবীর মন্দির, সরকারী ডাক বাঙ্গলা রাওল সাহেবের * প্রতিষ্ঠিত রাজা মহারাজা যাত্রীর অবস্থিতির জন্য একটী বাঙ্গলা, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস, পুলিশ চৌকী, দাতব্য ঔষধালয়, ছেলেদের শিক্ষার জন্য একটী পাঠশালা, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র নম্বুরি মহোদয় প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৈলাসকীর্ত্তি আশ্রম নামীয় এক আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়, শ্রীশ্রী৺বদরি নারায়ণ দেবের ধনাগার এবং রাওল সাহেবের বিলাস ভবন, ২০।২৫ খানা দোকান ও শতাধিক বাড়ী সর্ব্ব প্রকার আহার্য্য দ্রব্য ও মিঠাই আদির দোকান, পরিষ্কার জলের ঝরণা আছে। এখানে যথেষ্ট পরিমাণে গোল আলুর চাষ হয়। এই খানে একটী

* সাহেব শব্দটী প্রায় বড় লোকের নামের শেষে এতদ্দেশে ব্যবহৃত হয় ও অতি সম্মান সূচক, তদ্দরুন রাওল মহাশয়কেও সকলে রাওল সাহেব বলিয়া অভিবাদন করেন।

দ্বিতল বাড়ীতে বাসস্থান নির্দ্দেশ করা হয়। মধ্যাহ্ন কৃত্যাদি সমাপনান্তে আহারাদি করিতেছি এমন সময় স্থানীয়' লোকেদের মধ্যে একটী উৎসবানন্দের ভাব দেখিতে পাইলাম, অনুসন্ধান দ্বারা জানা গেল যে, আজ শ্রীশ্রীগরুড় ভগবানজিউর উৎসব অর্থাৎ শ্রীশ্রী৺বদরিনারায়ণদেব গরুড় বাহনে যোশীমঠ হইতে শ্রীবদরিকাশ্রমে যাত্রা করিবেন আর তৎসঙ্গে শ্রীযুত রাওল সাহেবেরও যাত্রা হইবে। গরুড় ভগবান জিউর উৎসবটী বেশ সুন্দর ও একটু ফাঁকা আড়ম্বরও আছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে শ্রীশ্রী৺বদরিনারায়ণ দেব শীতের ছয় মাস এস্থানে অবস্থিতি করেন। এখন শীতান্তে আবার ছয় মাসের জন্য স্বীয় আশ্রমে যাইবেন, উৎসবে বেশ রকমারি আছে ঃ—পার্শ্বস্থিত পর্ব্বত শৃঙ্গে একটী খুঁটী পোতা হইল তাহার মস্তকদেশ হইতে এক গাছি দড়ি বান্ধিয়া শ্রী৺নৃসিংহ দেবের মন্দিরের সাম্‌নে আর একটী খুঁটীতে বান্ধা হইল, শেষোক্ত খুঁটীর গোড়ায় শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মী দেবী নানাবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি লইয়া অবস্থান করিতেছিল। নানাবিধ বাদ্য বাজনা দ্বারা উৎসবের সূচনা করা হইল, চারিদিক হইতে দর্শক মণ্ডলির ভিড় হইতে লাগিল। শ্রীযুক্ত রাওল সাহেব সপুত্র ও মো-সাহেবগণে পরিবৃত হইয়া আগে, পার্শ্বে ও পেছনে শ্বেত চামরের হাওয়া, লাঠি,সোটা, আরদালি ও বাদ্যকার-গণের বিবিধ আনন্দপূর্ণ বাদ্যধ্বনী ইত্যাদি পরিবেষ্টিত হইয়া স্বীয় বিলাশ ভবন হইতে বাহির হইয়া যেস্থানে শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীদেবী শ্রী৺নারায়ণ দেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তৎপার্শ্ববর্ত্তী

একটী দ্বিতল গৃহের বারান্দায় আসন গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর চারিদিক হইতে জয় গরুড় ভগবানকি জয়, জয় বদরি বিশাল লালকি জয়, জয় বদরিনাথ্কি জয় ইত্যাদি আনন্দ-ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। তখন শ্রী৺নারায়ণ দেব স্বীয় পর্ব্বত শৃঙ্গস্থ শীতাবাস আশ্রম হইতে গরুড় বাহনে উক্ত দড়ির উপর দিয়া অবতীর্ণ হইলেন, শ্রী৺লক্ষ্মীদেবী মাঙ্গলিক দ্রব্যে শ্রী৺নারায়ণের অর্চ্চনা ও আরতি পুর্ব্বক স্বীয় আবাসে প্রবেশ করিলেন। আর সমাগত দর্শকমণ্ডলী স্ব স্ব আবাসে এবং রাওল সাহেব পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিলাস ভবনে প্রবেশ করিলেন। এরকম ফাঁকা উৎসব আর জীবনে দেখা হয় নাই, উৎসব উপলক্ষে কোন প্রকারের ভোজ, বিতরণ, দান ইত্যাদি কিছুই হইল না। পূর্ব্বে এই দিনে একটী মহা আনন্দ হইত ও প্রসাদাদি বিতরিত হইত; এখন কালবশে সব লুপ্ত প্রায় হইয়াছে। অদ্য হইতে ২৮শে বৈশাখ পর্য্যন্ত এ রকম প্রতিদিন বিবিধ ফাঁকা উৎসব হইবে জানা গেল। ঐদিন রাওল সাহেব সদলবলে শ্রীশ্রীবদরিকাশ্রম অভিমুখে রওনা হইবেন। এখানে ২৪শে, ২৫শে বৈশাখ পর্য্যন্ত অবস্থান ও নিত্যনূতন ফাঁকা আড়ম্বর পূর্ণ উৎসবাদি দেখিতে লাগিলাম। ২৪শে বৈশাখ দুপুরের সময় সব সাধুগণ সহ যোশীমঠে গিয়া দর্শনাদি করি।

২৬শে বৈশাখ সোমবার শ্রীশ্রীমদ্‌গুরুদেবের ফটো খানি লইয়া আবার সঙ্গীয় সব সাধুগণ সহ জ্যোতিষি বা যোশীমঠে বেড়াইতে যাওয়া হয়। এখানে শ্রীমৎ জয়ানন্দ ব্রহ্মচারী

মহারাজ ও শ্রীমৎ বিশ্বম্ভর গিরিজিউ মহারাজের সহিত আমার দেখা হয়। তাঁহারা অতিকষ্টে কিছুকাল যাবত এখানে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা বর্ত্তমান রাওল সাহেবের অনেক গুণাবলির কীর্ত্তন করিলেন। পরিশেষে সকলে সমবেত হইয়া ভগবৎ সমীপে যথোচিত প্রতিকারের জন্য নিবেদন করা হইল। এই স্থানটীও একটী প্রধান সন্ধিস্থল। এই স্থান হইতে একটী পথ নেপাল, তিব্বত ও মানস সরোবরের দিকে,অপরটী শ্রীশ্রীবদরিকাশ্রম হইয়া কৈলাশ পর্ব্বতের অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। স্থানীয় লোক মুখে শুনা গেল,এখানেও শীতকালে ২।৩ হাত বরফ জমে। পরিশেষে ধর্ম্মপ্রাণ পাঠকবৃন্দ সমীপে আমার বিনীত ও সসম্মান নিবেদন এই যে, তাঁহাদের সকলের দৃষ্টি এই পথে আকৃষ্ট হইয়া যাহাতে শ্রীমদ্ জগদ্গুরু শঙ্কর স্বামীর অক্ষুণ্ণ কীর্ত্তিমালা লুপ্ত প্রায় অবস্থা হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হয় তাহার ব্যবস্থা দ্বারা সকলে যে তাঁহাকে জগদ্গুরু বলিয়া মানিয়া থাকেন তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রদান করুন। কি উপায় অবলম্বনে কার্য্য সিদ্ধি হইবে তাহা এখানে বাহুল্য ভয়ে লিখিত হইল না। আমার সঙ্গে চিঠি পত্রাদি ব্যবহার করিলে অথবা সংবাদাদি ও সাক্ষাৎ করিলে সব খবর দিতে সমর্থ হইব।

যোশীমঠে তিন দিন অবস্থিতি ও দর্শনাদির পর ২৭শে বৈশাখ মঙ্গলবার প্রাতে জলযোগের পর একটী উথরাই করিতে আরম্ভ করিয়া এক মাইল দুরবর্ত্তী বিষ্ণুপ্রয়াগে পৌঁছি। যোশীমঠ হইতে দুইটী পথ বিষ্ণুপ্রয়াগ অভিমুখে গিয়াছে; একটী

শ্রীশ্রী৺নরসিংহ দেবের মন্দিরের পূর্ব্বভাগ দিয়া নামিয়া গিয়াছে, অপরটী সরকারী ডাক বাঙ্গলার সম্মুখ দিয়া নিম্ন পথে চলিয়া গিয়াছে। উথরাই কিম্বা চড়াইতে প্রথমোক্তটী বিশেষ কষ্টসাধ্য কিন্তু দ্বিতীয় পথটী সর্ব্বপ্রকারে সুবিধাজনক। আমরা পথের খবর না জানা হেতু প্রথম পথে চলিয়াছিলাম। বিষ্ণু-প্রয়াগ বিষ্ণু-গঙ্গা ও অলকা-নন্দার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এস্থানে শ্রীশ্রীনারায়ণ ও শিবের মন্দির, ৩।৪ খানি খাদ্য দ্রব্য ও মিঠাই আদির দোকান আছে। সঙ্গমস্থলের পার্শ্বে বিষ্ণু গঙ্গার উপর একটী লৌহ সেতু আছে। সঙ্গমস্থলে স্নান করিতে একটু সাবধান হইতে হয়, কারণ এখানে জল অত্যন্ত গভীর এবং স্রোতের বেগও অত্যন্ত প্রখর। এস্থান হইতে সাধারণ পথে অগ্রসর হইয়া এক মাইল দূরবর্ত্তী বলদোড়া চটীতে যাইয়া পৌঁছি। এখানে কালী কম্বলী বাবার ধর্ম্মশালা ও একটী দোকান আছে। এখানে খাদ্য দ্রব্য ও মিঠাই আদি এবং পরিষ্কার জলের ঝরণা ইত্যাদি আছে। এস্থানে একটু বিশ্রামান্তে সাধারণ ক্রমোচ্চ পথে যাইয়া একটী লৌহ সেতু পার হইয়া দুই মাইল দূরবর্ত্তী ঘাট চটীতে যাইয়া পৌঁছি। এখানে ৩।৪ খানি বড় বড় ঘর খাদ্য দ্রব্যের ও মিঠাই আদির দোকান আছে, অলকানন্দার উপরই চটী অবস্থিত, জলের সুবিধাও ভাল। এখানে মধ্যাহ্ন-কৃত্য সমাপনান্তে আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করা হয়, দুপুরের

বিষ্ণু প্রয়াগ।

বলদোড়া।

ঘাট চটী।

পর খুব এক পসলা বৃষ্টি হইয়া যায়। বেলা ৪টার পর এখান হইতে অগ্রসর হইতে থাকি। এ স্থানের প্রায় অর্দ্ধ মাইল উত্তর ভাগে অলকানন্দার উপর একটী কাঠের পুল অতিক্রম করিয়া দুর্গম পার্ব্বত্য পথে কাকভূষণ্ডী ও লোক পাল তীর্থে যাইতে হয়, উক্ত স্থানে যাত্রী সমাগম ক্কচিৎ হইয়া থাকে, যাইতে হইলে পাহাড়ী লোক ও উপযোগী আহার্য্য দ্রব্যাদি সঙ্গে লইতে হয়।

কাকভূষণ্ডী ও লোকপাল।

আমরা বরাবর সোজা পথে পাণ্ডুকেশ্বর তীর্থে গিয়া উপস্থিত হই। এখানে পৌঁছিবার পর হইতেই মূষল ধারে বৃষ্টি হইতে থাকে, পাণ্ডুকেশ্বর পরম রমণীয় স্থান। এখানে তৃতীয় বদ্রীনাথ বা শ্রীশ্রীযোগধ্যানীনারায়ণ দেবের অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত মূর্ত্তি ও উদ্ধবজিউর মূর্ত্তি দুইটী সুন্দর মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছে। জনশ্রুতি আছে, যে উক্ত নারায়ণ মূর্ত্তি পিতামহ ব্রহ্মা দেবরাজ ইন্দ্রকে দিয়াছিলেন এবং ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে দিয়াছিলেন। পাণ্ডবেরা স্বর্গারোহণের সময় এস্থানে উক্ত মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া যান। মন্দিরের ভিতরে তাম্রফলকে তাঁহাদের স্বহস্তের কতকগুলি লেখা আছে। কিন্তু এযাবৎ উহা কেহ পড়িতে পারে নাই, এখানে কালীকম্বলী বাবার ধর্ম্মশালা, পোষ্ট অফিস, অতিথি অভ্যাগতের জন্য সদাব্রত ২০।২৫ খানি ঘর, আহার্য্য দ্রব্য ও মিঠাই আদির দোকান আছে। এখানে অলকানন্দা পার্শ্ব দিয়া বহিয়া যাইতেছে। পার্শ্বস্থিত পর্ব্বত গৃহে এখন পাণ্ডবগণের স্মৃতিচিহ্ন বিদ্যমান আছে।

পাণ্ডুকেশ্বর।

এখানে রাত্রিতে জলযোগের ব্যবস্থা ও বাস করা হয়, রাত্রিতে বেশ ঠাণ্ডা অনুভূত হইয়াছিল।

২৮শে বৈশাখ সকাল বেলায় বরফাবৃত পর্ব্বত শৃঙ্গের উপর সূর্য্যরশ্মির পতন দৃশ্য অত্যন্ত সুন্দর দেখাইতেছিল। প্রাতে জলযোগের পর অর্দ্ধ মাইল দূরবর্ত্তী শেষধারা নামক স্থানে যাইয়া পৌঁছি। এখানে সরকারী ডাক বাঙ্গলা পরিস্কার জলের ঝরণা ও রীমা মহারাজের ধর্ম্মশালা ও অতিথি অভ্যাগতের জন্য সদাব্রতের ব্যবস্থা আছে। এস্থান হইতে বরাবর সোজা পথে চলিয়া আড়াই মাইল দূরবর্ত্তী লামবগড় চটীতে যাইয়া পৌঁছি। পথিমধ্যে একটী বেগবতী ঝরণার উপব পুল না থাকার দরুণ বরফ গলা অতি ঠাণ্ডা জলের উপর দিয়া চলিতে হয়। এখানে ৩।৪ খান বড় বড় ঘর, খাদ্য দ্রব্য ও মিষ্ট দ্রব্যের দোকান পরিস্কার জলের ঝরণা ও কালীকম্বলী বাবার ধর্ম্মশালা, অতিথি অভ্যাগতে জন্য সদাব্রত ইত্যাদি আছে। এস্থানে সাধারণ বিশ্রামের পর আর একটী লৌহ নির্ম্মিত সেতু পার হইয়া সাধারণ চড়াই ও উথরাই করিতে করিতে বেলা ১০টার সময় হনুমান চটীতে যাইয়া পৌঁছি।

শেষধারা।

লামবগড় চটী।

লামবগড় চটী হইতে হনুমান চটী পর্য্যন্ত রাস্তার মধ্যে ২।১ জায়গায় এত অল্প পরিসর স্থান দিয়া যাতায়াত করিতে হয় যে, একবার পদস্খলন হইলে আর রক্ষা নাই। কিন্তু উভয় পার্শ্বস্থ নিবিড় বনভূমির

হনুমান চটী।

শোভা অতি রমণীয়। ক্ষীর গঙ্গা নামীয় একটী ক্ষুদ্র নদী অলকা-নন্দার সহিত মিলিত হইয়াছে। নদীটির জল দেখিতে ঠিক দুধেরই মত। প্রবাদ আছে যে, হনুমান চটীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ পর্ব্বতে মহারাজ মরুৎ দেবতাগণ সহ মিলিয়া সুরগুরু বৃহস্পতির সাহায্যে উক্ত স্থানে এক বৃহৎ যজ্ঞ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এখনও পাহাড়ের যেখানে খনন করা যাউক না কেন পোড়া তিল যব ও অঙ্গার পাওয়া যায়। হনুমান চটীর পার্শ্বস্থিত পাহাড়ে বৈথানস মুনির আশ্রম ছিল। এখানে হনুমান জিউর মন্দির, কালীকম্বলী বাবার ধর্ম্মশালা, ৩।৪ খানা বড় বড় ঘর, খাদ্য দ্রব্য ও মিঠাই আদির দোকান ও পার্শ্বে পরিষ্কার জলের ঝরণা প্রভৃতি আছে। এখানে মধ্যাহ্ন কৃত্যাদি সমাপনান্তে আহারাদি করা হয় ও চারিদিক ঘুরিয়া দেখা হয়। রাত্রিতে জলযোগের ব্যবস্থা করা হয়। এখানে অত্যন্ত ঠাণ্ডা অনুভূত হয়।

২৯শে বৃহস্পতিবার প্রাতে জলযোগের পর ক্রমশঃ চলিতে আরম্ভ করি, পথটী বরাবর ক্রমোচ্চ। অনেক স্থানে বরফাবৃত। ২টী কাঠের পুল ও একটী লৌহ সেতু অতিক্রম করিতে হয়। দুই দিকের পর্ব্বত শৃঙ্গস্থ বরফ স্তূপ ও ছোট বড় অনেক গুলি ঝরণা অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে চলিতে থাকি। পথ চলিবার সময় ঠাণ্ডা হওয়াতে হাত পা অসাড় করিয়া তুলিতেছিল। ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে বেলা সাড়ে ৯৷৷০ টার সময় শ্রীশ্রীবদরিনারায়ণ দেবের মন্দিরের চূড়া নয়ন-পথে

পতিত হইল। তখন এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে হৃদয় পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। সঙ্গীয় সাধু মহাত্মাগণ একবার উচ্চৈঃস্বরে গুরু মহারাজকি জয় ও একবার শ্রীশ্রীবদরিবিশাল লালকি জয় বলিয়া উঠিলেন। সেই সময় আরও অনেক দল যাত্রী আমাদের অগ্র পশ্চাতে ছিলেন ও সেই প্রকার ধ্বনী সকলের মুখারবিন্দ হইতে উচ্চারিত হইতে লাগিল, চতুর্দ্দিক হইতে প্রতিধ্বনি আমাদের সমস্বরে যোগ দিল। চারিদিকে যেন আনন্দের ফোয়ারা উঠিল, মুহুর্ম্মুহু জয় ধ্বনিতে দিক্‌দিগন্ত পূর্ণ হইয়া উঠিল।

অনন্তর সেই আনন্দে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আর একটী পুল অতিক্রম করি, এবং তৎপরে শ্রীশ্রী৺বদরিকাশ্রমে উপনীত হই, এই পুলের নিম্নে ঋষিগঙ্গা অলকানন্দার সহিত মিলিত হইয়াছে, তাই এই স্থানের নাম ঋষিপ্রয়াগ।

শ্রীশ্রীবদরিকাশ্রম।

শ্রীশ্রীবদরিকাশ্রম বা শ্রীবদরী পুরী জগদ্‌গুরু শ্রী১১০৮ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য মহারাজ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়। ইহাকে ভূবৈকুণ্ঠধামও বলা হয়। এই ধামের সম্মুখ দিয়া অলকানন্দা প্রবাহিতা। পার্শ্বস্থিত পর্ব্বতের নাম নরনারায়ণ পর্ব্বত। সম্মুখস্থিত পর্ব্বতের নাম জয় বিজয় পর্ব্বত। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত শ্রেণী পরিবেষ্টিত উপত্যকা ভূমিতে শ্রীশ্রী৺বদরিনারায়ণদেবের মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের সম্মুখে পূর্ব্বদিকে সুবৃহৎ ফটক বা প্রবেশদ্বার ও পার্শ্বে কুবেরের ভাণ্ডার, সম্মুখে মহাবীর এবং গরুড়ের মূর্ত্তি। দক্ষি

পার্শ্বে শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মী দেবীর মন্দির ও রন্ধনশালা বা ভোগমণ্ডী, বামভাগে ঘণ্টাকর্ণের মন্দির। শ্রীশ্রী৺বদরিনারায়ণদেবের মন্দিরের উপরিভাগ সোণার পাতদ্বারা মণ্ডিত, তদুপরি স্বর্ণ কলসী বসান। মন্দির তিন ভাগে বিভক্ত, ভিতরের ভাগে রত্নবেদীর উপর শ্রীশ্রীনারায়ণমূর্ত্তি বিরাজমান। তাঁহার চূড়াতে একখণ্ড হীরক আছে ও মস্তকোপরি স্বর্ণছত্র আছে। দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীশ্রীকুবের মূর্ত্তি, বামপার্শ্বে শ্রীশ্রীনরনারায়ণ মূর্ত্তি, সম্মুখে উদ্ধব, দেবর্ষি নারদ ও শ্রীশ্রীগণেশ মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। ফটকের সম্মুখে নিম্নভাগে নারদকুণ্ড, তপ্তকুণ্ড, গৌরীকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড, নৃসিংহ কুণ্ড ও তাহার দক্ষিণদিকে অতি শীতল জল-বিশিষ্ট কুর্ম্মধারা ও উষ্ণ জলবিশিষ্ট প্রহ্লাদ ধারা ইত্যাদি আছে। এখানে কপালমোচন তীর্থে পিতৃপুরুষদের উদ্ধারার্থ পিণ্ডদান করিতে হয়। এখানে কালীকম্বলী বাবার তত্ত্বাবধানে অনেকগুলি বড় বড় ধর্ম্মশালা গৃহ আছে; দাতব্য ঔষধালয়, হাঁসপাতাল পুলিশ চৌকী, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আফিস, সরকারী ডাক বাঙ্গালা ও অন্য ২।৩ খানি ডাক বাঙ্গালা আছে। এখানে সর্ব্ব প্রকার আহার্য্য দ্রব্য ও মিঠাই আদির প্রকাণ্ড বাজার আছে। বাজারে সর্ব্ব প্রকার দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হয়, তবে মূল্য অনেক বেশী (পরিশিষ্টে মূল্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ দেখুন)। এখানকার প্রায় সকল গৃহ ভূর্জ্জপত্রের ছাউনি বিশিষ্ট, বাকী সব কাঠ ও শ্লেট পাথরের ছাউনি দেওয়া। এখানে অতিথি অভ্যাগতের জন্য রীতিমত সদাব্রত অনেক

স্থানে খোলা আছে, পাণ্ডা মহারাজগণের অনেকগুলি সুন্দর বাড়ী আছে। এখানে সর্ব্ব সাধারণকে পাণ্ডা মহারাজগণের নির্দ্দেশমত বাড়ীতে থাকিতে হয়। আর যাঁহারা পাণ্ডার ধার ধারেন না তাঁহারা স্বেচ্ছামত ধর্ম্মশালা বা বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিতে পারেন। শ্রীশ্রী৺নারায়ণদেবের পূজার পাত্র ও আসবাব ইত্যাদি রৌপ্য-নির্ম্মিত। কেবল রন্ধন পাত্র পিতলের। শ্রীযুত রাওল সাহেব স্বহস্তে পূজা করেন তবে উপচারাদি যোগাইবার জন্য ৪।৫ জন সহকারী আছে। প্রত্যহ তিনবারে সাড়ে তিন মন চাউলের ভোগ হয়, তন্মধ্যে মাত্র চৌদ্দ সের বিতরিত হয় আর বাকী সব কর্ম্মচারিগণ পাইয়া থাকেন।

শ্রীশ্রী৺বদরিনারায়ণের ফটকের সম্মুখে উত্তর পার্শ্বে শ্রীযুত রাওল সাহেবের গদী বা ভদ্রাসন। নানাবিধ কারুকার্য্য খচিত ভেল্‌ভেটের বিছানা ও তাকিয়া ইত্যাদিতে রাওল সাহেবের বসিবার স্থানটী সুসজ্জিত এবং বিলাসিতার পরিচায়ক। আজ কাল প্রায় সর্ব্বত্রই মোহান্ত মহারাজগণের আসনে ব্যাঘ্রচর্ম্ম কৃষ্ণসার বা হরিণ চর্ম্মের পরিবর্ত্তে কার্পেট, গালিচা, ভেল্‌ভেট ইত্যাদি দেখা দিতেছে। সুতরাং এজন্য রাওল সাহেবকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। কখন যে মঙ্গলময়ের মঙ্গল দৃষ্টিদ্বারা এই সব কলঙ্ক ও উপসর্গ দূরীভূত হইবে তাহা তিনিই জানেন। এখানকার সমস্ত দেবতাই এখানে থাকেন কেবল মাত্র উদ্ধব জিউ শ্রীশ্রীনারায়ণ দেবের প্রতিনিধি স্বরূপে সর্ব্ব প্রকার যাত্রা ইত্যাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। শীতের ছয় মাস

যখন মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকে তখন উদ্ধবজিউ পাণ্ডুকেশ্বরে থাকেন ও তথায় সমস্ত যাত্রা কার্য্যাদি তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হয় আবার যখন এখানে মন্দিরের দরজা খোলা হয় তখন এখানে চলিয়া আসেন। এখানে সমস্ত দর্শনাদি কার্য্য পাণ্ডা মহারাজেরা সম্পাদন করাইয়া থাকেন। এখানে সঙ্গীয় সাধু মহারাজগণ সহ কালীকম্বলী বাবার ধর্ম্মশালায় বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া তথায় আসন গ্রহণ করি। তপ্ত কুণ্ডে স্নান করিয়া যখন মধ্যাহ্নকৃত্যাদি সমাপনান্তে আহারাদির ব্যবস্থা হইতে লাগিল, তখন বেলা প্রায় দুইটা। অনেক দূরদেশ হইতে এক অপূর্ব্ব বাজনার শব্দ শোনা যাইতে লাগিল, আমরা যোশী-মঠে অবস্থান কালে জানিয়াছিলাম যে, ২৯শে বৈশাখ শ্রীযুত রাওল সাহেব ও পাণ্ডুকেশ্বর হইতে উদ্ধবজিউ, শ্রীশ্রীবদরিকা-শ্রমে আসিয়া পৌঁছিবেন। ক্রমশঃ তাঁহারা যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন ততই নানাবিধ বাদ্যধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল; ইহাদ্বারা একটী বিশেষ মিছিলের সূচনা বুঝিয়া কৌতূহল-পূর্ণ চিত্তে দর্শন মানসে পথিপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। প্রায় এক মাইল দূর হইতে ঐ "মিছিল-বাহিনী" আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। দেখিলাম সর্ব্বাগ্রে, সিঙা, ঢাক, ঢোল, নাগারা, টীক্কারা, বাঁশী ইত্যাদি বাজিতেছে, তাহার পশ্চাতে বিচিত্র বর্ণ ও কারু কার্য্য-খচিত অনেক গুলি নিশান পতাকা উড়িতেছে, তৎপশ্চাতে লাঠিদার, সোঠাদার পাথাওয়ালাগণ, আগে পিছনে ও উভয়

পার্শ্বে শ্বেত চামর হস্তে কয়েকজন আর্দ্দালী এবং মধ্য দেশে নানাবিধ কারুকার্য্য খচিত স্বর্ণ চতুর্দ্দোলোপরি শ্রীযুত রাওল সাহেব আসীন, ও অন্য একটী ঝাম্পানে তাঁহার পুত্রদ্বয় বিরাজ-মান। পিছনে অমাত্যবর্গাদি, মেলার জন্য নিযুক্ত সরকারী কর্ম্মচারিগণ ও পাণ্ডা মহারাজগণ কেহ বা অশ্বপৃষ্ঠে কেহ বা ঝাম্পানোপরি কেহ বা পদব্রজে আসিতেছেন। জ্যোতিষী পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত পূর্ব্বে পরিচয় হইয়াছিল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম উদ্ধবজিউ কোথায়? তিনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন পিছনে আছেন। কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া হতাশ্বাস হইয়া আহারাদি করিবার জন্য চলিয়া গেলাম, আহারান্তে খানিক বিশ্রাম করিয়া পোষ্ট মাষ্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া চিঠি পত্রাদি বুঝিয়া লইলাম। এখানে আমার পাথেয় জন্য আমার জনৈক গুরু-ভগিনী-প্রেরিত ১০৲ টাকার একটী মণি অর্ডার প্রাপ্ত হই। অতঃপর একবার বাজারে ঘুরিয়া ফিরিয়া সর্ব্বত্র দেখা গেল। রাত্রিতে জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া ধুনী জ্বালিতে হইল। এস্থানে কাঠ অতি মহার্ঘ্য এমন কি ১ সের কাঠের মূল্য প্রায় দুই আনা, এখানে ঠাণ্ডা এত বেশী যে দিবা দ্বিপ্রহরেও এক যায়গায় বসিয়া থাকিলে হাত পা অসাড় বোধ হয়। এস্থানে আসিবার সময় শীত-নিবারণের উপযোগী সর্ব্ব-প্রকার সাজ সরঞ্জাম * না থাকিলে অতি কষ্ট পাইতে হয়।

* "হিমালয় পর্য্যটনোপযোগী পরিচ্ছদ" নামীয় প্রবন্ধ পরিশিষ্টে দেখুন।

অদ্য ৩০শে বৈশাখ শুক্রবার শুক্ল পঞ্চমী। অদ্য বেলা দশ ঘটিকার সময় শুভ মুহূর্ত্তে শ্রীশ্রী৺বদরিনারায়ণ দেবের মন্দিরের দরজা খোলা হইবে, সকলেই তদভ্যন্তর-স্থিত ছয় মাস পর্য্যন্ত প্রজ্জ্বলিত দীপ-জ্যোতিঃ দর্শন করিবেন, প্রাতঃকাল হইতে একটী আনন্দের ভাব সর্ব্বত্র দেখা যাইতে লাগিল, আমরাও সকাল বেলা তপ্ত কুণ্ডে স্নানাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া মন্দির প্রাঙ্গনে সমবেত হইলাম। যত বেলা বাড়িতে লাগিল ক্রমশঃ দর্শক মণ্ডলীর ভিড় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বেলা আট টার সময় শ্রীশ্রীকুবেরজি আপন ধন ভাণ্ডারের দ্বার উদঘাটন করিলেন। ভিড় বাড়িতে লাগিল, মন্দিরের বহির্ভাগের সাজ সজ্জা হইয়া গেল। মন্দির-প্রাঙ্গন-দেশে ভাটগণ স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন, বেদপাঠকগণ বেদধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। সমবেত যাত্রিগণ কেহ "বদরিবিশাল লালকি জয়" কেহ "বদরিনারায়ণজিকি জয়," কেহ "গরুড় ভগবানজিকি জয়" ইত্যাদি মাঙ্গলিক ও আনন্দধ্বনিতে

জ্যোতি-দর্শন। *

* শীতের প্রারম্ভে অর্থাৎ দেওয়ালীর সময় যখন শ্রীশ্রী৺বদরিনারায়ণ দেবের মন্দিরের দরজা বন্ধ করা হয় সেইদিন একটী প্রদীপ জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। এই প্রদীপ বরাবর জ্বলিতে থাকে ও যে দিন মন্দিরের দরজা খোলা হয় সেই দিন উক্ত দীপ-জ্যোতিঃ দর্শন একটী মহা পুণ্য কার্য্য, তজ্জন্য সর্ব্বসাধারণকে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিতে হয়। স্থানীয় লোকমুখে ও পাণ্ডার মুখে শুনা গেল যে বৎসর উক্ত দীপ নিবিয়া যায় সেই বৎসর পৃথিবীর অত্যন্ত অমঙ্গল ঘটে।

দিক্‌দিগন্ত পূর্ণ করিতে লাগিল, সকলেই যেন অপার আনন্দে মাতোয়ারা হইয়াছে। এ সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া প্রাণ মন পুলকিত হইয়া উঠিল। হঠাৎ এক সঙ্গে নানা প্রকার বাদ্য বাজিয়া শুভ মূহুর্ত্তের আর বিলম্ব নাই এই সংবাদ সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাপন করিল। দেখিতে দেখিতে শ্রযুত রাওল সাহেব আপন অমাত্যবর্গ, চাপরাসি, পুলিশ প্রহরি ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ সহ মন্দির প্রাঙ্গনে আসিয়া পৌঁছিলেন তখন ভিড় এতই বাড়িয়া গেল যে ঠেলা ঠেলি ধাক্কা ধাক্কি হইতে লাগিল। দর্শক মণ্ডলী কেহ বা নীরবে স্থির হইয়া রহিলেন, কেহ বা অগ্রসর হইবার জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। পূর্ব্বোক্ত আনন্দধ্বনি শত সহস্র গুণে বাড়িয়া উঠিল। সকলের মনে কেবল এই আশা যে জ্যোতি-দর্শন করিবে। কেবল মাত্র কয়েক জন লোক যাহারা কর্ম্মচারিদের পরিচিত বা আত্মীয় আর যাহারা পূর্ব্বে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহারাই ভিতরে রহিলেন, প্রহরিগণ সহজে আর কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিলেন না। মুহুর্ম্মুহু মঙ্গলধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে মন্দির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। ক্রমশঃ সকলেই সেই দীপজ্যোতি দর্শন ও শ্রীশ্রীনারায়ণ দর্শন করিয়া জীবন ধন্য বোধ করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীদেবী শ্রীশ্রীনারায়ণ দেবের অর্চ্চনা করিয়া ভোগমণ্ডীতে প্রবেশ করিয়া রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। প্রথম পূজার পর বালভোগ দেওয়া হইল। আমরা শ্রীশ্রীনারায়ণ দেবের কৃপায় ছয় মাস পর্য্যন্ত একই ভাবে স্থিত নৈবেদ্যের অংশ ও বালভোগ গ্রহণ

করিয়া ধন্য হইলাম। মধ্যাহ্নে মহাপূজার পর মহাভোগ দেওয়া হইল, যাত্রিগণের মধ্যে যাঁহারা ভোগ দেওয়ার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন তাঁহারা ও অন্যান্য সকলে প্রসাদ পাইয়া আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন। সাধু অভ্যাগতগণ ও কর্ম্মচারিগণ স্ব স্ব অংশ গ্রহণ করিলেন। অদ্য আমাদের আরও কয়েক জন সাধু সহ এক প্রীতি ভোজ হয়। অপরাহ্নে আর একবার দর্শন করিতে যাই ও মহাভোগের প্রসাদ পাই। সন্ধ্যার সময় আরতি দর্শন করিতে যাইয়া শুনিলাম আরতি হইয়া গিয়াছে, আরতি বিশেষ জাঁক জঁমকের সহিত হয় না। আমরা নির্ম্মাল্য ও প্রসাদ গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। রাত্রিতে আনন্দপ্রসাদ বিতরিত ও পরস্পরে ঐক্যবন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য নানাবিধ উপদেশপূর্ণ কথাবার্ত্তাদি হয়। সকলেই পরমানন্দে ধুনী জ্বালিয়া রাত্রি যাপন করি।

বসুধারা।

এস্থান হইতে চারি মাইল দূরে বসুধারা। এখানে কোন চটী ইত্যাদি নাই, যাত্রিগণ এস্থান হইতে দর্শন ও স্নানাদি করিয়া ফিরিয়া আসেন। ঐ স্থান হইতে খানিক অগ্রসর হইলে মণিভদ্রপুরি, তাহার নিকটে গণেশ গুহা, ব্যাস গুহা, মুচকুন্দ গুহা ও ব্যাসকুণ্ডাদি তীর্থ আছে। ঐ স্থান হইতে আরও কিছুদূরে সরস্বতী গঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থলে সরস্বতী-প্রয়াগ। ঐ স্থান হইতে একটী পথ তিব্বতাভিমুখে গিয়াছে। বসুধারাতে পাপ পুণ্যের পরীক্ষা হয়, যাহারা পাপী তাহাদের গায়ে ঐ

ধারার জল আসিয়া লাগে না। এ স্থলে ভারতবর্ষের সীমান্ত হইয়া তিব্বত দেশ আরম্ভ হইয়াছে। এস্থলে হইতে আরও প্রায় ১০।১২ মাইল দূরে সত্যপথ ও স্বর্গারোহণ। প্রবাদ আছে পাণ্ডবেরা উক্ত পথে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। ইহার সন্নিকটে সহস্র-ধারা ও চক্রতীর্থ ইত্যাদি আছে। এস্থান হইতে আরও কিছু দূরে কৈলাস পর্ব্বত ও অলকাপুরী এবং তাহার সন্নিকটে মানস সরোবর বিদ্যমান আছে। ঐ সকল স্থানে যাওয়া অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার, ঐ সকল স্থান দর্শন করিতে হইলে কিছুকাল হিমালয়ে বাস করিয়া শীত সহ্য করিয়া লইতে হয়, তদনন্তর পাহাড়ী লোক যাহারা ঐ সকল স্থানের সংবাদ রাখে তাহাদের সঙ্গে করিয়া তদুপযোগী আহার্য্য দ্রব্য, সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদির বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে হয়। আর যাঁহারা বরাবর যাইতে চাহেন তাঁহাদিগকে অনেক পয়সা ব্যয় করিয়া সর্ব্ব প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হয়। আর কাহারও ভাগ্যে যদি তথাকার কোন সাধু মহাত্মার দর্শন লাভ ঘটে তবেত কথাই নাই, তাঁহারা পরমানন্দে ঐ সকল স্থান দর্শনাদি করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন। সাধারণ লোকের পক্ষে ঐ সকল স্থান দর্শন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমরা অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রযুক্ত শ্রীশ্রী৺বদরিকা-শ্রম হইতে আর অগ্রসর হইতে সাহসী হইলাম না। এই স্থানে পরমানন্দে দুই দিন অতিবাহিত করিয়া তৃতীয় দিন

সত্যপথ ও স্বর্গারোহণ।

কৈলাস পর্ব্বত ও অলকাপুরি, মানস সরোবর।

প্রাতে অর্থাৎ ৩১শে বৈশাখ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করি।

এ দিন অনেক আত্মীয় ও গুরুভাই ভগ্নীকে আশীর্ব্বাদ পাঠান হয়। ধাম হইতে দুই মাইল নিম্নপথে আসিবার পর শ্রীশ্র৺কাশীধামস্থ শ্রীমৎ দীনানন্দ স্বামী জিউ মহারাজের সহিত দেখা হয়। তিনি পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীমৎ গুরুদেবের এক জন বন্ধু, তথায় তাঁহার সমাধি-বিষয়ে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হয় ও তিনি সাশ্রু নয়নে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া নানাবিধ উপদেশ দেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে তাঁহার কাছে বিদায় গ্রহণ করি, তিনিও শ্রীশ্রী৺বদরিনারায়ণ-দর্শনাভিলাষী হইয়া চলিয়াছেন। ক্রমশঃ নিম্নপথে চলিতে চলিতে সাড়ে আটটার ৮॥০ সময় হনুমান চটীতে আসিয়া উপস্থিত হই। এখানে শ্রীমৎ শিবানন্দ গিরি স্বামিজিউর সঙ্গে দেখা হয়, বেলা এগারটার সময় লাম বগড় চটীতে আসিয়া মধ্যাহ্নকৃত্যাদি সমাপনান্তে আহারাদি ও বিশ্রাম করা হয়। বেলা তিনটার সময় আবার চলিতে আরম্ভ করি, প্রায় সন্ধ্যার সময় পাণ্ডুকেশ্বরে আসিয়া রাত্রিযাপন ও জলযোগের ব্যবস্থাদি করা হয়। পথে এক পসলা বৃষ্টি আসিয়া বস্ত্রাদি ভিজিয়া যায়। ১লা জ্যৈষ্ঠ সকল বেলা হইতে শরীর অত্যন্ত অসুস্থ মনে হয়। সঙ্গীয় সাধু মহাত্মাগণ এখানে আমার কম্বলাদি ভাগ করিয়া লয়েন। ক্রমশঃ গমন করিতে করিতে বেলা দ্বিতীয় প্রহরে সিন্ধুধার চটীতে যাইয়া পৌঁছি। এখানে মধ্যাহ্নকৃত্যাদি সমাপনান্তে আহারাদি করিয়া

বিশ্রাম করা হয় এবং রাত্রিতে জলযোগের ব্যবস্থাদি করা হয়।

২রা জ্যৈষ্ঠ সোমবার অতি প্রত্যুষে উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করি ও বেলা আটটার সময় কুমহাড় চটীতে উপস্থিত হইয়া জলযোগ করা হয়। বেলা এগারটার সময় পাতাল গঙ্গাতে আসিয়া মধ্যাহ্নকৃত্য ও আহারাদি করা হয়। সাধারণ বিশ্রামান্তে চলিতে চলিতে সন্ধ্যা ৭টার সময় পিপুলকোটী চটীতে পৌঁছিয়া জলযোগের ব্যবস্থা ও রাত্রিবাস করা হয়। ৩রা মঙ্গলবার প্রাতে জলযোগের পর বেলা ৯টার সময় বাবলা চটীতে আসিয়া আহারাদি করিয়া সন্ধ্যার সময় লালসাঙ্গাতে যাইয়া পৌঁছি। এখানে রাত্রিতে জলযোগের ব্যবস্থাদি করা হয়। এস্থান হইতে আমি শ্রীশ্রী৺কেদারনাথ-দর্শনাভিলাষী হইয়া সঙ্গীয় সাধু মহাত্মাগণের কাছে বিদায় প্রার্থনা করি, তাঁহাদের মধ্যে পরিব্রাজক শ্রীমৎ শীতল গিরিজিউ মহারাজ সস্ত্রীক আমার অনুগমন করিবেন স্থির হয়। এখানে রাত্রিতে অন্যান্য সাধু মহারাজগণ নানাবিধ উপদেশ ও উৎসাহ দানে আমাদিগকে দ্বিগুণ উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ৪ঠা প্রাতে সাশ্রু নয়নে পরস্পর পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আমরা শ্রীশ্রী৺কেদার নাথ দর্শন উপলক্ষে যাত্রা করি ও অন্যান্য সাধু মহাত্মাগণ স্ব স্ব আশ্রম অভিমুখে গমনাভিলাষী হইয়া রেল পথের দিকে রওনা হন। দুইটি রাস্তাই অলকানন্দার দুই পার দিয়া চলিয়া গিয়াছে। যতক্ষণ পরস্পরকে দেখা যাইতে

ছিল ততক্ষণ দৃষ্টি সেই দিকে ছিল। যাঁহারা শ্রীশ্রীবদরিকাশ্রম হইতে বরাবর দেশের দিকে চলিয়া যাইবেন তাঁহাদিগকে কর্ণ-প্রয়াগ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়া যে পথ কাঠগুদাম বা রামনগর রেলওয়ে ষ্টেশন পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে সেই পথ অনুসরণ করিতে হয়। কর্ণপ্রয়াগ হইতে রেলওয়ে ষ্টেশন পর্য্যন্ত সকল চটীর নাম* দেওয়া হইয়াছে। তবে এই পথের প্রসিদ্ধ স্থানগুলির বিবরণ যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা ক্রমশঃ পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য সাধারণ ভাবে বর্ণন করিতেছি। কর্ণপ্রয়াগ

আদি বদরি।

হইতে ৯ মাইল আদি বদরি বা আদি বদরিকা-শ্রম। এখানে সাধারণ চড়াই আছে। এখানে পোষ্ট অফিস, ৫।৭ খানা ঘর ও খাদ্য দ্রব্যের এবং মিঠাই প্রভৃতির দোকান আছে। কয়েকটা মন্দিরে অনেক দেবমূর্ত্তি ইত্যাদি আছে। ঐ স্থান হইতে জোঁকাপাণি চটীতে পৌঁছিতে আড়াই মাইল আন্দাজ চড়াই আছে ক্রমশঃ ১২ মাইল চলিয়া গেলে ধুলার ঘাট চটীতে পৌঁছান যায়। ইহার পার্শ্ব দিয়া রামগঙ্গা প্রবাহিতা, এখানে পুলিশ চৌকী, পোষ্ট আফিস ও খাদ্য দ্রব্যাদির দোকান পাঠ ইত্যাদি আছে। এইস্থান হইতে সোজা পথে

মোহনচৌরী

পাঁচ মাইল দূরে মোহনচৌরী। এইস্থান গড়বাল ও কুমাউন জেলার সীমাস্থল। এখানে কাণ্ডী ও ঝাম্পানের কুলী বদল হয়। কারণ গড়বালী কুলিরা ইহার

* চটীর তালিকা সূচীতে দেখুন

বেশী আর অগ্রসর হয় না; এখানে ঘোড়া ও কুলীদের পরীক্ষা হইয়া থাকে। এখানে রীতিমত খাদ্যদ্রব্য ও জলখাবারের দোকান পাঠ আছে। নূতন কাণ্ডী ও ঝাম্পান ইত্যাদির জন্য কুলী প্রভৃতি পাওয়া যায়।

চৌখটিয়া

এইস্থান হইতে আট মাইল দূরে চৌখটিয়া চটী। এখান হইতে একটী রাস্তা কাঠগুদামের দিকে ও অপরটী রামনগরের দিকে চলিয়া গিয়াছে। * কাঠ-গুদামের পথে অনেকগুলি দেখিবার উপযোগী প্রসিদ্ধ স্থান আছে।

রাণীক্ষেত

এই পথে রাণীক্ষেত একটী প্রসিদ্ধ স্থান, এখানে অনেকগুলি দোকান পাঠ, সেনানিবাস, পুলিশচৌকী, পোষ্ট ও টেলিগ্রাম আফিসাদি আছে।

নাইনীতাল

রেবতীগ্রাম নামক স্থান হইতে নাইনীতাল পর্য্যন্ত একটী পাকা রাস্তা আছে। নাইনি-তালে অনেক ভদ্র ব্যক্তি গ্রীষ্মকালে আসিয়া বাস করেন। গ্রীষ্মকালে যুক্তপ্রদেশের ছোটলাট বাহাদুর এখানেই বাস করেন, এখানে গোরা সেনানিবাস সর্ব্বপ্রকারের সরকারি অফিসাদি আছে। এখানে সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হয়। নাইনীতাল হিমালয়স্থ হিল ষ্টেসনগুলির মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ স্থান। এখানকার অন্যান্ন জিনিষের মধ্যে আলুই সর্ব্বোৎকৃষ্ট,

* চৌখটীয়া হইতে রামনগরের পথের চটীর নাম তালিকায় দ্রষ্টব্য।

এখানে আজ কয়েক বৎসর একটী বোটানিকাল গার্ডন তৈয়ার করা হইয়াছে। কাটগুদাম হইতে বরাবর রেলপথে যাত্রীরা আপন আপন গন্তব্যস্থানে চলিয়া যান। এই পথে মাহপুর চটীর পর হইতে যে চড়াই পাওয়া যায়, তাহাতে রীতিমত ঠাণ্ডা অনুভূত হইয়া থাকে। কাটগুদামের ৫ মাইলের ভিতর ভীমতাল নামীয় একটী প্রকাণ্ড সরোবর আছে। পর্ব্বত মধ্যদেশে ইহার দৃশ্য অতীব মনোরম। এই সরোবর হইতে একটী লহর বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে। এইপথে এখন তেমন প্রসিদ্ধ স্থান নাই। তবে এই পথটী কাটগুদামের রাস্তা হইতে অনেক সংক্ষিপ্ত, সুখসাধ্য ও সুপ্রশস্ত।

ভীমতাল

দ্বিতীয় খণ্ড।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ বুধবার প্রাতে জলযোগের পর লালসাঙ্গাতে সঙ্গীয় সাধু মহাত্মাগণের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক পরিব্রাজক শ্রীমৎ শীতলগিরিজিউ মহারাজ ও পরিব্রাজিকা মাতা শ্রীশ্রীমতী ভূষণমনি সহ শ্রীশ্রীগুরুচরণ স্মরণপূর্ব্বক অলকানন্দার সেতু অতিক্রম পূর্ব্বক একটী চড়াই করিতে আরম্ভ করি, উক্ত পথে শ্রীশ্রী৺কেদারনাথ হইতে প্রত্যাগত কয়েকজন বাঙ্গালী যাত্রী ও সাধুমহাত্মার সহিত দেখা হয়। ক্রমশঃ দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া শ্রীশ্রী৺গোপেশ্বর নাথ মহাদেবের নামীয় চটীতে উপনীত হই। এই স্থানটী কেদার খণ্ডে গোস্থলা নামে প্রসিদ্ধ। এখানে শ্রীশ্রী৺গোপেশ্বর দেবের মন্দির; তাহার সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড ত্রিশূল, বৈতরণী কুণ্ড, দশ বারখানি ঘর, সর্ব্বপ্রকার আহার্য্য দ্রব্যের এবং মিঠাই আদির দোকান পাঠ ইত্যাদি আছে। এখানে জলের কষ্ট একটু বেশী, কারণ অনেক দূর হইতে জল আনয়ন করিতে হয়। এস্থানে সাধারণ বিশ্রামান্তে আবার উথরাই করিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ দুই মাইল দূরবর্ত্তী "বীর চটীতে" যাইয়া পৌঁছি। এই চটীর নিম্নদেশ দিয়া বীরনদী প্রবাহিতা; নদীর তীরে অনেক স্থলে বটের গাছ

গোপেশ্বর

বীরচটী

দেখা গেল। এখানে ৩।৪ খানি ঘর, খাদ্যদ্রব্য ও মিষ্টান্নাদির দোকান আছে। এস্থানে সাধারণ বিশ্রামান্তে একটী সহজ চড়াই করিয়া এক মাইল দূরবর্ত্তী রামচটীতে উপনীত হই। এখানে দুইখানি ঘর ও সাধারণ দ্রব্যাদির দোকান আছে। পার্শ্বে একটি জলের ঝরণা আছে। এখানে মধ্যাহ্নকৃত্যাদি সমাপনান্তে আহারাদি ও বিশ্রাম করা হয়। বেলা তিনটার সময় অগ্রসর হইতে থাকি।

রামচটী।

এস্থান হইতে ক্রমশঃ সমতল রাস্তায় একমাইল দূরে আরামচটী পাওয়া যায়, এখানে জোয়ানা কোতোয়াল নামক জনৈক পাহাড়ী রাজবংশী স্বব্যয়ে একটী ধর্ম্মশালা স্থাপন করিয়াছেন ও অভ্যাগত সাধুমহাত্মাগণকে স্বব্যয়ে সদাব্রত দিয়া থাকেন, পার্শ্বে নিজের একটী দোকানও আছে তাহাতে প্রায় সকল প্রকার খাদ্য দ্রব্যাদি মজুত থাকে। পার্শ্বে আরও একটী ধর্ম্মশালা আছে। ইহার পার্শ্বদিয়া বালাসুত নদী প্রবাহিতা। ক্রমশঃ সমতল পথে চলিতে চলিতে বালাসুতা নদীর পুল পার হইয়া খানিক অগ্রসর হওতঃ রুদ্রগঙ্গার উপর পুল অতিক্রমান্তে মণ্ডলচটীতে যাইয়া উপনীত হই। এইস্থান হইতে একটী পথ চতুর্থ কেদার বা রুদ্রনাথ পর্য্যন্ত গিয়াছে ও দেড়ক্রোশ চড়াই পথে কংচে পর্ব্বতের উপর শ্রীঅনুসূয়া দেবীর মন্দির আছে। ঐ সকল স্থানে যাইতে হইলে বা দেবী দর্শন করিবার ইচ্ছা হইলে স্থানীয় লোক সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হয়। মণ্ডলচটীর

আরামচটী।

রুদ্রনাথ ও অনুসূয়া দেবী।

বন্দোবস্ত অতি সুন্দর; ১০।১২ খানী বড় বড় ঘর, সর্ব্বপ্রকার খাদ্যদ্রব্য ও মিঠাই আদির দোকান আছে। চটীর মধ্যদেশ দিয়া ৩।৪ টী ঝরণা বহিয়া যাইতেছে। চটীওয়ালাগণ বেশ ভাল লোক। এখানে রাত্রিতে জলযোগ করিয়া রাত্রিবাস করা হয়। এখানে শ্রীমৎকৃষ্ণানন্দ সরস্বতী নামীয় একজন বাঙ্গালী মহাত্মার সঙ্গে দেখা হয়।

মণ্ডলচটী।

৫ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার প্রাতে জলযোগের পর নিবিড় অরণ্যানী ভেদ করিয়া একটা চড়াই করিতে আরম্ভ করি, "বউ কথা-কও" পিকবধু, ঘুঘু প্রভৃতি বনবিহঙ্গগণ মধ্যে মধ্যে অরণ্যের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মনে বেশ আনন্দ দিতেছিল। এই পথে লালসাঙ্গা হইতে রুদ্রপ্রয়াগ পর্য্যন্ত স্থানের ভারপ্রাপ্ত মিলিটারি অফিসার মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হয়। পরিচয়ে জানিতে পারিলাম তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ও পাহাড় অঞ্চলেই তাঁহার বাসস্থান। তিনি বেশ সজ্জন, আমাদিগকে পথের অনেক গুলি সংবাদ বলিয়া দিলেন। ক্রমশঃ চড়াই করিতে করিতে সাড়ে তিন মাইল দূরবর্ত্তী জঙ্গল বা পাঙ্গরবাসা চটীতে আসিয়া উপনীত হই, এখানে সরকারী ধর্ম্মশালা, ৪।৫ খানা দোকান ও বড় বড় ঘর আছে। খাদ্যদ্রব্য ও সাধারণ জলখাবার জিনিষ পত্র পাওয়া যায়। পরিস্কার জলের ঝরণাও আছে, তবে স্থানটা দেখিতে একটু অপরিষ্কার। এস্থানে সাধারণ বিশ্রামান্তে ক্রমশঃ চড়াই করিয়া একটা পর্ব্বত শৃঙ্গদেশে উঠি। এস্থান হইতে চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতের সারি সারি

জঙ্গলচটী বা পাঙ্গরবাসাচটী।

প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শনে ও পরিস্কার বায়ুসেবনে সমস্ত পথশ্রান্তি বিদূরিত হইয়া মনে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল। ক্রমশঃ

ভীমচটী।

পর্ব্বতের শৃঙ্গদেশস্থ পথে অগ্রসর হইয়া আড়াই মাইল দূরবর্ত্তী ভীমচটীতে উপনীত হই। এখানে পরিস্কার জলের ঝরণা, ৪।৫ খানা ঘর, খাদ্যদ্রব্যের ও সাধারণ মিঠাই প্রভৃতির দোকান আছে। এই চটীতে পরিস্কার ও ভাল মধু পাওয়া যায়। চটীওয়ালাদের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের ঐক্যভাব দেখা গেল না। এখানে মধ্যাহ্নকৃত্য সমাপনান্তে আহারাদি করা হয়, এখানে দিনের বেলায়ও বেশ ঠাণ্ডার অনুভূতি হইয়াছিল। এস্থানে রাত্রিতে জলযোগের ব্যবস্থা ও বাস করা হয়। এই চটীর মধ্যদেশ হইতে একটী পথ শ্রীশ্রী৺তুঙ্গনাথ দেবের উত্তুঙ্গ পর্ব্বত শৃঙ্গদেশে চলিয়া গিয়াছে।

৬ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার প্রাতে জলযোগের পর উক্ত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক ধীরে ধীরে চড়াই করিতে আরম্ভ করি। দুই-

শ্রীশ্রী৺তুঙ্গনাথ।

পার্শ্বে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ ব্যাপী জঙ্গল। ক্রমশঃ বেশী ঠাণ্ডা অনুভূত হইতে লাগিল, বেলা ৮টার সময়, শ্রী৺তুঙ্গনাথ পর্ব্বত শিখর দেশে যাইয়া পৌঁছি। এখানে আসিয়া অভূতপূর্ব্ব আনন্দভোগ করিতে লাগিলাম। চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতমালা আমাদের অতি নীচে দেখা যাইতে লাগিল, সুদূরবর্ত্তী তুষার ধবল পর্ব্বতশ্রেণী অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। এখানে অনেক গুলি দেবমূর্ত্তি আছে, তন্মধ্যে শ্রীশ্রী৺তুঙ্গনাথদেব, শ্রীশ্রীব্যাসদেব, ও শ্রীশ্রীমৎজগদ্‌গুরু শ্রী ১১০৮ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য স্বামীর

প্রতিমূর্ত্তি একমন্দিরে আছে। শ্রীশ্রী৺তুঙ্গনাথ দেবের একটী স্বর্ণ-নির্ম্মিত ও চারিটী রৌপ্যনির্ম্মিত মুর্ত্তি আছে, পার্শ্বে শ্রীশ্রীপার্ব্বতী দেবী, শ্রী৺কালভৈরব এবং অনেক দেব দেবীর মূর্ত্তি ও মন্দিরাদি আছে। মন্দিরের কিছু নিম্ন হইতে আকাশগঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে, উক্তস্থানে একটা জলের কুন্ড বাঁধাইবার বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রী৺তুঙ্গনাথ দেবের প্রত্যহ পাঁচসের পরিমাণ ভোগের বন্দোবস্ত আছে। সমস্তই পাণ্ডা-মহারাজগণের ইচ্ছামত সম্পাদিত হয়। শ্রীশ্রী৺কেদারনাথের রাওলসাহেব শ্রীমৎ বিশ্বলিঙ্গ জিউ মহারাজ এখানকার রাওল। তিনি যখন পূর্ব্বতন রাওলের চেলা ছিলেন তখন লালসাঙ্গার সবডিভিসনাল অফিসারের সহিত দেখা করিতে যাইবার সময় একবার মাত্র এখানে পদার্পন করিয়াছিলেন, রাওলপদে অভিষিক্ত হইবার পর আর এদিকে শুভাগমন করেন নাই। শ্রীশ্রী৺তুঙ্গনাথদেবের মন্দিরের দরজা শীতের ছয়মাস বন্ধ থাকে তখন ঐ পাঁচটী ধাতুমূর্ত্তির

মুখীমঠ। এইস্থান হইতে ৯ মাইল দূরবর্ত্তী মুক্ষু বা মুখী মঠে পূজা হইয়া থাকে। ঐ স্থানে পাণ্ডামহারাজগণের বসতি আছে। শ্রীশ্রী৺কেদারনাথ দেবের দরজা খুলিবার তিনদিন পরে শ্রী৺তুঙ্গনাথদেবের দরজা খোলা হয়।

আকাশগঙ্গাতে স্নানপূর্ব্বক মদীয় পরিব্রাজক মহারাজ ও পরিব্রাজিকা মাতাসহ দর্শনাদি করিতে যাই। পূজারি পাণ্ডা-মহারাজ সুশৃঙ্খলের সহিত দর্শনাদি করাইলেন। পূর্ব্বে এস্থানে আসা-যাওয়ার পথ অত্যন্ত দুর্গম ছিল, তাই যাত্রি-সমাগম অতি অল্প

হইত, অনেকেই পর্ব্বতের পাদদেশে মস্তক স্পর্শ করাইয়া কৃতার্থ হইয়া যাইতেন। এখন চড়াই উথরাই উভয়দিকে সুবিধাজনক রাস্তা প্রস্তুত হইয়া অত্যন্ত সুগম হইয়া গিয়াছে। এখানে ৩। ৪ খানি ঘর, খাদ্যদ্রব্য ও মিঠাই আদির দোকান আছে, তবে সাধারণতঃ একটু মূল্য বেশী। দর্শনান্তে সমাগত সকলকে সদালাপ ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে যথাসাধ্য সন্তুস্ট করিয়া চতুর্দ্দিকস্থ মনোহর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে উথরাই পথে আড়াই মাইল দূরবর্ত্তী চৌবত্তা, চটীতে উপনীত হই। এখানে স্বনামধন্যা অহল্যাবাই জিউর, গোয়ালিয়র, ইন্দোর প্রভৃতি প্রধান নৃপতিবৃন্দের ও সরকারী ৪ খানা বড় ধর্ম্মশালা, ৩। ৪ খানি দোকান আছে। সাধারণ আহার্য্য দ্রব্যাদিও পাওয়া যায়, কিন্তু তরিতরকারী কিছুই পাওয়া যায় না। জলের কষ্ট অত্যন্ত বেশী, অনেক দূর হইতে জল আনয়ন করিতে হয়। এখানেও মধু পাওয়া যায় কখনও কখনও দুগ্ধ পাওয়া যায়। এখানে আহারাদি ও বিশ্রাম করা হয়। শ্রীশ্রী৺তুঙ্গনাথ দেবের পাণ্ডা-মহারাজগণ এখান হইতে যাত্রিগণকে দর্শন করাইবার জন্য লইয়া যান আর যাঁহারা অমূলক ভয়ে যাইতে অনিচ্ছুক হন তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ও নির্ম্মাল্যাদি প্রদানে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় দান করেন। বেলা ৪টার সময় উথরাই পথে চলিতে আরম্ভ করিয়া দেড়মাইল দূরবর্ত্তী বানকোটী চটীতে যাইয়া পৌঁছি। এখানে ৭। ৮ খানা ঘর, পরিস্কার জলের ঝরণা ও সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের দোকান পাঠ আছে। এখানে ঝরণার জলের শ্রোতের বেগে

চৌবত্তা।

বানকোটী।

চাকা ঘুরাইয়া কাঠের ঘটী, বাটী, থালা, কমণ্ডলু ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়। এস্থানে কাঠের জিনিষ তৈয়ারির কৌশলাদি লক্ষ্য করিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়া দেড়মাইল দূরবর্ত্তী গোকুলচটীতে উপনীত হই। এই চটীতে ৪। ৫ খানা ঘর, সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের দোকান ও জলের ঝরণা ইত্যাদি আছে। এস্থানে সাধারণ বিশ্রামান্তে অগ্রসর হইয়া অর্দ্ধ-মাইল দূরবর্ত্তী পোথীবাসা চটীতে যাইয়া পৌঁছি। এখানে ১৫। ১৬ খানা ঘর, সাধারণ আহার্য্য দ্রব্য ও মিঠাই আদির দোকান ও পরিস্কার জলের ঝরণা ইত্যাদি আছে। এই চটীর ঘরগুলি বেশ পরিস্কার। এখানে রাত্রিতে জলযোগের ব্যবস্থা করা হয়, ও রাত্রিযাপনান্তে ৭ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার প্রাতে জলযোগের পর কুলুকুলু-নাদিনী আকাশগঙ্গার আনন্দধ্বনি শুনিতে শুনিতে ক্রমশঃ উথরাই পথে দুই মাইল দূরবর্ত্তী দরিয়া-চটীতে উপনীত হই। এখানে ৪।৫ খানি ঘর, সাধারণ খাদ্যদ্রব্য ও মিঠাইর দোকান, জলের ঝরণা ইত্যাদি আছে। এস্থানে সাধারণ বিশ্রামান্তে উথরাই পথে এক মাইল দূরবর্ত্তী দুর্গাচটীতে আসিয়া উপ-নীত হই। পথে অনেকদল বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী যাত্রীর সঙ্গে দেখা হয়। প্রায় সকলেই শ্রীশ্রী৺তুঙ্গনাথ দেবের চড়াই ও রাস্তার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। সকলকে যথাসাধ্য উৎসাহিত করা হয় ও উপদেশাদি দেওয়া হয়। দুর্গাচটীর তলদেশ-দিয়া আকাশগঙ্গা আপন মনে প্রচণ্ড নিনাদে সাধারণ যাত্রিগণের

গোকুলচটী।

পোথীবাসা।

দরিয়াচটী।

দুর্গাচটী।

পথশ্রান্তি দূর করিয়া বহিয়া যাইতেছে। এই স্থানে ৪। ৫ খানা ঘর, খাদ্যদ্রব্য ও মিঠাই আদির দোকান আছে। দুগ্ধও পাওয়া যায়। আকাশগঙ্গার উপর কাঠের পুল আছে। এখানে সাধারণ বিশ্রাম ও জলযোগ করিয়া গন্তব্যপথে সাধারণ একটী চড়াইতে উঠিতে আরম্ভ করি। মণ্ডলচটী হইতে যে চড়াই আরম্ভ করিয়াছিলাম তাহার সীমা উত্তুঙ্গ শ্রীতুঙ্গনাথ শৃঙ্গে ও উথরাইর শেষ দুর্গাচটীতে। পথিমধ্যে জঙ্গলী মশা মাছি ও পোকার উৎপাত অত্যন্ত বেশী। চুপি চুপি কখন যে কামড়াইয়া দেয় তাহা বুঝিবার যোটি নাই, যখন চুলকান সুরু হয় তখন টের পাওয়া যায়। এইপথ অতিক্রমের সময় পায়ে ডবলমোজা পরিয়া বা পট্টী বান্ধিয়া চলা বিধেয়। এস্থান হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়া দুই মাইল দূরবর্ত্তী ব্রহ্মচটীতে উপনীত হই। পথে অনেকগুলি পরিস্কার জলের ঝরণা আছে। এইচটীতে ৪। ৫ খানা ঘর, সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের দোকান ইত্যাদি আছে। জল একটু নিম্নদেশ হইতে আনিতে হয়, ইহার পশ্চিমপার্শ্বে শ্রীগরুড় জিউর মন্দির আছে।

ব্রহ্মচটী।

বেলা ১০ টার সময় মন্দাকিনী আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ পর্ব্বত মধ্যস্থিত পথে চলিতে আরম্ভ করিয়া তিন মাইল দূরবর্ত্তী উখীমঠে বেলা ১১॥ টার সময় যাইয়া পৌছি। উখীমঠ পরম রমণীয় স্থান ও পর্ব্বত মধ্য প্রদেশে অবস্থিত। এস্থানে সুন্দর বাগান আছে। পর্ব্বতের নিম্নদেশ দিয়া মন্দাকিনী গঙ্গা কল কল রবে বহিয়া

উখীমঠ।

যাইতেছে, এখানে শ্রীশ্রী৺কেদারনাথের পাণ্ডা শ্রীমৎবিশ্বলিঙ্গ রাওল সাহেবের গদি আছে *। শীতের ছয়মাস শ্রীশ্রীকেদারনাথের পূজা এই মঠেই হইয়া থাকে। এইস্থানে অনেকগুলি দেবমূর্ত্তি আছে, তন্মধ্যে পঞ্চ কেদারনাথ অর্থাৎ শ্রীশ্রী৺কেদারনাথ, শ্রীশ্রী৺তুঙ্গনাথ, শ্রীশ্রী৺রুদ্রনাথ, শ্রীশ্রী৺মধ্যমেশ্বর নাথ ও শ্রীশ্রী৺কল্পেশ্বরনাথ, শ্রীশ্রী৺গঙ্গাদেবী, উষা, অনিরুদ্ধ, চিত্রলেখা, মান্ধাতা, প্রদ্যুম্ন, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি দেবদেবীর অনেক মূর্ত্তি ও মন্দিরাদি প্রধান। এস্থানে পুলিশ চৌকি, পোষ্টঅফিস, দাতব্য ঔষধালয়, হাঁসপাতাল, কালীকম্বলী বাবার ধর্ম্মশালা, সাধারণ সদাব্রতের বন্দোবস্ত, ১৫।২০ খানি ঘর, সর্ব্বপ্রকার খাদ্যদ্রব্য ও মিঠাই আদির দোকান, পরিষ্কার জলের একটী কুণ্ড, (হাঁসপাতালের পার্শ্বে) পূর্ব্ব পূর্ব্বতন রাওল সাহেবগণের সমাধিস্থান ইত্যাদি আছে। হিমালয় প্রদেশে যতগুলি শিবালয় আছে তাহার প্রায় সকল গুলিই এই রাওল সাহেবের তত্ত্বাবধানে আছে। তাঁহার অনুপস্থিতির জন্য তাঁহার সঙ্গে দেখা হইল না। মোটের উপর যতদূর জানা গেল তাহাতে মনে হয় যে, তিনি একজন বেশ সজ্জন ব্যক্তি। শ্রীশ্রীবদরিনারায়ণ দেবের রাওল সাহেবের মত তত বিলাসী নহেন, তবে ইহাঁরও রক্ষিতা স্ত্রীপুত্রাদি আছে। পূর্ব্বতন রাওল মহোদয়গণ সন্ন্যাসীর মত অবস্থান করিতেন এখন কালের কুটিল গতিতে পূর্ব্ব পূর্ব্বতন চারিজন রাওল হইতে সমস্ত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান

* রাওল সাহেবের জীবনী পরিশিষ্টে উক্ত নামীয় প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

রাওলগণ আপন ভোগবিলাসাদি ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ অধিকারভুক্ত মঠাদির পরিদর্শন করিতেও অবসর পান না। এই স্থানে একটী ঘরে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া মধ্যাহ্নকৃত্যাদি সমাপনান্তে আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিতেছি এমন সময় পরমারাধ্যতম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমৎ গুরুদেবের ধর্ম্মবন্ধু কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুত সূর্য্যকুমার কারফর্ম্মা মহোদয়ের সহিত দেখা হইল। তিনি সস্ত্রীক ও সপুত্র শ্রীশ্রী৺কেদারনাথ দর্শনান্তে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি হঠাৎ শ্রীশ্রীমৎ গুরুদেবের সমাধি গ্রহণের বিষয়াদি আলোচনা করিতে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেন এবং উপদেশচ্ছলে আমার ভাবী জীবনের কতকগুলি লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। এই সময়েই হাওড়া বারাকপুরের সাধুমাতার আশ্রমস্থ শ্রীমৎ কিশোরানন্দ সরস্বতী মহাশয়ের সহিত দেখা ও আলাপ পরিচয় হয়; তিনি একজন সজ্জন ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি; পরিব্রজ্যাবলম্বনে তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন এবং শ্রীশ্রী৺কেদারনাথ দর্শনান্তে শ্রীশ্রীবদরিকাশ্রম অভিমুখে চলিয়াছেন। পরস্পরের গতি বিপরীত দিকে বলিয়া বিশেষ কথাবার্ত্তাদি হইল না। এখানে রাত্রিতে জলযোগের ব্যবস্থা ও বাস করা হয়।

৮ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার প্রাতে শ্রীযুত সূর্য্যবাবুর পরিবার সহ মঠস্থ দেবতাদের দর্শন করিতে যাওয়া হয়। অদ্য শ্রীশ্রীমধ্যমেশ্বরনাথের যাত্রার দিন। যাত্রাটী কেবল বাদ্যোদ্যমে পরিসমাপ্ত দেখিলাম। উখীমঠ হইতে ১২ মাইল

শ্রী৺মধ্যমেশ্বরনাথ।

দূরে ঈশান কোণে দ্বিতীয় কেদার বা মধ্যমেশ্বরনাথের মন্দির। তাহা দর্শন করিতে হইলে স্থানীয় লোক সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হয়। তাঁহারও পূজা ছয় মাস তথায় ও শীতের ছয়মাস উখীমঠে হইয়া থাকে। এখানে জলযোগ করিয়া উথরাই পথে একটী লৌহনির্ম্মিত সেতু অতিক্রম করিয়া তিন মাইল চড়াইএর পর গুপ্ত কাশীধামে উপনীত হই। যে যাত্রীগণ রুদ্রপ্রয়াগ * হইতে শ্রীশ্রী৺কেদারনাথ দর্শন করিতে আসেন, তাঁহারা পথে যে সকল চটী পার হইয়া আসেন তন্মধ্যে রুদ্রপ্রয়াগ হইতে ১০॥ মাইল দূরবর্ত্তী অগস্ত্যাশ্রম একটী প্রধান স্থান। এখানে অগস্ত্যমুনির মন্দির ও তথা হইতে অর্দ্ধমাইল দূরে শ্রীশ্রীনারায়ণ দেবের মন্দির আছে। তথায় একটী রুদ্রাক্ষের গাছ আছে এবং তথা হইতে ৪মাইল দূরে চন্দ্রানদী ও মন্দাকিনীর সঙ্গমস্থলে চন্দ্রশেখর মহাদেব ও দুর্গাদেবীর মন্দিরাদি আছে। এখানে যে লৌহ সেতু আছে তাহা পার হওয়ার জন্য মাশুল দিতে হয়। প্রায় সকল চটীর বন্দোবস্তাদি ভাল। এই পথে গুপ্তকাশী অতি প্রসিদ্ধ স্থান। উখীমঠ হইতে এ স্থানে আসিবার সময় মধ্য পথে যে পুল আছে তাহারা দুই দিকে দুইজন প্রহরী নিযুক্ত আছে ও তাহারা অতি সাবধানে যাত্রীদের পার হইতে দেয়। পর্ব্বতগাত্রে নানা ফুল ফলে শোভিত

অগস্ত্যাশ্রম।

চন্দ্রাপুরি।

গুপ্তকাশী।

* রুদ্রপ্রয়াগ হইতে শ্রীশ্রী৺কেদারনাথ পুরি পর্য্যন্ত চটীর তালিকায় দ্রষ্টব্য।

গুপ্তকাশী স্থানটী পরম রমণীয়। এখানে শ্রীশ্রী৺বিশ্বনাথ, হর-পার্ব্বতী নারায়ণ ও পঞ্চ পাণ্ডবের মূর্ত্তি ইত্যাদি আছে। মন্দির প্রাঙ্গনে দুইটা পিত্তল নির্ম্মিত গোমুখী ধারা দিয়া শ্রীবিশ্বনাথ জিউর দুই পার্শ্বে দুইটা ঝরণা আসিয়া পতিত হইয়াছে। মন্দি-রের চতুষ্পার্শ্বে ছাদযুক্ত যে বাড়ীগুলি আছে, তাহার পশ্চিমাংশের বাড়ীতে শ্রীযুক্ত রাওল সাহেবের আসন ও পূজারী মহারাজের থাকিবার স্থান। আর অন্যান্য সব গুলিতে যাত্রীদের বাস করি-বার বন্দোবস্তাদি আছে, এখানে ১৫।২০ খানি গৃহ সর্ব্বপ্রকার আহায্য দ্রব্য, মিঠাই আদি, কাপড় চোপড় ও মনোহারি জিনিষ পত্রের দোকান, পোষ্ট অফিস ইত্যাদি আছে। এই পথে এইটী শেষ পোষ্ট অফিস। এখানে আসিয়া পৌঁছিবার সময় দেখিতে পাইলাম শ্রীযুক্ত রাওল সাহেব সুসজ্জিত হইয়া বাম হাতে এক খানা কাল কাপড় লইয়া দুইজন সোঠাধারি আর্দ্দালি সহ পশ্চিম দিকে অতি ব্যগ্রতার সহিত অগ্রসর হইতেছেন। আমরা উহার তথ্যানুসন্ধানার্থে পথি পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলাম। খানিক পরে দেখা গেল গড়বাল জিলার কলেক্টর সাহেববাহাদুর আসিতেছেন। শ্রীযুত রাওল সাহেব তাঁহারই অভ্যর্থনার্থে অগ্রসর হইতেছিল, সাহেব বাহাদুর ও সকল রাজ কর্ম্মচারীদের হাতে শোক চিহ্ন স্বরূপ কাল ফিতা বাঁধা দেখিয়া অত্যন্ত ব্যগ্রতা সহকারে একজন কর্ম্মচারীকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড মহোদয় বিগত ১১ই মে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। উক্ত সংবাদ শুনিয়া যথামত প্রার্থনাদি

করিয়া একটী চটীতে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। খানিক বিশ্রামান্তে শ্রীযুত রাওল সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে যাইয়া তাঁহার আমূল জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা হয়; তিনি আলাপ ও ব্যবহারাদিতে বেশ সৌজন্য প্রকাশ করিলেন। পরিশেষে তিনি সাহেব বাহাদুরের সঙ্গে গৌরীকুণ্ড পর্য্যন্ত যাইবেন ও তদনন্তর একবার শ্রীশ্রী৺কেদারনাথ পুরীতেও পদার্পণ করিবেন জানা গেল। এখানে মধ্যাহ্নকৃত্যাদি সমাপনান্তে দর্শনাদি করিয়া আহারাদি করতঃ বিশ্রাম করা হয়। বৈকালবেলা সাধারণ বৃষ্টি ও শিলাপাত হয়, এখানে রাত্রিতে সাধারণ ঠাণ্ডা অনুভূত হয়, ক্রমে জলযোগের ব্যবস্থাদি করিয়া রাত্রি বাস করা হয়।

৯ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার প্রাতে জলযোগের পর বরাবর সোজা পথে চলিয়া এক মাইল দূরবর্ত্তী নালা চটীতে যাইয়া পৌঁছি।

নালা চটী।

যাত্রীগণকে শ্রীশ্রীকেদারনাথ দর্শনান্তে এই চটী পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসিয়া নিম্ন পথে যাইতে হয়। এই পথটী উখীমঠ ও শ্রী৺তুঙ্গনাথ হইয়া লালসাঙ্গাতে পৌঁছিয়াছে। এস্থানে শ্রী৺ললিতাদেবী ও মহাদেবের মন্দির, সাধারণ ২।৩ খানা ঘর, দোকান ও জলের বন্দোবস্তাদি আছে। এই স্থানে নাগরা জুতা বিক্রয় হয়। এই স্থান হইতে বরাবর সোজা পথে চলিতে আরম্ভ

নারায়ণ স্থান বা নারায়ণ কোটা।

করিয়া তিন মাইল দূরবর্ত্তী নারায়ন স্থান বা নারায়ণ কোটা চটীতে যাইয়া পৌঁছি। এখানে শ্রীশ্রীনারায়ণ দেবের বিশাল মন্দির ও ৪।৫টী ছোট মন্দির, ৭।৮ খানা বেশ পরিষ্কার ঘর, খাদ্য দ্রব্য মিঠাই আদির দোকান, পরিষ্কার

জলের ঝরণা আছে এবং এই চটীতে বেশ দুধ পাওয়া যায়। এস্থানে সাধারণ বিশ্রাম করা হয়। এই স্থান হইতে পাহাড়ী পথে শ্রীকালীমঠে যাওয়া যায়। যাঁহারা তথায় যাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে নারায়ন স্থান হইতে পাহাড়ী লোক সঙ্গে করিয়া যাইতে হয়। এস্থান হইতে ক্রমশঃ উথরাই করিয়া ২ মাইল দূরবর্ত্তী ব্যুঙ্গচটীতে যাইয়া পৌঁছি।

শ্রীকালীমঠ।

ব্যুঙ্গচটী

এখানে ৫।৬ খানা ঘর, খাদ্য দ্রব্য ও সাধারণ জল খাবারের দোকান, পরিষ্কার জলের ঝরণা ইত্যাদি আছে। এই চটীতে বেশ দুধ পাওয়া যায়। এবং খানিক উপরেও ২ খানা ঘর ও জলের বন্দোবস্তাদি আছে। এখানে একজন জঙ্গম গোসাঞি বাস করেন। এখানেও ঝরণার জলের স্রোতের জোরে চাকা ঘুরাইয়া নানাবিধ কাঠের জিনিষ তৈয়ার হয়। এখানে বিশ্রামান্তে সাধারণ একটি চড়াইতে উঠিতে আরম্ভ করিয়া দুই মাইল দূরবর্ত্তী মৈখণ্ডা গ্রামে যাইয়া পৌঁছি। এখানে মহিষমর্দ্দিনীদেবীর মন্দির ও লৌহ-শিকল যুক্ত একটি দোলনা আছে। এই গ্রামটি বেশ সমৃদ্ধিশালী ও নানা শস্য পরিপূর্ণ দেখা গেল। এ স্থান হইতে খানিক দূরে পরিষ্কার জলের ২টি গোমুখী ধারা ও একটি শিবালয় আছে। এই স্থান হইতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া এক মাইল দূরবর্ত্তী ফাটা চটিতে পৌঁছিয়া একটি বেশ পরিষ্কার ঘরে বাসস্থান নির্দ্দেশ করা হয়। এই চটিতে একটি সরকারী

মৈখণ্ডা বা মৈষখণ্ডা।

ফাটা চটী।

ধর্ম্মশালা, ১০।১২ খানি বেশ বড় বড় ঘর, সর্ব্বপ্রকার খাদ্য দ্রব্য ও মিঠাই প্রভৃতির দোকান, পরিষ্কার জলের ঝরণা ইত্যাদি আছে; চটিওয়ালাগণ বেশ ভাল লোক ও বিশ্বাসী। এখানে মধ্যাহ্নকৃত্যাদি সমাপনান্তে আহারাদি করা হয়। এই চটিতে দুধ পাওয়া যায় ও অনেক নাগরা জুতা বিক্রয় হয়। বৈকাল বেলায় শ্রীশ্রীকেদারনাথের ফেরত একদল বাঙ্গালীও ফিরিয়া আসিবার সময় হিন্দুস্থানী যাত্রীর সঙ্গে দেখা হয়। তন্মধ্যে চট্টগ্রামের পেন্সন প্রাপ্ত সুবাদার নারায়ণ সিংহ, ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার জমিদার শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী ও নবদ্বীপচন্দ্র রায় শ্রীযুত কামদা চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বৈষ্ণব সাধু শ্রীযুত করুণাকর দাস মহাশয়দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের সঙ্গে ধর্ম্ম বিষয়ক নানা প্রকার আলাপাদি হয়। সন্ধ্যার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহারা রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত ভগবন্নাম কীর্ত্তন করেন এবং সমস্ত সময়টা পরমানন্দে অতিবাহিত হয়। রাত্রিতে জলযোগের ব্যবস্থা ও রাত্রি বাস করা হয়।

১০ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার প্রাতে জলযোগের পর পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাগনের নিকট বিদায় লইয়া অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়া দুই মাইল দূরবর্ত্তী বাদলপুরে উপনীত হই; এখানে ৩।৪ খানি ঘর, খাদ্য দ্রব্য ও সাধারণ খাবারের দোকান ও জলের বন্দোবস্তাদি আছে। এই স্থান হইতে এক মাইল দূরে রামপুর চটি। এই চটিতে ১৫।১৬ খানা বেশ বড় ও পরিষ্কার ঘর, সর্ব্বপ্রকার খাদ্য দ্রব্য ও মিঠাইয়ের দোকান, পরিষ্কার

বাদল পুর।

জলের ঝরণা ইত্যাদি আছে। এখানে যথেষ্ট পরিমাণ দুগ্ধ পাওয়া যায়। এখানে সাধারণ বিশ্রামান্তে গরম দুধ পান করা হয়। এই স্থান হইতে এক মাইল দূরে জলের স্রোতের বেগে কাঠের জিনিষ তৈয়ার হইতেছে। তথা হইতে প্রায় ১০০ গজ উপরে দুইটি রাস্তা বাহির হইয়া গিয়াছে। প্রথমটি দুই মাইল চড়াই করিয়া শ্রী৺ত্রিযুগী নারায়ণের দিকে, অপরটি সোজা শৌনক প্রয়াগ অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। এই পথে প্রায় দুই মাইল চড়াই করিয়া শ্রী৺শাকম্ভরী দেবীর মন্দির পাওয়া যায়। এখানে বাসস্থানের উপযোগী কোন গৃহাদি নাই। ঐ স্থান হইতে আর খানিক অগ্রসর হইলেই শ্রীশ্রী৺ত্রিযুগী নারায়ণ দেবের মন্দির। এই মন্দিরের সম্মুখে তিন যুগের প্রজ্জ্বলিত ধুনা বিদ্যমান আছে; পাণ্ডা মহারাজগণ প্রত্যহ এই ধুনাতে কাঠ দিয়া থাকেন তাই কখনও নিবেতে পারে না। প্রবাদ আছে যে দেবাদিদেব মহাদেবের বিবাহের সময় এই ধুনী প্রজ্জ্বলিত করিয়া হোমাদিকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মকুণ্ড, উত্তরে রুদ্রকুণ্ড ও বিষ্ণুকুণ্ড আছে, মন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বস্থ পর্ব্বত হইতে বিষ্ণুগঙ্গা প্রবাহিত হইয়া বিষ্ণুকুণ্ডের সহিত মিলিত হইয়াছে, মন্দিরাভ্যন্তরে অষ্টধাতু নির্ম্মিত শ্রীশ্রী৺নারায়ণ দেবের মূর্ত্তি ও লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি ইত্যাদি আছে। বাহিরে অনেকগুলি ছোট ছোট মন্দিরে অনেকগুলি দেবমূর্ত্তিও আছে। মন্দিরের পশ্চাতে লক্ষ্মী-ভাণ্ডার, এই মঠও শ্রীশ্রী৺কেদারনাথের রাওল সাহেবের তত্ত্বা-

রামপুর চটী।

ত্রিযুগী নারায়ণ।

বধানে আছে। এখানে নারায়ণের পূজা বার মাসই হইয়া থাকে। এখানে কালীকম্বলী বাবার ধর্ম্মশালা, ১০।১২ খানা ঘর, সর্ব্বপ্রকার খাদ্য দ্রব্য ও মিঠাই আদির দোকান, সাধু সন্ন্যাসীর জন্য সদাব্রত ইত্যাদির বন্দোবস্ত আছে। এখানে বেশ গোল আলুর চাষ হয়। শ্রীশ্রীনারায়ণ দেবের সাধারণ ভোগরাগের বন্দোবস্ত আছে, তবে প্রসাদ অন্য কাহারও ভাগ্যে তেমন জোটে না। মন্দিরের আসে পাশে নানা রং বিরঙ্গের সাপ দেখা যায়। এখানে পাণ্ডামহারাজগণের ৩০।৩৫ খানি বাড়ী আছে ও তাঁহারা বেশ চালাক চতুর *।

শৌনক প্রয়াগ।

শ্রীশ্রীত্রিযুগীনারায়ণ হইতে দুই মাইল উথরাই পথে রামপুর চটী ও সোজা রাস্তায় দুই মাইল দূরে শৌনক প্রয়াগ। এই স্থানটী মন্দাকিনী ও শৌনক গঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত; এখানে কোন পাণ্ডাদি নাই। সমস্ত কার্য্যাদি স্ব স্ব বন্দোবস্তে করিতে হয়। এখানে একটীমাত্র ঘর, সর্ব্বপ্রকার খাদ্য ও জলখাবারের দোকান ইত্যাদি আছে। পূর্ব্বে শৌনক গঙ্গার উপর একটী লৌহ ও কাঠের পুল ছিল।

* আমরা শ্রী৺কেদারনাথ যাওয়ার সময় এই স্থান দিয়া না যাইয়া বরাবর শৌনক-প্রয়াগ হইয়া গিয়াছিলাম ও ফিরিবার সময় শ্রীশ্রীগঙ্গোত্তরী যাইবার পথে এই স্থান দর্শন করিয়া যাই। সাধারণের সুবিধার জন্য প্রথমতঃ এই স্থানের বিবরণাদি লেখা হইল। যে সকল যাত্রী প্রথমতঃ গঙ্গোত্তরিতে যান তাঁহারা ঐ স্থান হইতে ফিরিয়া ভাটোয়ারি ও বুড়াকেদার দর্শনান্তে এখানে আসিয়া পৌঁছেন ও এখান হইতে দুই মাইল উৎরাইতে শৌনক প্রয়াগ হইতে শ্রীশ্রী৺কেদারনাথ যাইবার রাস্তা পাইয়া থাকেন।

কয়েক বৎসর হইল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তবে শৌনকগঙ্গা উত্তীর্ণ হইবার জন্য একটী কাঠের পুল দেওয়া হইয়াছে। এস্থানে সাধারণ "উথরাই" করিয়া পুল অতিক্রম করতঃ আর একটী চড়াই করিতে আরম্ভ করি। ক্রমশঃ এক মাইল চলিয়া যাওয়ার পর মুণ্ডকাটা গণপতিদেবের মন্দির প্রাপ্ত হই। এখানে বিশেষ বাসোপযোগী গৃহাদি নাই।

মুণ্ডকাটা গণেশ।

এই স্থান হইতে বরাবর সোজাপথে দুই মাইল দূরে গৌরীকুণ্ড। বেলা সাড়ে এগারটার সময় গৌরীকুণ্ডে উপস্থিত হই। এখানে একটী শীতল জলের ও আর একটী উষ্ণ জলের কুণ্ড, শ্রী৺গৌরীশঙ্কর দেবের মন্দির, একটী বৃহৎ ধর্ম্মশালা, পাণ্ডা মহারাজগণের ১৫।২০ খানা বাড়ী, ১০।১২ খানা ঘর, সর্ব্বপ্রকার খাদ্যদ্রব্যের ও মিঠাই মিষ্টান্নাদির দোকান এবং পরিষ্কার জলের ঝরণা ইত্যাদি আছে। ইহার পার্শ্বদেশ দিয়া মন্দাকিনী প্রবাহিতা হইতেছে। স্থানটী বড় সেঁথসেঁথে ও দুর্গন্ধপূর্ণ ও স্থানীয় দোকানদারেরা বিশেষ ধূর্ত্ত। এখানে বরিশাল নিবাসী কবিরাজ শ্রীযুত দুর্গানাথ গুপ্ত মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ গুরুদেবের হঠাৎ সমাধি গ্রহণ ইত্যাদি বিষয় লইয়া অনেক দুঃখ প্রকাশ করিলেন। এখানে মধ্যাহ্নকৃত্যাদি সমাপনান্তে আহারাদি ও বিশ্রাম করা হয়। বেলা তিন টার সময় এস্থান হইতে সাধারণ চড়াই পথে চলিতে আরম্ভ করিয়া দুই মাইল দূরবর্ত্তী শ্রী৺চীরবাসা ভৈরব জিউর

গৌরীকুণ্ড।

চীরবাসা ভৈরব।

মন্দিরের সম্মুখে যাইয়া উপনীত হই। ভৈরবজিকে ছিন্নবস্ত্র দ্বারা পূজা করিতে হয় প্রবাদ আছে যে, না করিলে তিনি যাত্রীর সমস্ত ফল হরণ করেন। এ পথটার অনেক স্থান অত্যন্ত অপ্রশস্ত তবে চলিতে বিশেষ কোন কষ্ট হয় না; কাণ্ডী, ঝাম্পান ইত্যাদি অনায়াসে যাতায়াত করিতেছে। এই স্থান হইতে প্রায় এক মাইলের অধিক দূরে ভীমসেন শিলা বা ভীমসেনের বিশাল প্রস্তর মূর্ত্তি আছে। পাণ্ডা মহারাজগণের মতে কিম্বদন্তী এই যে, ভীমসেন উক্ত স্থানে পতিত হইয়াছিলেন। এ স্থান হইতে প্রায় এক মাইলের অধিক দূরে রামবাড়া চটী। পর্ব্বতগাত্র হইতে পতিত শ্বেতধারা বিশিষ্ট প্রশ্রবণগুলি দেখিতে পরম রমণীয়। এই পথের উপর দিয়া অনেকগুলি ঝরণা বহিয়া যাইতেছে। সন্ধ্যা সাতটার সময় রামবাড়া চটিতে উপনীত হই। এই স্থানে ১৫।২০ খানা ঘর, সর্ব্বপ্রকার খাদ্যদ্রব্য ও মিঠাইয়ের দোকান, অনেকগুলি জলের লহর ও ঝরণা আছে। চটিওয়ালাগণ ভাল লোক। এখানে রাত্রিতে জলযোগ করিয়া অবস্থান করা হয়। রাত্রিতে বেশ ঠাণ্ডা অনুভূত হইয়াছিল।

ভীমসেন।

রামবাড়া।

১২ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার প্রাতে জলযোগের পর ক্রমোচ্চ পথে চলিতে আরম্ভ করি। রাস্তার দুই পার্শ্বে পর্ব্বত-গাত্রে অনেকগুলি লাঙ্গুলবিহীন ইন্দুর দেখা গেল। তাহারা শ্রীশ্রীকেদারনাথদর্শনাভিলাষী মহাত্মাগণকে দেখিয়া আনন্দে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেছিল। ক্রমশঃ দুই মাইল অগ্রসর হইবার পর শ্রীশ্রী৺

কেদারনাথের মন্দিরের স্বুবর্ণ নির্ম্মিত চূড়া দেখা যাইতে লাগিল। তখন সকলে চড়াই, উথরাই ও ঠাণ্ডা জনিত কষ্টের কথা বিস্মৃত হইয়া পরম আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। সঙ্গীয় সাধু মহাত্মাগণ একবার উচ্চৈঃস্বরে "শ্রী৺কেদারনাথজিকি জয়" ও "এক শ্রীমৎ গুরুমহারাজকি জয়" বলিয়া আনন্দ ধ্বনি করিলেন। তাঁহাদের সহিত সহানুভূতি ও সামঞ্জস্য রাখিতে যাইয়া নয়ন-কোণে প্রেমাশ্রু দেখা দিল। ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া মন্দাকিনীর উপর এক কাষ্ঠনির্ম্মিত পুল উত্তীর্ণ হইয়া বেলা নয়টার সময় শ্রীশ্রী৺কেদারনাথ পুরীতে পৌঁছিলাম। শ্রীশ্রীকেদারনাথ

শ্রীশ্রীকেদারনাথ পুরী।

পুরি প্রায় চতুর্দ্দিকে তুষার ধবল পর্ব্বতমালা-বেষ্টিত একটি বিস্তীর্ণ উপত্যকা ভূমিতে অবস্থিত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতীব মনোরম। স্কন্দপুরাণের মতে হিমালয় প্রদেশে, বিশেষতঃ গঙ্গাগর্ভে যত তীর্থ আছে সকেলর অধিপতি শ্রী৺কেদারনাথ, আর স্থানটির নাম শ্রীকেদার খণ্ড। ইহার প্রাচীন ইতিহাস অত্যন্ত সুন্দর। প্রবাদ আছে যে, পাণ্ডবগণ শ্রীশ্রী৺কেদারনাথের প্রতিষ্ঠাতা। কুরুক্ষেত্র সমরের পর আত্মীয় স্বজন ও জ্ঞাতিবধ জনিত পাপ-ক্ষয়ের জন্য পৃথিবীর সমস্ত তীর্থ পর্য্যটনান্তেও তাঁহাদের পাপক্ষয় হইয়াছে বলিয়া ধারণা না হওয়ায়, তাঁহারা বিষণ্ণ মনে বসিয়া আছেন এমন সময়ে দৈববাণী হইল যে, "তোমরা হিমালয় প্রদেশে যাইয়া শ্রী৺কেদারনাথের দর্শন ও স্পর্শন কর তাহা হইলেই তোমরা পাপমুক্ত হইবে।" তখন পাণ্ডবেরা এই দুর্ল্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত-

শ্রেণী উল্লঙ্ঘন করিয়া এস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন কিন্তু যথাস্থানে শ্রী৺কেদারনাথের দর্শন না পাইয়া অতি ক্ষুন্নমনে কি করিবেন চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীশ্রী৺কেদারনাথ তাঁহাদের ভক্তিপরীক্ষার্থ ধবল তুষারাচ্ছাদিত স্থানে নিজ মায়া-পরিগৃহীত বিশাল মহিষ-মূর্ত্তিতে দর্শন দিলেন। পাণ্ডবেরা ধ্যানবলে জানিতে পারিলেন যে, এই বিশাল মহিষ-মূর্ত্তিই শ্রীশ্রী৺কেদারনাথ। তখন তাঁহারা ঐ মূর্ত্তির কাছে অগ্রসর হইয়া ভক্তিভরে যেমন তাহার পশ্চাদ্ভাগ স্পর্শ করিলেন অমনি শ্রী৺কেদারনাথ স্ব মূর্ত্তিতে তাঁহাদের দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিলেন। সেই সময় পাণ্ডবেরা তাঁহাকে যে বিশাল মূর্ত্তিতে প্রথম দেখিয়াছিলেন তাঁহার তদনুরূপ মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা করিলেন। এখন নেপাল দেশে শ্রী৺পশুপতিনাথ দেবের যে মূর্ত্তি আছে তাহা সেই বিশাল মহিষের দেহ এবং কেদারখণ্ডের ঐ লিঙ্গ-মূর্ত্তি উক্ত বিশাল মহিষের শিরোভাগ বলিয়া বর্ণিত হয়। এই স্থানে কোন দুষ্ক্রিয়াপরায়ণ ব্যক্তি অবস্থান করিতে পারে না। শ্রী৺কেদারনাথের মন্দিরের দরজা দক্ষিণ মুখায় ও মন্দির তিনটী খণ্ডে বিভক্ত। ভিতরের অংশে শ্রী৺কেদারনাথের বিশাল লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজমান। মন্দিরের ভিতরে সদাসর্ব্বদা টুপটাপ করিয়া জল পড়িতেছে, হঠাৎ এই বিশাল মূর্ত্তি দেখিলে মনে ভয়ের উদ্রেক হয়। চতুষ্কোণবিশিষ্ট গৌরীপীঠের উপর বিশাল লিঙ্গমূর্ত্তিতে ঘৃত মাখাইয়া যাত্রিগণ আপনাপন পাপ ও মহাব্যাধি ইত্যাদি হইতে মুক্ত হইবার জন্য আলিঙ্গন করিয়া

থাকেন। ভিতরের ভাগে আলোর বন্দোবস্তটী ভাল নহে ও মন্দিরের কোন জানালা ইত্যাদি নাই। এই মন্দিরেও শীতের ছয়মাস ব্যাপিয়া একটী প্রদীপ জ্বলিতে থাকে ও দরজা খোলার দিন যাত্রিগণ উহা দর্শন করিয়া পরম কৃতার্থ হন। মন্দিরের মধ্যভাগে শ্রী৺পার্ব্বতীদেবী ও শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি এবং ও সম্মুখভাগে পঞ্চ পাণ্ডব, দ্রৌপদী, কুন্তী, পিতলনির্ম্মিত নন্দী ও প্রমথগণের মূর্ত্তি ইত্যাদি আছে। মন্দিরের পশ্চাৎ ভাগে অমৃত কুণ্ড, ঈশান কোণে সুফল কুণ্ড, হংস কুণ্ড; তাহার দক্ষিণে রেতঃ কুণ্ড ও মন্দিরের সন্মুখে পারাসংযুক্ত উদককুণ্ড ইত্যাদি আছে। পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিম পার্শ্বস্থ পর্ব্বত হইতে ক্ষীর, মহোদধি, সরস্বতী, স্বর্ণদ্বারী ও মন্দাকিনী গঙ্গা বহির্গত হইয়া মন্দাকিনী গঙ্গা নাম ধারণ করিয়া রুদ্রপ্রয়াগে অলকানন্দার সহিত মিলিত হইয়াছে। স্নান ঘাটের পার্শ্বে শ্রী৺অন্নপূর্ণাদেবী, অগ্নিকোণে শ্রী৺ভৈরবনাথের মন্দির ইত্যাদি ও মন্দিরের উত্তর পূর্ব্ব পার্শ্বে শ্রীযুত রাওল সাহেবের একটী জীর্ণ বাড়ী আছে। পূর্ব্বতন রাওল মহোদয়গণের কেহ এখানে আসিয়া থাকিতেন না বলিয়া বাড়ীর এই দুর্দ্দশা। সম্প্রতি বর্ত্তমান রাওল সাহেব উক্ত বাড়ী এবং মন্দিরের ভিতর ও বাহিরের প্রাঙ্গন মেরামত করাইবার জন্য পরম উদ্যোগী হইয়াছেন। এখানে কালী কম্বলী বাবার তরফে অনেকগুলি ধর্ম্মশালা, ইন্দোর পাতিয়ালা, গোয়ালিয়ার প্রভৃতি স্থানের রাজন্যবৃন্দের ও কলিকাতার চাষাধোবা পাড়া নিবাসী শ্রীমতী মুক্তকেশী দেবীর

প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মশালা, ইত্যাদিতে ৪০।৫০টী ঘর, কয়েক খানি সর্ব্বপ্রকার আহার্য্য দ্রব্যের ও মিঠাই মিষ্টান্নের দোকান, পাকা বান্ধান স্নান ঘাট ইত্যাদি আছে। এখানে সাধু ও অভ্যাগতদের জন্য সদাব্রত ও শীতোপদ্রব-নিবারণোপযোগী সমস্ত সম্ভার যোগান হইয়া থাকে। এখানে শ্রীমতী মুক্তকেশী দেবীর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মশালায় বাসস্থান নির্দ্দেশ করা হয়। মধ্যাহ্নকৃত্যাদি সমাপনান্তে দর্শনাদি করিয়া পরমানন্দে এক প্রীতি ভোজের আয়োজন করা হয়। পরমহংস স্বামী শ্রীমৎ প্রকাশানন্দ সরস্বতী মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ হয় তিনি একজন বেশ সুবিদ্বান ও সজ্জন মহাপুরুষ। এখানে দিনের বেলায়ও কলিকাতার মাঘ মাসের কনকনে শীত অনুভূত হইতেছিল। এখানে সকল জিনিষ অত্যন্ত মহার্ঘ্য।

বেলা ২টার সময় হইতে ধামস্থ লোকজনকে বিশেষ উৎকণ্ঠিত অবস্থায় দেখা যাইতে লাগিল, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, সকলে শ্রীমৎ রাওল সাহেবের আগমন প্রতীক্ষায় এরূপে অবস্থান করিতেছেন ও অভ্যর্থনার্থ সমবেত হইয়াছেন। ক্রমশঃ পূজারি মহারাজ ও ধামস্থ পাণ্ডা মহারাজগণ এবং কয়েক জন আর্দ্দালি আসিয়া একত্র হইল। আমিও উৎসুক চিত্তে পথি পার্শ্বে দাঁড়াইলাম, দেখিলাম আগে আগে দুই জন সোটা-ধারী আর্দ্দালি তৎপশ্চাৎ শ্রীযুত রাওল ও কয়েকজন কর্ম্মচারী সাহেবের শিবিকা এবং অন্য একটা ঝাম্পানে তাঁহার প্রথম পুত্র আসিতেছেন। কোন আড়ম্বর ইত্যাদি নাই। সমবেত সকলে

তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা ও সম্মান প্রদর্শন করিলে পর তিনি সহাস্য বদনে আপন শিবিকা দাঁড় করাইয়া সকলের কুশল মঙ্গলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া আপন কুটীরে আসন গ্রহণ করিলেন।

বেলা ৪টার পর হইতে এক অদ্ভুতপূর্ব্ব দৃশ্যের সূচনা দেখা যাইতে লাগিল, আকাশ ক্রমশঃ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া দেখিতে দেখিতে পর্ব্বত শৃঙ্গের উপর বসিয়া গেল তাহাতে বোধ হইতে লাগিল যেন বৃহৎ একটা পাকা বাড়ীর ছাদ তৈয়ার হইয়া গেল, ক্রমশঃ মেঘগুলি নিম্নদেশে নামিতে আরম্ভ করিল, আনুমানিক পাঁচটার সময় আমাদের চারিপার্শ্বস্থ ঘর বাড়ী ইত্যাদি সমস্ত ঢাকিয়া গেল এমন কি ১০।১২ হাত দূরদেশস্থ বাড়ী বা মানুষ দেখা যাইতে লাগিল না, বাহিরে যত লোক জন ছিল সকলে গৃহে প্রবেশ করিল, ক্রমশঃ বৃষ্টি ও ছোট ছোট শিলাপাত হইতে লাগিল, এত অধিক ঠাণ্ডা অনুভূত হইতেছিল যে সকলকেই ধূনীর বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল এবং অধিক পরিমাণ গরম বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত এই অবস্থা ছিল, ও মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত বৃষ্টি হইয়াছিল। রাত্রিতে জলযোগের ব্যবস্থা করা হয় ও পরমানন্দে রাত্রি যাপন করা হয়।

এখানকার পাণ্ডা মহারাজগণের সৌজন্য বিশেষ উল্লেখ যোগ্য, তাঁহারা যাত্রিগণের যথা সাধ্য সর্ব্বপ্রকারে সুবিধাদি করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন, শ্রীশ্রী৺কেদারনাথ দেবের পূজা, ভোগ, আরতি ইত্যাদির সময়ে সকলকে সংবাদ দিয়া দর্শনাদি করাইয়া থাকেন, ও যাত্রিগণের শীত নিবারণের জন্য

স্বব্যয়ে যথেষ্ট গরম কম্বলাদি মজুত রাখেন ও প্রয়োজন মত যোগাইয়া থাকেন। ধামের সকল ঘরগুলিতে দরজা, জানালা আছে, নীচের ঘরগুলির তলদেশে কাঠের ছাউনি দেওয়া আছে। আমাদের বাঙ্গালা অঞ্চলের পাণ্ডা মহারাজ শ্রীযুত পণ্ডিত উমাশঙ্কর হরিশঙ্কর মহোদয়গণ অতি দক্ষতার সহিত সকল তত্ত্বাবধান করেন। আমরা শ্রীযুত পণ্ডিত বেণী প্রসাদ অবস্তী মহারাজের তত্ত্বাবধানে ছিলাম, তাঁহারাও বেশ ভাল লোক। আমরা দুই পাণ্ডা মহারাজ হইতে শীতের জন্য ৪ খানি কম্বল পাইয়াছিলাম।

১২ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার প্রাতে মন্দাকিনীতে স্নান করিয়া হাত পা এক রকম অসাড় হইয়া উঠে, সঙ্গীয় সাধু মহারাজ অগ্নির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। আমরাও প্রায় এক ঘণ্টা পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া শ্রী৺কেদারনাথ দর্শনান্তে আহারাদি সমাপন করি, খানিক বিশ্রাম করিয়া পাণ্ডা মহারাজগণকে আলাপ ও ব্যবহারাদিতে পরিতোষ পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করি। এই ক্ষেত্রের উত্তর পার্শ্বে যে বিশাল হিমগিরি দৃষ্ট হয় ঐ স্থানে ক্ষত্রবীর্য্য-ধ্বংসকারী নারায়ণের ষষ্ঠ অবতার শ্রীমৎ মহর্ষি পরশুরামদেবের পতন হয় তাই উক্ত স্থানের নাম ভৃগুপতন বা মহাপথ। এই স্থানের অপর পার্শ্বে শ্রীশ্রীবদরীকাশ্রম। কিম্বদন্তী আছে যে, পুরাকালে এক পূজারিই শ্রী৺কেদারনাথ ও শ্রী৺বদরিনারায়ণ দেবের পূজা সম্পন্ন করিতেন, তাঁহারা পরম যোগী ছিলেন। বর্ত্তমান

ভৃগুপতন বা মহাপথ।

সময়ে এমন শক্তিশালী লোক অতি কম আছেন যাঁহারা সেরূপ যোগবলে উক্ত পথ লঙ্ঘন করিতে পারেন। কালের বিচিত্র গতিতে এখন এই সকল স্থান প্রায় সাত দিনের পথ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বেলা দশটার সময় শ্রীশ্রী৺কেদারনাথ পুরী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করি। প্রায় দুই মাইলের অধিক চলিয়া আসার পর শ্রী৺কাশী ধামস্থ শ্রীমৎ পরমহংস বেদানন্দ স্বামিজিউ মহারাজের শিষ্য-প্রবর শ্রীমৎ হরিবোল ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি একজন আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ; 'হরিবোল' শব্দটী তাঁহার প্রত্যেক কথার সঙ্গে যুক্ত আছে, তিনি সকল সময়ে সকল কথার সহিত 'হরিবোল' শব্দটী ব্যবহার করেন বলিয়া তাঁহার গুরুদেব মহারাজ তাঁহার নাম শ্রীমান হরিবোল ব্রহ্মচারী রাখিয়াছেন, তাঁহার মুখনিঃসৃত কয়েকটী কথা উদ্ধৃত করিয়া-দিতেছি তাহাতে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন তিনি 'হরিবোল' শব্দটীতে কি প্রকারে মাতোয়ারা হইয়া আছেন ঃ—"দেরাদুন থেকে বের হয়ে গঙ্গোত্তরীর পথেই একাই হরিবোল করছিলুম, তারপর এই হরিবোলের সাক্ষাৎ পাই, আজ তিন চারি দিনের পর আবার আপনারা তিনটী হরিবোল পাইয়া হৃদয় আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া উঠিল হরিবোল হরিবোল ইত্যাদি"। তাঁহার সহিত অনেক আনন্দ করিয়া বিদায় লওয়া হয়। তদনন্তর চলিতে আরম্ভ করিলে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া বস্ত্রাদি ভিজাইয়া দেয়। ঐ বৃষ্টি সঙ্গে করিয়া রাম বাড়ীতে আসিয়া রাত্রিতে আহারাদি ও বাস করা হয়। ১৩ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার প্রাতে জলযোগের পর

ক্রমশঃ চলিতে আরম্ভ করিয়া বেলা ১০টার সময় গোলক প্রয়াগে উপনীত হই। ঐ স্থানে মধ্যাহ্নকৃত্যাদি সমাপনান্তে আহারাদি করা হয়। দ্বিপ্রহরের পর হইতে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয় তাই অনন্যোপায় হইয়া উক্ত স্থানে থাকিতে বাধ্য হই, রাত্রিতে একজন বৈষ্ণব সাধু আসিয়া মিলিত হন তাঁহার সহিত হৃষীকেশ হইতে পরিচয় ছিল। তিনিও রাত্রিতে আমাদের সহিত আহারাদি করেন ও তথায় রাত্রিবাস করেন। ১৪ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার প্রাতে শ্রীশ্রী৺ত্রিযুগীনারায়ণ-দর্শনাভিলাষা হইয়া একটা চড়াই করিতে আরম্ভ করি, এক মাইল উপরে শ্রী৺শাকম্ভরীদেবী-দর্শনান্তে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া বেলা সাড়ে নয়টার সময় শ্রীশ্রী৺ত্রিযুগীনারায়ণে উপস্থিত হই। তথায় মধ্যাহ্নকৃত্যাদি সমাপন এবং দর্শনান্তে আহারাদি ও বিশ্রামাদি করা হয়। দ্বিপ্রহরের পর হইতে বৃষ্টি হইতে থাকে, এখানে রাত্রিতে আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া রাত্রিবাস করি, সন্ধ্যার সময় স্থানীয় পাণ্ডা-মহারাজগণকে ঐস্থান হইতে গঙ্গোত্তরী যাইবার পথের অবস্থাদি জিজ্ঞাসা করিয়া যথাসাধ্য নোট করিয়া লই, তাঁহাদিগকে যথোচিত বাক্যালাপে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক গঙ্গোত্তরী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকি।

তৃতীয় খণ্ড

১৫ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার প্রাতে শ্রীশ্রী৺ত্রিযুগীনারায়ণ পুরী হইতে শ্রীশ্রীগুরুচরণ স্মরণ করিয়া সঙ্গীয় পরিব্রাজক মহারাজ ও পরিব্রাজিকা মাতাজী সহ নিবিড় অরণ্য পথে শ্রীশ্রীগঙ্গোত্তরি-দর্শন-মানসে রওনা হইলাম। এই পথটা শ্রীশ্রীবদরিকাশ্রম বা শ্রীকেদারনাথ পুরীতে যে সব রাস্তা গিয়াছে তদ্রূপ নহে। এইটী পাহাড়ীদিগের চলাচলের রাস্তা। শ্রীশ্রীগঙ্গোত্তরী হইতে শ্রীশ্রী৺-কেদার নাথের দিকে আসিতে ইহা ব্যতীত আর অন্য রাস্তা নাই। পথের উপর অনেক স্থানে বড় বড় গাছ, শুষ্ক পাতা, গাছের ছোট ছোট ডাল পালা ইত্যাদি পড়িয়া আছে। কোথায়ও বা ঐ সকল অতিক্রম করিতে হয়, কোথাও বা পার্শ্বদিয়া ঘুরিয়া যাইতে হয়। সম্প্রতি এই রাস্তাটী সুন্দররূপে তৈয়ার করিবার প্রস্তাব চলিতেছে। ভগবৎ কৃপায় কার্য্য সম্পান্ন হইয়া গেলে যাত্রী ও সাধারণ লোক-চলাচলের সুবিধা হইয়া যাইবে। এই স্থান হইতে ক্রমশঃ চড়াই করিতে আরম্ভ করি। অরণ্যবাসী বিবিধ বিহঙ্গ সমূহ মধ্যে মধ্যে সুমধুর ধ্বনিতে অরণ্যের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া আমাদের হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ প্রদান করিতেছিল। পথিমধ্যে কয়েক দল গঙ্গোত্তরী হইতে প্রত্যাগত যাত্রীর সঙ্গে দেখা হইল,

তাহাদিগকে পথের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা নানাপ্রকার উৎসাহপূর্ণ বাক্যে আমাদের সাহস দৃঢ় করিয়া দিতে লাগিল। ক্রমে চলিতে চলিতে পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী মঙ্গুচটীতে উপনীত হই।

মঙ্গুচটী।

প্রাতঃকাল হইতে পার্শ্বস্থিত পর্ব্বত গাত্রে মেঘের শোভা অতীব সুন্দর দেখা যাইতেছিল। এই চটীতে একটী ধর্ম্মশালা ও একটী মাত্র সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের দোকান আছে, এখানে অল্প নিম্নদেশে একটী জলের ঝরণা আছে, এস্থানে মধ্যাহ্নকৃত্যাদি সমাপনান্তে আহারাদি করা হয়। ধর্ম্মশালা ও দোকানের অবস্থাদি দর্শনে সঙ্গীয় সাধু-মহারাজ এস্থানে থাকিতে অসম্মত হওয়ায় সাধারণ বিশ্রামান্তে আবার চলিতে লাগিলাম। আকাশ ক্রমশঃ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইতে লাগিল, চারিদিকের স্থানগুলি এরূপ ভাবে মেঘে ঢাকিয়া গেল যে ১৫।২০ হাত দূরে কি আছে দেখা যাইতে লাগিল না, ধীরে ধীরে বৃষ্টি, শিলাপাত ও প্রবলবেগে বায়ু বহিতে লাগিল, পর্ব্বতের নিম্নদেশে বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল ও মধ্যে ঘোর নিনাদ বজ্রধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। ক্রমে জ্যোৎস্না রাত্রিতে অতিশয় ঘন কুঝ্‌টিকা হইলে যেমন হয় সেইরূপ বোধ হইতে লাগিল, অধিক পরিমাণে ঠাণ্ডাও অনুভূত হইতে লাগিল। এই বিপদের সময়ে সঙ্গীয় সাধুগণ সহ শ্রীশ্রীগুরুদেবের অভয় পদ-দুখানি স্মরণ করিতে করিতে এই ঘন মেঘজাল ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এরূপে দেড় কি দুই মাইল চড়াই করিবার পর পর্ব্বতশৃঙ্গদেশ দিয়া বরাবর একটী রাস্তা পাইলাম। পথিমধ্যে অনেক স্থানে বরফাবৃত ভূমি

অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। উক্তপথে চলিবার সময় এত প্রবলবেগে ঝড় বহিতেছিল যে অনেক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইতেছিল,নতুবা পা পিছলাইয়া বা হাওয়ার বেগে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল। এইরূপে প্রায় ২।৩ ঘণ্টারও বেশী সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। যখন একটু পরিষ্কার হইল তখন উভয় পার্শ্বে অতি নিম্নস্থিত পর্ব্বতগুলিকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন তাহারা আমাদের এই দুর্দ্দশা দর্শনে অচল অটলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া ভগবৎ সমীপে ইহাই নিবেদন করিতে করিতে নীরবে অশ্রুবিশর্জ্জন করিতেছে। ইতিমধ্যে গঙ্গোত্তরী হইতে আগত একদল যাত্রীর সঙ্গে দেখা হয়, তাহাদের উৎসাহপূর্ণ কথা শুনিয়া ভয়ভীতি সমস্ত দূরীভূত হইয়া গেল। তাহারা বলিল আমরা যত খানি পথ চলিয়া আসিয়াছি আরও ততখানি পথ চলিয়া গেলে চটীতে পোঁছিতে পারিব, তখন বেলা আনুমানিক পাঁচটা বলিয়া বোধ হইল। ক্রমশঃ আকাশ-মণ্ডল পরিষ্কার হইয়া আসিতেছিল। আমরা শ্রীশ্রীগুরুচরণ স্মরণ করিয়া যথাসাধ্য দ্রুত চলিতে লাগিলাম, উভয় পার্শ্বস্থ পর্ব্বত-গুলির শোভা পরম রমণীয় দেখা যাইতেছিল। পর্ব্বত-শৃঙ্গদেশস্থ পাচমাইল পথ অতিক্রম করিতেই সন্ধ্যা হইয়া আসিল, সঙ্গীয় মহাত্মাগণ পথশ্রমে ও অতিরিক্ত ঠাণ্ডার জন্য বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের কম্বলাদি নিজস্কন্ধে চাপাইয়া ত্রস্তব্যস্ত-তার সহিত চলিতে লাগিলাম ও মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের উৎসাহ ও সাহস দিবার জন্য উচ্চৈস্বরে 'গুরু-মহারাজকি জয়' এই মহাবাক্য

বলিতে লাগিলাম। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় পৌমালী চটীতে যাইয়া পৌঁছি। এই চটীতে একটী ধর্ম্ম-

পৌমালী।

শালা, ৪।৫ খানি ঘর, সর্ব্বপ্রকার খাদ্যদ্রব্য ও জল খাবারের দোকান আছে, এই স্থানে দুগ্ধ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়, কিন্তু জলের ঝরণা একটু দূরে অবস্থিত। চটিওয়ালাগণ বেশ ভদ্রতা দেখাইতে লাগিল ও আমরা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি দেখিতে পাইয়া আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অতি সত্বর যোগা-ইয়া দিল। খানিক বিশ্রামান্তে আহারের বন্দোবস্ত করা গেল, চটিওয়ালা বৃহৎ ধূনী জ্বালিয়া দিল তাহাতে আমাদের আর্দ্র বস্ত্রাদি শুকাইয়া লইলাম। ধূনীর উত্তাপ জন্য রাত্রিকালের ঠাণ্ডাতে বিশেষ কষ্ট হয় নাই। চটিওয়ালাগণ আমাদিগকে এই-রূপ দুঃসাহসের সহিত চলিতে বারণ করিল ও নানাবিধ উপ-দেশাদি দিল।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার প্রাতে জলযোগের পর ক্রমশঃ চলিতে আরম্ভ করি, এই পথটা বরাবর উৎরাই করিতে হইয়াছিল, ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিয়া তিন মাইল দূরবর্ত্তী দোফান্দচটীতে আসিয়া উপস্থিত হই। এখানে সাধারণ খাদ্য-

দোফান্দচটী।

দ্রব্যের দোকান ও একটী থাকিবার ঘর এবং জলের ঝরণা আছে; চটীওয়ালার কাছে ভাল দুগ্ধ পাওয়া যায়। সাধারণ বিশ্রামান্তে চলিতে আরম্ভ করিয়া তিন-

গোয়ালমাঢ়ে।

মাইল উৎরাইয়ের পর গোয়ালমাঢ়ে চটি পাওয়া গেল। এখানে একটি সেঁৎসেতে ঘরে সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের দোকান

আছে, জলের ঝরণা প্রায় ২০০ গজেরও অধিক দূরে, এখানেও চটিওয়ালার কাছে দুগ্ধ পাওয়া যায়। পথে কয়েকজন সাধু-মহাত্মা ও কয়েকজন যাত্রীর সঙ্গে দেখা হয়, উক্ত চটিতে দুগ্ধপান ও জলযোগ করিয়া আবার সকলে চলিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উথরাইর পথে তিন মাইল দূরবর্ত্তী গোয়ালা নামক স্থানে উপস্থিত হই। এখানে ২টি ঘর ও সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের দোকান আছে, গ্রামের দৃশ্যটি পরম রমণীয়। মাঠের মধ্যে চাষীগণ কোথায়ও বা বর্ত্তুলাকারে কোথায়ও বা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে কোথায়ও বা বাদামী আকারে ধান বুনিয়াছে। তখন বেলা প্রায় বারটা বাজিয়া গিয়াছে। যে দুটি ঘর আছে তাহা যাত্রীতে পরিপূর্ণ। কোথায়ও দাঁড়াইবার স্থান হইল না বলিয়া আবার মাঠের পথে চলিতে আরম্ভ করি, উথরাইর সময় হাঁটুতে অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হইতেছিল ও মাথা ঘুরিতেছিল। ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে এক মাইল দূরবর্ত্তী গুপ্তু বা রঘুনাথ চটিতে উপনীত হই, এই স্থানটুকু চলিয়া আসিতে এমন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে সুস্থ হইতে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। এই চটিতে ৮।১০ খানা ঘর, কালীকম্বলী বাবার ধর্ম্মশালা, সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের দোকান ও শ্রী৺রঘুনাথ জিউর মন্দির ইত্যাদি আছে। নিম্নদেশ দিয়া ভৃগুগঙ্গা বহিয়া যাইতেছে। এখানে মধ্যাহ্নকৃত্যাদি শেষ করিয়া আহার করা হয়। এখানে স্থানীয় দুই তিনজন পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপে ও ব্যবহারে বেশ আনন্দলাভ করি। রাত্রিতেও

গোয়ালা।

গুপ্তু বা রঘুনাথ চটী।

আহারাদির ব্যবস্থা করা হয়, শরীর ক্রমশঃ অসুস্থ বোধ করিতে থাকি। সঙ্গীয় সাধু-মহারাজের শুশ্রূষাতে বেশ আরাম বোধ করি ও গাঢ় নিদ্রা হয়। পূর্ব্বে এই চটির নাম গুপ্তু চটিই ছিল শ্রীমৎ ব্রজমোহনদাস নামক জনৈক রামানন্দী সাধু এখানে শ্রীশ্রী৺রঘুনাথ জিউ স্থাপন করেন তার পর হইতে এই স্থানের নাম রঘুনাথচটি হইয়াছে ও ধর্ম্মশালা এবং অন্যান্য দোকান ঘর ইত্যাদি তৈয়ার হইয়াছে।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার প্রাতে জলযোগের পর ভৃগু গঙ্গার উপর পুল পার হইয়া পারস্থিত পথে চলিতে আরম্ভ করিয়া এক মাইল দূরবর্ত্তী কুড়েহান চটিতে যাইয়া পৌঁছি। এখানে

কুড়েহান চটী।

একটি ঘর ও সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের দোকান ও জলের ঝরণা আছে এবং পার্শ্বে অনেকগুলি বচের গাছ দেখা গেল। তথা হইতে মাঠের পথে চলিতে চলিতে দুই মাইল দূরবর্ত্তী পানিহাটি চটিতে যাইয়া পৌঁছি। এখানেও একটি ঘর, সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের দোকান ও জলের

পানিহাটী।

ঝরণা আছে। এস্থানে সাধারণ বিশ্রাম করিয়া একটি চড়াই করিতে আরম্ভ করি, কোথায়ও বা সাধারণ উচ্চ কোথাও বা পাহাড়ের উপর দিয়া রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। খানিকটা উঠিয়া একবার জলযোগ করা হয় তদনন্তর

ভামোটী।

চলিতে আরম্ভ করিয়া বেলা ১১টার সময় তিন মাইল দূরবর্ত্তী ভামোটি চটিতে যাইয়া পৌঁছি। এখানে ৩।৪ খানা ঘর, সাধারণ খাদ্য দ্রব্যের দোকান ও

পার্শ্বে জলের ঝরণা ইত্যাদি আছে। এখানে ভাল দুগ্ধ পাওয়া যায়, মধ্যাহ্নকৃত্যাদি সমাপনান্তে আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করা হয়, স্থানটি বড় সেঁথসেঁথে ও অপরিষ্কার। দ্বিপ্রহরে সাধারণ বৃষ্টি হয়, সন্ধ্যার সময় হইতে অত্যন্ত মাথা ব্যথা করিতে থাকে, সঙ্গীয়া পরিব্রাজিকা মাতাজী অনেকক্ষণ শুশ্রূষাদি করিলে রাত্রি শেষে অল্প ঘুম হয়। প্রাতঃসমীরণের শীতল বায়ুস্পর্শে শরীরে ঠাণ্ডা লাগার পর হইতে সুস্থতা অনুভব করিতে থাকি।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার প্রাতে জলযোগের পর উথরাই পথে চলিতে আরম্ভ করিয়া তিন মাইল চলিয়া ভৈরব চটি পাওয়া যায়। এখানে ২ খানা ঘর, সাধারণ খাদ্য-দ্রব্যের দোকান ও একটু দূরে জলের ঝরণা আছে, স্থানটির প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় সুন্দর। ঐ স্থান হইতে আবার উথরাই পথে চলিতে চলিতে দুই মাইল দূরবর্ত্তী টালা চটিতে যাইয়া পৌঁছি। এখানেও ২ খানি ঘর ও সাধারণ খাদ্য-দ্রব্যের দোকান এবং জলের ঝরণা ইত্যাদি আছে, এখানে দুগ্ধও ভালরূপ পাওয়া যায়; এখানে আবার জলযোগ ও দুগ্ধ পান করা হয়। এই স্থান হইতে সাধারণ চড়াই ও উথরাই, কোথায়ও বা সমতল পথে, একটি বেশ শস্য শ্যামল ও বহুজনপূর্ণ গ্রামের ভিতর দিয়া চারি মাইল দূরবর্ত্তী শ্রীশ্রী৺বুড়া-কেদারনাথ দেবের নামীয় চটিতে যাইয়া পৌঁছি। শেষের প্রায় অর্দ্ধ মাইলের বেশী পথ বরাবর উথরাই করিতে হয়।

ভৈরব চটী।

টালাচটী।

বুড়াকেদার।

পথে অনেক স্থানে ঝরণার জল বহিয়া যাইতেছে। বুড়াকেদার স্থানটি অতি মনোরম ও বালগঙ্গা এবং ধর্ম্মগঙ্গা নাম্নী দুইটি নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। চতুষ্পার্শ্বস্থ পর্ব্বতমালা যেন প্রাচীরের মত এ স্থানটিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, কিন্তু দূর হইতে আসিবার সময় এই স্থানের দৃশ্য যে প্রকার দেখা গিয়াছিল আভ্যন্তরীণ অবস্থা সেরূপ নহে। স্থানীয় লোকজন অত্যন্ত অপরিষ্কার ও সকল স্থানই নানাবিধ আবর্জ্জনাদিতে পরিপূর্ণ। মন্দিরটি অতি জীর্ণ শীর্ণ, ভিতরে শ্রী৺বুড়াকেদার নাথ দেবের বিশাল লিঙ্গমূর্ত্তি, অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় বিরাজমান। লিঙ্গের গায়ে শ্রীশ্রী৺হরপার্ব্বতী, গণেশ ও পঞ্চপাণ্ডবের মূর্ত্তি আছে, পশ্চিম প্রান্তে ৭৷৮টি বড় বড় ত্রিশূল আছে, বাহিরে এক খানা ছাপ্পর ঘরের এক কুঠরীতে শ্রী৺অষ্টভুজা দুর্গাদেবী ও অপর খণ্ডটি সাধু সন্ন্যাসীর থাকিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। কোন প্রকার ভোগরাগের বন্দোবস্তাদি নাই, শ্রীশ্রী৺গোরক্ষনাথ-সম্প্রদায়ের লোকেরাই পূজা-কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করেন, তাঁহারা সকলেই গৃহস্থাশ্রমী ও মন্দিরের পূর্ব্ব পার্শ্বেই তাঁহাদের আরাম-স্থান। তাঁহাদের সহিত আলাপের দ্বারা জানিতে পারিলাম শ্রী৺বুড়াকেদারনাথ দেবের সাধারণ আয়ের জমি আছে। সেই আয় ও গ্রামবাসিগণ যাহা কিছু চাউল আটা ইত্যাদি দেয় তদ্দারা কোন প্রকারে তাঁহাদের চারিটি পূজারি-পরিবারের সেবা কার্য্যাদি হয়। এখানে কোন রাওল নাই, পূজারি মহারাজ-গণই সর্ব্বেসর্ব্বা, মন্দিরের যে প্রকার জীর্ণ অবস্থা হইয়াছে,

শীঘ্রই সংস্কার হওয়া আবশ্যক। এস্থলে কালীকম্বলী বাবার দ্বিতল ধর্ম্মশালা ও সাধু অভ্যাগতের জন্য সদাব্রত ও ৭।৮ খানি দ্বিতল ঘর, সর্ব্ব প্রকার খাদ্যদ্রব্যের দোকান আছে। কোন প্রকার জল খাবার পাওয়া যায় না, কিন্তু দুগ্ধ পাওয়া যায়, জলের বন্দোবস্তাদি ভাল। মধ্যাহ্নকৃত্যাদি সমাপনান্তে দর্শন ও আহারাদি করা হয়, মধ্যাহ্নকালে খুব এক পসলা বৃষ্টি হয়। সন্ধ্যার সময় আরতি দর্শন করিতে যাই, রাত্রীতে আহারের বন্দোবস্তাদি করা হয়। যত রাত্রি হইতে লাগিল মাথার অসুখ ততই বেশী বোধ করিতে লাগিলাম, সঙ্গীয় পরিব্রাজক মহারাজ ও পরিব্রাজিকা মাতাজী অনেকক্ষণ শুশ্রূষা করেন,তাহাতে কথঞ্চিৎ শান্তি অনুভব করিতে লাগিলাম, রাত্রি শেষে সাধারণ নিদ্রা হয়। তাঁহাদের অকৃত্রিম ভালবাসা, স্নেহ ও আদর এ জীবনে ভুলিতে পারিব না।

বশিষ্ঠাশ্রম।

এই স্থান হইতে কিছু দূরে পর্ব্বত-গুহামধ্যে ভগবান মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের আশ্রম। যাঁহারা উক্ত স্থান দেখিতে চাহেন তাঁহাদিগকে স্থানীয় লোক সঙ্গে করিয়া যাইতে হয়।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার প্রাতে জলযোগের পর বালগঙ্গার তীরবর্ত্তী পথে চলিতে আরম্ভ করি, পথটি সাধারণতঃ অপরিষ্কার কিন্তু কোন বিশেষ চড়াই উথরাই নাই, বেলা ১০টার সময়

ঝালাচটী।

ঝালা চটিতে যাইয়া পৌঁছি। এখানে দুইখানি ঘর, সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের দোকান ও পরিষ্কার জলের ঝরণা আছে, এখানে দুধ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া

যায়। মধ্যাহ্নকৃত্যাদি সমাপনান্তে পরমানন্দে পায়সান্ন খাওয়া হয়, দুই প্রহরের পর হইতে বৃষ্টি হইতে থাকে, এখানে রাত্রিতে আহারাদির বন্দোবস্তাদি করিয়া রাত্রিযাপন করা হয়। হৃষীকেশস্থ কয়েক জন উদাসী সাধু মহাত্মার সঙ্গে দেখা হয়। এই চটির, দুই পার্শ্বে বালগঙ্গার উপর যে পুল আছে তাহা পার হওয়ার জন্য পয়সা দিতে হয়।

২০শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার প্রাতে জলযোগের পর একটি চড়াই পথে উঠিতে আরম্ভ করি, প্রায় ২ মাইল উঠিবার পর কয়েকজন সাধু সন্ন্যাসী ও একদল যাত্রীর সঙ্গে দেখা হয়, উক্ত সময়ে পশ্চিম পার্শ্বস্থিত পর্ব্বত-শিখরদেশ হইতে একটি হরিণ দীর্ঘ রবে নিনাদ করিতে করিতে আনন্দের সহিত এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেছিল। তাহার সেই আনন্দ দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যে সে যেন পূতঃসলিলা গঙ্গাস্নাত, শ্রী৺কেদারনাথ ও শ্রী৺বদরিনারায়ণ-দর্শনাভিলাষে উৎকণ্ঠিত পবিত্রচিত্ত যাত্রিগণ ও সাধু মহাত্মাগণকে দর্শন করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া এদিক ওদিক ছুটিয়া ছুটিয়া নৃত্য করিতেছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত যাত্রিগণ তাহার দৃষ্টিপথের বহির্ভূত না হইল ততক্ষণ পর্য্যন্ত উক্তরূপে নৃত্য করিতে লাগিল। বেলা দশটার সময় চড়াই ও উথরাইতে প্রায় পাঁচ মাইল অতিক্রম করিয়া পাঙ্গরাণা চটিতে উপস্থিত হই। এখানে শ্রীমৎ স্বজনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের একটি ধর্ম্মশালা ও ২টি সাধারণ খাদ্য দ্রব্যাদির দোকান আছে। এস্থানেও ভাল

পাঙ্গরাণা চটী।

দুগ্ধ পাওয়া যায়, জলের ঝরণা প্রায় ১০০ হাত দূরে। এখানে মধ্যাহ্নকৃত্যাদি সমাপনান্তে আহার ও বিশ্রাম করা হয়। দুই প্রহরের পর বৃষ্টি হইতে থাকে ও ঠাণ্ডা অনুভূত হয়। রাত্রিতে আহারের বন্দোবস্তাদি করা হয়, এখানে এত বেশী লোক জমিয়াছিল যে, অনেককে বসিয়া রাত্রিযাপন করিতে হইয়াছিল।

২১শে শনিবার প্রাতে জলযোগের পর কিছু সাধারণ পথ অতিক্রম করিয়া একটি চড়াইতে উঠিতে আরম্ভ করি। বেলা প্রায় ৯টার পর ৫ মাইল দূরবর্ত্তী পর্ব্বতোপরি বেলক চটিতে উপনীত হই। এখানে একটি ধর্ম্মশালা ও ২ খানা দোকানে সাধারণ খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায়।

বেলক চটী।

এখানে দুগ্ধ ও ঘৃত সস্তা; তবে স্থানটি বড় অপরিষ্কার। এখানে একবার জলযোগ ও দুগ্ধ পান করা হয়। সাধারণ বিশ্রামান্তে উৎরাই করিতে আরম্ভ করি। বেলা ১টার সময় চারি মাইল উৎরাইতে ছুনা চটিতে যাইয়া উপনীত হই। এখানে শ্রীমৎ রাজারাম

ছুনা চটী

ব্রহ্মচারী মহাশয়ের ধর্ম্মশালা ও পীলিভিতবাসী শেঠ জগন্নাথ প্রসাদের প্রদত্ত সাধু ও অভ্যাগতের জন্য সদাব্রতের বন্দোবস্ত, একটি সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের দোকান ও পরিষ্কার জলের ঝরণা আছে। ধর্ম্মশালার ম্যানেজার মহাশয় আজ আমাদের আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। মধ্যাহ্নকৃত্যাদি সমাপনান্তে আহারাদি ও বিশ্রাম করা হয়। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতে শ্রীমতী পরিব্রাজিকা মাতাজী অত্যন্ত অসুস্থতা বোধ করিতে

থাকেন, অনেকক্ষণ শুশ্রূষার পরে তিনি সুস্থতা লাভ করেন, রাত্রিতে আহারাদি সমাপনান্তে রাত্রিবাস করা হয়। ২২শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার প্রাতে বরাবর উথরাই পথে চলিতে আরম্ভ করি, প্রায় দুই মাইল চলিয়া যাওয়ার পর গঙ্গার দর্শন লাভ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিতে থাকি। এই পথে একস্থানে পথ ভুলিয়া গিয়া ১৫।১৬ মিনিট অন্য পথে চলিতে আরম্ভ করি। একজন গ্রামবাসী আমাদিগকে পথ চিনাইয়া দিয়া অত্যন্ত উপকার করে। প্রায় পাঁচ মাইলের উপর পথ চলার পর একটি ক্ষুদ্র অথচ প্রবল বেগবতী ঝরণা পাওয়া যায়। উক্ত স্থানে আবার জলযোগ করিয়া পুলের অভাবে অতি সতর্কতা সহকারে ও কষ্টে উক্ত নদী পার হইয়া চলিতে আরম্ভ করি। পথের পার্শ্বে বেশ সমৃদ্ধি-শালী একটি গ্রাম আছে কিন্তু পথটি অত্যন্ত জঙ্গাল ও কণ্টকময়। এস্থানে আসিয়া একদমে গঙ্গার ধারে আসিয়া পৌঁছি ও দক্ষিণ তীরস্থ পথে চলিতে চলিতে আবার একটি অতি বেগবতী ছোট নদীর উপর কাঠের পুল ও গঙ্গার উপর কাঠের ঝুলা পার হইয়া শ্রী৺গঙ্গোত্তরীগামী রাস্তা প্রাপ্ত হই। এই পথ বেশ পরিষ্কার। লছমন ঝুলার পর হইতে যে রাস্তা বাহির হইয়াছে এই রাস্তাও তদনুরূপ। যাঁহারা দেরাদুন বা দেবপ্রয়াগ দিয়া গঙ্গোত্তরীতে আসেন তাঁহাদিগকে শ্রী৺কেদারনাথ শ্রী৺বদরি-নাথ দর্শনে যাইতে হইলে এইস্থানে গঙ্গোত্তরীতে স্নান ও দর্শনাদি করিয়া গঙ্গার উপরিস্থিত কাঠের ঝুলা অতিক্রম করিয়া বরাবর চলিয়া যাইতে হয়। এ স্থান হইতে প্রায় এক মাইলের

অধিক স্থান চলিয়া যাইয়া বেলা ২টার সময় ভাটোয়ারি * বা ভাস্করপ্রয়াগে উপস্থিত হই। ভাস্কর-

ভাটোয়ারী।

প্রয়াগ, ভাস্করগঙ্গা ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এখানে জগদ্‌গুরু শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য স্বামিপ্রতিষ্ঠিত শ্রী৺ভাস্করেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। পর্ব্বতোপরিস্থিত ভাটোয়ারি গ্রামটি বেশ সমৃদ্ধিশালী ও বহু লোক পরিপূর্ণ। এখানে কালীকম্বলী বাবার দ্বিতল ধর্ম্মশালা বাটী, শ্রীশ্রীমৎ ইন্দোরাধিপতির প্রদত্ত সাধু ও অভ্যাগতের জন্য সদাব্রতের বন্দোবস্ত, টিহরি মহারাজের ডাকবাঙ্গালা ও সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যাদি সহ একটি দোকান আছে। দোকানদার অতি ভাল লোক, বিশেষ দক্ষতার সহিত সমাগত যাত্রিদিগকে সর্ব্বপ্রকার জিনিষাদি সরবরাহ করিয়া থাকে। এখানে কাণ্ডী ও ঝাঁপান-বাহী কুলীদের নিকট হইতে এক প্রকার কর আদায় করা হয়। এখানে কালীকম্বলী বাবার ধর্ম্মশালা-গৃহে বাসস্থান নির্দ্দেশ করা হয় ও আহারাদির বন্দোবস্তাদি করিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া যায়। ঠিক সন্ধ্যার সময় আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিতে থাকি, ইতিমধ্যে এক নূতন ধরণের বিপদ আসিয়া জুটিল, গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরীধামের শ্রীশ্রীটিহরি মহারাজপক্ষীয় হিসাব-পরীক্ষক মহাশয়ের কুদৃষ্টি আমাদের উপর পতিত হইল। তিনি যৌবন-সুলভ চপলতা প্রযুক্ত আমাদিগকে ব্যঙ্গভাবে নানা-বিধ কুৎসিৎ প্রশ্নাদি করিতে লাগিলেন ও আমাদিগকে নানাবিধ

---

* ভাটোয়ারী হইতে শৌনক প্রয়াগ পর্য্যন্ত চটীর তালিকায় দ্রষ্টব্য।

উৎপাতে ফেলিবার চেষ্টা করিলেন। ক্রমশঃ বিশেষ ভাবে তাঁহার স্বভাবের পরিচয় পাইয়া শ্রীশ্রী৺গুরুচরণ স্মরণ করতঃ তাঁহাকে যথোচিত বাক্যালাপের দ্বারা বিশেষ শিক্ষা প্রদান করা হইল। এই চটীতে কম্বলের ও নাগরাই পাদুকা পাওয়া যায়। আমার ব্যবহারের জন্য এক জোড়া কম্বলের পাদুকা লওয়া হয়। সাধারণ শরীরের অসুস্থতা প্রযুক্ত এখানে ২৩শে জ্যৈষ্ঠ অতিবাহিত করা হয়।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার জলযোগের পর বরাবর সোজা পথে ও সাধারণ চড়াই পথ অতিক্রম করিয়া উথরাইতে গঙ্গার উপর একটি কাঠের পুল অতিক্রম করিয়া ৪ মাইল দূরবর্ত্তী ভূখি চটিতে উপনীত হই। এখানে সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের একটী দোকান ও দুখানি ঘর আছে। এ স্থানে সাধারণ বিশ্রামান্তে উচ্চ ও নিম্ন পথে গঙ্গার পার দিয়া আর একটী কাঠের পুল অতিক্রম করিয়া বেলা ১১টার সময় গঙ্গাননী নামক স্থানে উপস্থিত হই। এখানে শ্রীযুত বাজারাম ব্রহ্মচারী-প্রতিষ্ঠিত এক প্রকাণ্ড দ্বিতল ধর্ম্মশালা বাড়ী ও একটী রান্না ঘর, সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের দোকান ও পরিস্কার জলের ঝরণা ইত্যাদি আছে। এখানে পিলিভিতবাসী শ্রীযুত রাজা ললিতা প্রসাদের পক্ষ হইতে সাধু ও অভ্যাগতগণকে সদাব্রত দেওয়া হয়। অধ্যক্ষ শ্রীযুত প্যারিলাল ব্রহ্মচারী মহাশয় অদ্য আমাদের আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এ স্থানটী বেশ পরিস্কার।

ভূখি চটী।

গঙ্গাননী।

এখানে মধ্যাহ্নকৃত্যাদি সমাপনান্তে আহারাদি ও বিশ্রাম করা হয়, অপরাহ্ণে কয়েকজন সাধু ও বৈরাগীর সহিত দেখা হয়। রাত্রি-তেও আহারের ব্যবস্থা করা হয়। এইখান হইতে কিছু দক্ষিণ প্রান্তে একটী পুল অতিক্রম করিয়া পর্ব্বত গাত্রে শ্রীমৎ মহর্ষি পরাশরদেবের আশ্রম, তথায় মন্দির মধ্যে ঋষিবরের মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। মন্দিরের তলদেশ হইতে একটী গরম জলের ঝরণা বাহির হইয়া যে কুণ্ডে পতিত হইয়াছে তাহার নাম ঋষিকুণ্ড। কুণ্ডের জল ঈষৎ কষায় স্বাদবিশিষ্ট। যাত্রিগণ পরমানন্দে এখানে স্নানাদি করেন। পার্শ্বে একটী ধর্ম্মশালা গৃহ আছে তথায় একজন বাঙ্গালী রামানন্দী সম্প্রদায়ের সাধু বাস করেন। সময়াভাব প্রযুক্ত আমাদের এই স্থান দেখা হইল না, ফিরিবার পথে দেখিয়া যাইব এই প্রস্তাবান্তে ২৫শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার প্রাতে জলযোগের পর সাধারণ পথে চলিতে আরম্ভ করি। পথিমধ্যে দুইটী কবির ঝুলা বা পুল অতিক্রম করিয়া বেলা ৯টার সময় লোহারিনাগ চটিতে উপনীত হই। এখানে শ্রীমৎ স্বজনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজপ্রতিষ্ঠিত একটী ধর্ম্মশালা, সাধারণ খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রাদির দোকান আছে। এখানে আসিবার পর অতি বেগে একবার দাস্ত হয়। তাহাতে শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করিতে থাকি। সঙ্গীয় সাধু মহাত্মাদের সাহসের উপর নির্ভর করিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করি। প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম করিবার পর শরীর

পরাশর আশ্রম ও ঋষিকুণ্ড।

লোহারিনাগ।

অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে। শ্রীশ্রীমৎগুরুচরণে আত্মসমর্পণ করিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করি, এখানে একটী চড়াই আরম্ভ হয়, অতি কষ্টে শরীরটী বহন করিয়া ও স্থানে স্থানে বিশ্রাম করিয়া সাড়ে চারি মাইল দূরবর্ত্তী সুখীঝালা নামক স্থানে উপনীত হই। উক্ত স্থানে পৌঁছিবার পর আবার অতি বেগে কয়েক বার দাস্ত হয় ও অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ি। বেলা ৪টার পর হইতে বিশেষ শীত অনুভব করিতে থাকি। তাহাতে জ্বরের প্রাদুর্ভাব বুঝিয়া একটী ধর্ম্মশালা ঘরে শুইয়া পড়ি। এস্থানে টিহরি মহারাজের একটী ধর্ম্মশালা ও সাধারণ খাদ্য দ্রব্যের দোকান আছে, দোকানে ভাল চাউল বা ঘৃত ইত্যাদি পাওয়া যায় না। সুখীঝালা গ্রামটি অতি সুন্দর ও বহু জনপূর্ণ এবং বহু শস্যশালিনী। এখানকার গৃহগুলি কাঠের দেওয়াল ও ছাউনি বিশিষ্ট। এখানে সঙ্গীয় সাধু মহারাজেরা আহারাদি করিয়া আমার সেবা শুশ্রূষার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বৈকাল বেলায় এখানে একটী মিছিল দেখা গেল, স্থানীয় লোকদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে উক্ত স্থানে অনেক দিন যাবৎ বৃষ্টি হইতেছে না তাই অদ্য তাঁহারা তাঁহাদের গ্রামস্থ দেবতা শ্রীশ্রী৺-রঘুনাথ জিউকে কৈলাসে লইয়া যাইতেছেন; তিনি তথায় যাইয়া বৃষ্টি করাইবেন। সন্ধ্যার সময় অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ করি, সঙ্গীয় সাধু মহারাজেরা লঘু পথ্যের বন্দোবস্ত করেন; তারপর বিশ্রাম করিতেছি এমন সময় রঙ্গপুর আস্তানের মোহান্ত যোগীপ্রবর

সুখীঝালা।

শ্রীমৎ স্বামী পুরণগিরিজিউ মহারাজের শিষ্য শ্রীমৎ নারায়ণ গিরি জিউর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি গঙ্গোত্তরী হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন. তাঁহার সহিত শ্রী৺প্রয়াগরাজে বা এলাহাবাদে পরিচয় হয়, তিনিও পরমানন্দে আমাদের কাছে ভিক্ষা করেন ও আমার কিছুক্ষণ শুশ্রূষা করেন ও উপদেশাদি দেন। অনেকক্ষণ ব্যাপী আনন্দের দ্বারা শরীরের দুর্ব্বলতার লাঘব বোধ করিতে লাগিলাম। রাত্রিতে বেশ নিদ্রা হয়।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার প্রাতে জলযোগের পর উথরাই পথে চলিতে আরম্ভ করি, এক মাইলের অধিক চলিয়া গিয়া শ্রীমৎ ভারতি স্বামীজিউ মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তিনি গঙ্গোত্তরী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার পর্য্যটনকালীন এলাহাবাদের ঝুশীতে অবস্থিতির সময় তাঁহার সৎসঙ্গ হইয়াছিল, কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর যথোচিত সাদর সম্ভাষনান্তে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া একটী উপত্যকা ভূমিতে উপনীত হই। ইহার দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া মহান্ গম্ভীর নিনাদে গঙ্গা প্রবাহিতা হইয়া যাইতেছেন ও উত্তর পার্শ্বস্থ পর্ব্বত শিখরে অনেকগুলি চির ও দীপতরু বৃক্ষ শোভমান আছে, তথা হইতে এক অপূর্ব্ব আনন্দধ্বনি শ্রুত হইতেছিল, উক্ত স্থান দিয়া অতি মৃদুমন্দ গমনে চলিতে চলিতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ শব্দ শুনিতে শুনিতে হরশিলা নামক স্থানে উপনীত হই। এইস্থানে টিহরি মহারাজের একটী কাছারি বাড়ী আছে, একজন কাঠের কণ্ট্রাক্টারের দোকানে সর্ব্বপ্রকার খাদ্যদ্রব্য ও

হরশিলা।

বস্ত্র ইত্যাদি পাওয়া যায়। এখানে একজন সাহেব নানাবিধ পাখীর ডিম সংগ্রহ করিতেছেন। এস্থান হইতে একটী ছোট পুল পার হইয়া প্রায় ২০০ হাত দূরে যেখানে গঙ্গার উপর একটী কাঠের পুল আছে তাহার গোড়ায় একটী শিবালয়, এক-খানা দ্বিতল ঘর, সর্ব্বপ্রকার খাদ্য দ্রব্যের দোকান আছে। সাধারণতঃ যাত্রিগণ এস্থানে অবস্থান করিয়া থাকেন। এস্থানে সাধারণ বিশ্রামান্তে বরাবর সোজা পথে গঙ্গার পুল পার হইয়া দুই মাইল দূরবর্ত্তী ধরালি নামক স্থানে উপনীত হই। ধরালি

ধরালি।

গ্রামটী বেশ শ্রীসম্পন্ন ও শস্যশালিনী। এখানে যথেষ্ট গোল আলুর চাষ হয়। স্থানীয় লোকজনও বেশ শান্ত ও ধর্ম্মপ্রাণ। এখানে জয়পুরের মহা-রাণীর প্রতিষ্ঠিত কাঠের নির্ম্মিত একটী ত্রিতল অতি বৃহৎ ধর্ম্মশালা-বাড়ী ও টিহরি রাজের দ্বিতল ছোট একটী ধর্ম্মশালা আছে। জয়-পুরের ধর্ম্মশালা হইতে সাধু মহাত্মাগণকে তৈয়ারি আহার্য্য দেওয়া হয়। যাঁহারা কাঁচা "সিধা" লইতে চাহেন তাঁহারা তদনুরূপ পাইয়া থাকেন। ম্যানেজার শ্রীযুত পণ্ডিত প্যারেলাল মহাশয় বড় সজ্জন ও বিশেষ দক্ষতার সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। এখানে শ্রীযুত শিব সিং নামীয় একজন স্থানীয় পাহাড়ী জমিদারও সমাগত সাধু মহাত্মাদের সদাব্রত দিয়া থাকেন। একটীমাত্র দোকান আছে, তাহাতে সর্ব্বপ্রকার খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়। গঙ্গাতে পাকা বাঁধান ঘাট আছে, ঘাটের উপর দুইটী শিবালয় আছে, কিন্তু শিবঠাকুর জলের মধ্যে ডুবিয়া আছেন।

প্রথমতঃ দেখিলে বোধ হয় যেন ২টা জলের কুম্ভ। এখানে টিহরিরাজের ধর্ম্মশালাতে বাসস্থান নির্দ্দেশ করা হয়। বেলা ১০ টার সময় মাথা ঘুরিয়া ঘাটের উপর পড়িয়া যাই তাহাতে পায়ে সাধারণ চোট্ লাগে। মধ্যাহ্নকৃত্যাদি সমাপনান্তে আহারাদি ও বিশ্রাম করা হয়। সন্ধ্যার সময় স্থানীয় বালকগণের গঙ্গা ও শিবের আরতি এবং স্তোত্রপাঠ অত্যন্ত মধুর লাগিয়াছিল।

মুখুবা। গঙ্গার অপর পারেই মুখুবা মঠ বা মুখুবাগ্রাম, উক্ত স্থানে গঙ্গোত্তরীর পাণ্ডামহারাজগণের বাসস্থান, তাঁহাদের প্রায় দ্বিতল ও ত্রিতল ৪০।৫০ খানা বাড়ী আছে।

মার্কণ্ডেয়াশ্রম। এস্থান হইতে এক মাইল পূর্ব্বে শ্রীমন্মহর্ষি মার্কণ্ডদেবের আশ্রম অবস্থিত, তথায় শীতের ছয়মাস শ্রীগঙ্গাদেবীর পূজা হইয়া থাকে, এ সকল স্থানেও শীতের সময় বরফ জমিয়া যায়, কিন্তু দিনের বেলায় রৌদ্রে আবার খানিক গলিয়াও যায়। রাত্রিতে বেশ ঠাণ্ডা অনুভূত হয়, এখানে আহারাদির বন্দোবস্ত ও রাত্রি যাপন করা হয়। একজন রামানন্দী সাধু এখানে অনেকদিন যাবত বাস করিতেছেন, তিনি বেশ সজ্জন ও গঙ্গোত্তরী-গমনশীল যাত্রিগণকে পাইয়া পরমানন্দে আলাপাদি করিয়া থাকেন।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার প্রাতে জলযোগের পর সাধারণ পথে চলিতে চলিতে গঙ্গার উপর একটী কাঠের পুল অতিক্রম করিয়া তিন মাইল দূরবর্ত্তী জঙ্গল চটীতে যাইয়া পৌঁছি। এখানে টিহরি মহারাজের একটী ডাক বাঙ্গলা ও সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের

একটী দোকান আছে। সাধারণ বিশ্রামান্তে সহজ চড়াই পথে চলিতে আরম্ভ করিয়া চারি মাইল দূরবর্ত্তী ভৈরব ঝুলার নিকটে যাইয়া পৌঁছি। হৃষীকেশ ধামে অবস্থিতির সময় এই ঝুলার সম্বন্ধে কত কথাই না শুনা হইয়াছিল, এখন চক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটিল। তথায় সাধু মহাত্মারা অতি রঞ্জিত করিয়া কত গল্পই করিয়াছিলেন; কেহ বলিয়াছিলেন যে ঝুলাটী দুইটী পাহাড়ের মাথার উপর অবস্থিত, অতি কষ্টে বসিয়া বসিয়া পার হইতে হয়, কত লোক পড়িয়া যায়, হাওয়া চলিতে আরম্ভ করিলে আর অতিক্রম করা যায় না ইত্যাদি। এই সমস্ত কথা শুনিয়া অনেক যাত্রী গঙ্গোত্তরীতে আদৌ আসিতে সাহস করেন না। সর্ব্বসাধারণের অবগতি ও ভীতি অপনোদনের জন্য এই ঝুলার বিশেষ বিবরণ লিখিত হইতেছে,—এই পুল বা ঝুলাটী যেস্থানে জাহ্নবী গঙ্গার উপরে দেওয়া হইয়াছে সেই স্থানটী জল হইতে উচ্চ ১০০ হাতের বেশী হইবে না, জাহ্নবী গঙ্গা অতি বেগবতী তাই নদীগর্ভে কোন রকমের থাম ইত্যাদি পোঁতা নাই। নদীর দুই পারে পাকা দেওয়াল গাঁথিয়া এক দিকে দুই গাছি করিয়া লোহার মোটা চেইন আঁটা হইয়াছে, সেই শিকলের মধ্যে মধ্যে আবার ছোট ছোট চেইন ঝুলাইয়া তাহাতে ছোট ছোট কাঠের কড়ি বসান আছে, তাহার উপর আবার এক প্রস্ত আড়ে কড়ি বসাইয়া তক্তা দিয়া ছাইয়া দেওয়া হইয়াছে; যখন অতি প্রবল বেগে হাওয়া চলে তখনও ধীরে ধীরে ধরিয়া আপন পায়ের দিকে

জঙ্গল চটী।

ভৈরব ঝুলা।

তাকাইয়া পার হওয়া যায়, দুই পার্শ্বে বেশ রেলিং দেওয়া আছে, তাহাতে পড়িয়া যাওয়ার কোন ভয় নাই। যাঁহারা একবার লছমন ঝুলা দেখিয়াছেন তাঁহাদিগকে বিশেষ বুঝাইতে হইবে না। লছমন ঝুলা পাঁচ গাছি করিয়া ১০ গাছি চেইনের উপর বোল্‌ট দ্বারা আঁটা ও চওড়া প্রায় ছয় ফুট ; কিন্তু ভৈরব ঝুলা চওড়া ৪ ফুট ও লম্বে লছমন ঝুলা হইতে ২৫।৩০ ফুটের বেশী হইবে না। এই ঝুলা অতিক্রম করিবার সময় নদীর স্রোতের দিকে তাকাইলে মাথা ঘুরিয়া উঠে, কারণ জলটী অতি বেগে বহিয়া যাওয়ার জন্য চোখ ঝলসাইয়া তোলে, এ যাবত উক্ত ঝুলা হইতে কোন লোক পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই। তবে যাহারা অতি রঞ্জিত গল্প করিতে বাহাদুর, তাহাদের কথা বাদ দিতে হইবে, সঙ্গীয় মহারাজ ও পরিব্রাজিকা মাতাজীসহ অনায়াসে আমি এই পুল পার হইয়া যাই। এই ঝুলার অনতিদূরে একটি পথ পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া জাহ্নবী গঙ্গার পার্শ্ব দিয়া নীলাং মঠ পর্য্যন্ত গিয়াছে।

নীলাং মঠ।

উক্ত মঠ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী জাঠজাতীয় তিব্বতবাসীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ; তাহাদিগকে পাহাড়ী লোকেরা ভূটিয়া বলিয়া থাকে। ঐ খানে আরও তিন চারিটি মঠ আছে, কিন্তু স্থানটি ভারতবর্ষের সীমান্ত প্রদেশে তিব্বতের অন্তর্গত ও বৎসরে প্রায় ৬।৭ মাস বরফে আবৃত থাকে। উক্ত সময়ে স্থানীয় অধিবাসীরা উত্তরকাশী প্রভৃতি স্থানে আসিয়া বাস করে, আবার গ্রীষ্ম ঋতুর আগমনে তথায় চলিয়া যায়। তাহারা অত্যন্ত কর্ম্মঠ ও আমোদপ্রিয়

জাতি, কিন্তু সর্ব্ব সাধারণে একটি না একটি নেশা করিয়া থাকে। তাহাদের কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই অত্যন্ত সুশ্রী। যাঁহারা গ্ল্যাসিয়ার বা জমাট বরফ দেখিতে চান তাঁহারা উক্ত স্থানে গেলে আপন চক্ষুর তৃপ্তিসাধন করিতে পারেন। আমরা বরাবর ভৈরব ঝুলা অতিক্রম করিয়া ভৈরব ঘাট চটীতে উপনীত হই। এই চটীতে আসিবার জন্য আরও একটি রাস্তা আছে সেইটী ভৈরব ঝুলার প্রায় আধ মাইল সম্মুখে। এই পথের নিম্নদেশ দিয়া জাহ্নবী গঙ্গার সহিত যেখানে গঙ্গার মিলন হইয়াছে তথায় সাধারণ একটি কাঠের পুল দেওয়া হইয়াছে তাহাও অতিক্রম করিয়া এই চটীতে আসা যায়। এই চটীতে একখানি দ্বিতল ধর্ম্মশালা আর তিনখানি ঘর, সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের দোকান ও শ্রী৺ভৈরব নাথের মন্দির এবং পার্শ্বে পরিষ্কার জলের একটী ঝরণা আছে। এখানে চটীওয়ালারা কাঠ বিক্রয় করে না, কারণ পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গলে যথেষ্ট কাষ্ঠ পাওয়া-যায়, যাত্রিগণ তথা হইতে সংগ্রহ করিয়া লয়। এখানে মধ্যাহ্ন-কৃত্যাদি সমাপনান্তে আহারাদি ও বিশ্রাম করা হয়; বৈকাল বেলায় কয়েকজন সাধু মহাত্মার সঙ্গে আলাপাদিতে সময় অতিবাহিত করা হয়, রাত্রিতে আহারের বন্দোবস্তাদি করিয়া পরমানন্দে রাত্রি যাপন করা হয়। ২৮শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার প্রাতে জলযোগের পর সাধারণ চড়াই পথে চলিতে আরম্ভ করি পথিমধ্যে অনেক স্থলে সমান পথে কোথায়ও বা সাধারণ উথরাই পাওয়া যায়। কেবলমাত্র গঙ্গোত্তরীর নিকট-

ভৈরব ঘাট।

বর্ত্তী এক মাইলেরও কম রাস্তাটী সাধারণ ভাবে মাঝে মাঝে ভাঙ্গা আছে।

আমরা বেলা দশ ঘটিকার সময়ে শ্রীশ্রীগঙ্গোত্তরী ধামে যাইয়া পৌঁছি। এই ধামটী গঙ্গার উত্তর পারে অবস্থিত।

শ্রীশ্রীগঙ্গোত্তরী।

এখানে তিনটী মন্দির আছে, দক্ষিণ পার্শ্বের মন্দিরে শ্রী৺মহাদেবের লিঙ্গ মূর্ত্তি, হরপার্ব্বতী, নন্দী, ভৃঙ্গী ইত্যাদি ও মধ্যের বা বড় মন্দিরে শ্রীশ্রী৺গঙ্গাদেবী, যমুনাদেবী, সরস্বতী দেবী, জাহ্নবী দেবী, মহারাজ ভগীরথ, জগদ্‌গুরু শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য স্বামিজিউ মহারাজের মূর্ত্তি এবং উত্তর পূর্ব্ব পার্শ্বস্থ মন্দিরে শ্রীশ্রী৺অন্নপূর্ণাদেবী বিরাজমানা আছেন। এই সমস্তই শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য স্বামীজির স্থাপিত কীর্ত্তিবিশেষ। শীতের সময় ছয় মাসের জন্য এখানকার মন্দিরেরও দরজা বন্ধ থাকে এবং মন্দির মধ্যে একটী প্রদীপ জ্বলিতে থাকে, যে দিবস মন্দিরের দ্বার প্রথম উদ্‌ঘাটিত হয়, সেই দিন সেই ছয় মাস পূর্ব্বের প্রজ্বলিত দীপজ্যোতিঃ দর্শন করিতে পাওয়া যায়। এই স্থানের দক্ষিণে ভগীরথশিলা নামক একখণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর আছে। কিম্বদন্তী আছে যে মহারাজ ভগীরথ আপন পিতৃকুল উদ্ধারের জন্য উক্ত শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া ষষ্ঠী সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, এবং সেই তপোবলে গঙ্গাদেবীকে ভূমিতলে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এখানে কোন রাওল নাই। পাণ্ডা মহারাজগণের মধ্যে পাঁচ জন প্রধান আছেন। তন্মধ্যে শ্রীযুত পণ্ডিত ব্রহ্মদত্ত মহারাজ অধ্যক্ষ বিশেষ। গঙ্গা-

দেবীর ভোগরাগাদির বিশেষ আড়ম্বর নাই কেবলমাত্র সোয়া-সের চাউলের ভোগ হইয়া থাকে। পাণ্ডা মহারাজগণ পর্য্যায়-ক্রমে পূজাপাঠাদি করিয়া থাকেন। এখানকার পাণ্ডা মহা-রাজগণ তত লোভী ও অসৎ নহেন, তবে কালের গুণে ও শিক্ষার অভাবে ক্রমশঃ দোষ প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিতেছে। যে কয়েকখানা ঘর আছে সমস্তই ধর্ম্মশালা ও কালীকম্বলী বাবার কীর্ত্তিবিশেষ। প্রায় সমস্ত ঘরের দেওয়ালে এরূপ লিখা আছে যে "বাবা কালী কম্বলীওয়ালে রামনাথ জিকা আজ্ঞাসে শ্রীঅমুকের দ্বারা এই ধর্ম্মশালা প্রস্তুত হইয়াছে", সমস্ত ঘরগুলি কাঠের বেড়া ছাউনি ও মেজে বিশিষ্ট। দ্বিতল ত্রিতল বাড়ীও আছে। এখানে সাধু অভ্যাগতের জন্য ২।৩ দিন কালীকম্বলী বাবার ছত্র হইতে তৈয়ারি বা কাঁচা যাহার যেমন অভিপ্রেত আহার্য্য দ্রব্যাদি দেওয়া হয়। অধ্যক্ষ শ্রীমৎ হংসদাস জিউ মহারাজ বেশ কার্য্যদক্ষ ও সজ্জন পুরুষ; তাঁহার সৌজন্য বিশেষ প্রশংসনীয়। এখানে একটী মাত্র সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের দোকান আছে, কোন প্রকার মিঠাই মিষ্টান্নাদির দোকান নাই। কাঠ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়, যাঁহারা গঙ্গাজল আনয়ন প্রত্যাশী তাঁহাদিগকে হরিদ্বার, হৃষীকেশ বা দেরাদুন, মসুরী ইত্যাদি স্থান হইতে পাত্র লইয়া যাইতে হয়; উত্তর কাশীধামে যদিও পাওয়া যায় মূল্য অনেক পরিমাণে বেশী দিতে হয়। এখানে স্থধু পাত্রের মুখ ঝালাই করিবার ব্যবস্থা আছে। এই স্থান হইতে কিছু পূর্ব্ব প্রান্তে গঙ্গার কিনারাতে ২টী যোগ গুহা আছে।

এখানে শীত অত্যন্ত বেশী রাত্রিতে ধূনী জ্বালিতে হয়। সকল ধর্ম্মশালা গৃহেই ধূনী জ্বালিবার বন্দোবস্ত আছে। এখানে মধ্যাহ্নকৃত্যাদি সমাপনান্তে দর্শনাদি করিয়া আহার বিশ্রাম করা হয়। বৈকাল বেলায় সমস্ত স্থানটী ঘুরিয়া দেখা হয় ও রাত্রিতে আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া পরম আনন্দ উপভোগে রাত্রি যাপন করা হয়। এই স্থান হইতে গোমুখী পর্ব্বত অর্থাৎ

গোমুখী

যে স্থান দিয়া গঙ্গাদেবী পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন সেই স্থানটী ১৮ মাইল দূর। ঐ খানে যাইতে হইলে বৈশাখ মাস অথবা আশ্বিন মাসের শেষ ভাগে সুবিধামত যাওয়া যায়, কারণ উক্ত সময়ে গঙ্গার উপর বরফ জমাট থাকে ও যাওয়া সহজসাধ্য, অন্য সময়ে যাইতে পারা যায় না—পাণ্ডা মহারাজগণের মুখে, এই প্রকার শুনা গেল। ঐস্থানে যাওয়ার সময় এখান হইতে আহার্য্য দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া পাণ্ডাগণের সহিত যাইতে হয়। তবে সাধু মহাত্মাদের ব্যবস্থা অন্য প্রকার। এই স্থান হইতে নয় মাইল দূরবর্ত্তী চিরু-বাসা পর্য্যন্ত কাঠ পাওয়া যায়, তথা হইতে গোমুখী পর্য্যন্ত ধবল তুষারাবৃত পর্ব্বতমালা। ঐ স্থানে যাইয়া স্নান বা দর্শনাদি করিয়া আবার চিরু বাসাতে ফিরিয়া আসিতে হয়।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে দর্শনাদি করিয়া আহারের বন্দোবস্ত করা হয়। সাধারণ বিশ্রামান্তে বেলা ৩টার সময় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করি। সন্ধ্যার সময় ভৈরবঘাট চটীতে আসিয়া রাত্রিবাস ও আহারাদি করা

হয়। ৩০শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার প্রাতে জলযোগের পর চলিতে আরম্ভ করিয়া ধরালীতে পৌঁছিয়া জয়পুরের মহারাণা-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মশালায় বাসস্থান নির্দ্দেশ করি। এখানে উত্তরকাশীধামস্থ শ্রীমৎ মদনমোহন দাস ব্রহ্মচারী মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয় হয়। উক্ত ধামে তেকলানামক স্থানে তাঁহার একটী আশ্রম আছে। তিনি একজন বেশ সুবিদ্বান ও সজ্জন পুরুষ। অতি কষ্ট ও সহিষ্ণুতার সহিত সদাসর্ব্বদা নূতন তথ্য জানিবার জন্য ব্যস্ত। সম্প্রতি গোমুখী যাওয়ার ইচ্ছায় আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়াছেন। এখানে তাঁহার সহিত নানাবিধ সদালাপে ও আলোচনায় দুই দিন পরমানন্দে অতিবাহিত করা হয়। ১লা আষাঢ় বুধবার প্রাতে জলযোগের পর উক্ত ব্রহ্মচারী মহারাজের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক চলিতে আরম্ভ করি। প্রায় অর্দ্ধ মাইল চলিয়া আসিলে সঙ্গীয়া পরিব্রাজিকা মাতাজী পেটের বেদনায় অত্যন্ত কাতরা হইয়া পড়েন; তখন পথিপার্শ্বে ধূনী জ্বালিয়া কিছুক্ষণ সেঁক দেওয়া ও শুশ্রূষার পর সুস্থতালাভ করিলে, পুনরায় ধীরে ধীরে চলিয়া লোহারিনাগ চটীতে আসিয়া উপনীত হই। এখানে ধর্ম্মশালাতে অবস্থান পূর্ব্বক মধ্যাহ্নকৃত্যাদি সমাপন ও আহারাদি করা হয়; বিকাল বেলায় এক পশলা বৃষ্টি হয়। রাত্রিতে আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করা হয়।

২রা আষাঢ় বৃহস্পতিবার প্রাতে জলযোগের পর চলিতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গানানীতে পৌঁছিয়া ধর্ম্মশালায় বাসস্থান

নির্দ্দেশ করা হয়। তদনন্তর পর্ব্বতোপরি পরাশর আশ্রম-দর্শন ও ঋষিকুণ্ডে স্নানাদি করিয়া আসিয়া আহার করিতে বসি, তখন বেলা প্রায় ২টা বাজিয়া গিয়াছে। ধর্ম্মশালাতে আসিয়া দেখি যে সেখানে একটী মহা হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছে, দরজা খুলিয়া দেখা গেল দুই জন চাপরাশধারী ধর্ম্মশালার আশ্রিত যাত্রিগণকে সরিয়া যাইতে বলিতেছে, আর উপরের ঘরে যাহারা একএকটী কুঠুরিতে আশ্রয় লইয়াছিল তাহা-দিগকে শীঘ্র ঘর খালি করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছে। তাহাদের একজনকে ডাকিয়া পরিচয়ে জানিতে পারিলাম যে তাহারা টিহরি মহারাজের চাপরাশি, তাহারা বাঙ্গলাদেশ হইতে আগত একদল সাহেবের সহিত পথপ্রদর্শক ও সাহায্য-কারী হইয়া গোমুখী পর্ব্বত পর্য্যন্ত যাইবে এরূপ রাজাজ্ঞা তাহাদের উপর হইয়াছে। সেই সাহেব মহোদয়গণ ও তাঁহাদের সঙ্গীয় কুলীমজুর ও চাকরাদি অদ্য রাত্রিতে এই ধর্ম্মশালায় অব-স্থান করিবেন, তাই সময় থাকিতে যাত্রীগণকে সরাইয়া দেওয়া হইতেছে। আমাদিগকে আহারান্তে অন্যত্র যাইবার জন্য আদেশ হইল তখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিপাত হইতেছে। বিপদ মনে করিয়া শ্রীশ্রীগুরুপদ স্মরণ করিতেছি এমন সময়ে হঠাৎ মনে হইল যদি সাহেবই হইবে তাহা হইলে ধর্ম্মশালাতে থাকিবে কেন ? এমন সময়ে একটী সাহেব আসিয়া গেলেন। বেশ কায়দা করিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইয়া তাঁহাদের এস্থানে আগমন ও গোমুখী যাও-য়ার কারণ ইত্যাদি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ক্রমশঃ তাঁহা-

দের সকলের সঙ্গে পরিচয় হইয়া গেল। আত্মপরিচয় ইত্যাদি দেওয়া গেল এবং বহুদিন যাবৎ হিমালয় ভ্রমণ করিয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি তাহাও বলা হইল। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর আমরা যে কামরাতে আছি তাহা খালি করিতে হইবে কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি অতি ভদ্রতার সহিত বলিলেন, আপনাদের এই দুঃসময়ে কোথায়ও যাইতে হইবে না। ক্রমশঃ সাহেব মহোদয়েরা আসিয়া পৌঁছিলেন ও সকলের সহিত বেশ আলাপ পরিচয় হইল। তাঁহাদের সকলের পরিচয়ে জানিলাম যে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের জিওলোজিকাল ডিমনষ্ট্রেটার শ্রীযুত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্ এ মহাশয় গোমুখীতে গ্ল্যাসিয়ার, আইস্‌বার্গ ইত্যাদির উৎপত্তি স্থিতি ও লয় নির্দ্দেশ করিবার জন্য উক্ত কালেজের এম্ এস্ সি, ক্লাসের ছাত্র শ্রীমান নিত্যরঞ্জন সেনগুপ্ত বি, এস্ সি, ও শ্রীমান নবকুমার চৌধুরী বি, এস্ সি, আর শ্রীমন্মহারাজ যোধপুরাধিপতি-প্রেরিত শ্রীযুত শঙ্করলাল ব্যাস বিএ, শ্রীমন্মহারাজ কাশ্মীরাধিপতি-প্রেরিত শ্রীযুত লালা জ্যোতিপ্রসাদ, বিএ, শ্রীমন্মহারাজ ইন্দোরাধিপতি-প্রেরিত শ্রীযুত শঙ্কর রাও ঘাটপাণ্ডে ও শ্রীমৎ হায়দরাবাদাধিপতি-প্রেরিত শ্রীযুত আবদুলকরিম সাহেব বিএ, সহ চলিয়াছেন। ৪।৫ ঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া তাঁহাদের সহিত নানাবিধ আলাপে অতি আনন্দে অতিবাহিত হইল। তাঁহারা সকলেই বেশ সদালাপী, সজ্জন ও অধ্যবসায়শীল। সর্ব্বশেষে অধ্যাপক হেমবাবু আমাকে তাঁহাদের সহগামী হইতে

অনুরোধ করেন। আমি শারীরিক দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত যাইতে সাহস করিলাম না। তাঁহাদের উক্ত প্রকার পোষাক পরিচ্ছদ গ্রহণ করিবার কারণ এই যে তাঁহাদিগকে অনেক স্থলে অনেক দুর্গম স্থান দিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। এইরূপ গতিবিধির সুবিধার জন্যই তাঁহারা সাহেবি পোষাকাদি পরিয়াছিলেন, সকলে এক-বাক্যে একথা স্বীকার করিলেন। ৩রা আষাঢ় শুক্রবার প্রাতে তাঁহাদের সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া জলযোগের পর চলিতে আরম্ভ করি, পথিমধ্যে বৃষ্টি হওয়ার দরুণ একটু কষ্ট পাইতে হয়; বেলা ১০ টার পর ভাটোয়ারীতে আসিয়া স্নানা-হার ও রাত্রিতে বিশ্রামাদি করা হয়।

মানেরী।

৪ঠা আষাঢ় শনিবার প্রাতে জলযোগের পর বরাবর সোজাপথে চলিতে আরম্ভ করিয়া আট মাইল দূরবর্ত্তী মানেরী চটীতে উপনীত হই। এখানে শ্রীমৎ স্বজনানন্দ ব্রহ্মচারি মহারাজ প্রতিষ্ঠিত অতি বড় একটী ধর্ম্মশালা ও পার্শ্বে সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের দোকানাদি আছে। পশ্চিম পার্শ্বদিয়া গঙ্গা প্রবাহিতা, এখানে মধ্যাহ্নকৃত্যাদি সমাপ-নান্তে আহারাদি ও বিশ্রাম করা হয়, বৈকাল বেলা একদল নানকপন্থী নির্ম্মলা সাধুর সঙ্গে নানাবিষয়ক সদালাপে অতি-বাহিত করি। তাঁহারা বেশ সজ্জন ও আত্মক্রিয়াপরায়ণ। রাত্রিতে আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করা হয়। এই চটীতে জুতা বিক্রয় হয়। ৫ই আষাঢ় রবিবার প্রাতে জলযোগের পর চলিতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ পথে ৪ মাইল দূরবর্ত্তী

নেতালা চটীতে আসিয়া উপস্থিত হই, এখানে ১টী ঘর ও সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের দোকান আছে। এস্থানে দোকনদার সাধারণ বস্ত্রাদিও বিক্রয়ার্থ মজুত রাখিয়া থাকে। সাধারণ বিশ্রামান্তে আবার ধীরপদে চলিতে চলিতে যে স্থানে অসিগঙ্গা গঙ্গার সহিত মিলিতা হইয়াছেন তাহার উপরিস্থিত পুল অতিক্রম করিয়া শ্রীশ্রীউত্তর কাশীধামের সীমার মধ্যে পদার্পণ করি। ক্রমশঃ আধ মাইল পথ চলিয়া আসিয়া বায়ুগঙ্গার উপরিস্থিত ছোট একটী পুল অতিক্রমান্তে শ্রীমৎব্রহ্মচারী মদনমোহনদাস জিউ-প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হই। পর্ব্বত-মধ্যদেশে অবস্থিত আশ্রমটীর শোভা অতি সুন্দর। আশ্রমটী বেশ নির্জ্জন ও সাধন ভজনোপযোগী। পর্ব্বত গাত্রে দুইটী যোগ-গুহা এবং সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড ছপ্পর ঘরের দুইদিকে দুইটী কুঠরি আছে। ব্রহ্মচারীজি বায়ুগঙ্গা হইতে স্বব্যায়ে একটী জলের নহর কাটিয়া আপনার আশ্রমের ভিতরে লইয়া আসিয়াছেন। সম্মুখে স্তবকে স্তবকে বাগান করিবার উপযোগী একটি বিস্তৃত স্থান আছে। তিনি আশ্রমে সমাগত সাধু ও অভ্যাগতগণকে রীতিমত আহার্য্যাদি দানে পরিতুষ্ট করিয়া থাকেন। উত্তরকাশী টিহরিরাজ্যের একটী সবডিভিসন। এখানে একজন ডিপুটীকলেক্টর, ডাকবাঙ্গালা ডিভিসনাল অফিসার অব ফরেষ্ট, পুলিশচৌকি, দাতব্যঔষধালয় ও পোষ্ট-অফিস ইত্যাদি আছে। ইহার নাম উত্তরকাশী হওয়ার কারণ

নেতালাচটী।

৺উত্তর-কাশীধাম।

এই যে ইহা উত্তরাখণ্ডে স্থিত বলিয়া। ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অত্যন্ত মনোরম ও জলবায়ু সাধন ভজনোপযোগী। এখানেও কাশীধামের মত শ্রীশ্রী৺কাশীবিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা, কালভৈরব, গুরু দত্তাত্রেয়, পরশুরাম, দুর্গা, লক্ষেশ্বর মহাদেব, গণেশ প্রভৃতি বারাণসীধামস্থ যাবতীয় দেবদেবীমূর্ত্তি, কেদারঘাট, মণিকর্ণিকা-ঘাট, গোঘাট, ব্রহ্মকুণ্ড, রুদ্রকুণ্ড, জ্ঞানবাপীকুণ্ড, অসিসঙ্গম, বরুণাসঙ্গম প্রভৃতি আছে। রাজা ভরত এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন ও জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাই এখানে জড়ভরতের মন্দির আছে। শ্রী৺বিশ্বনাথের মন্দিরের সম্মুখে একটী বিশাল ত্রিশূল আছে। শোনা যায় যে এই শক্তি-ত্রিশূল দেবাসুরের যুদ্ধের সময় আদ্যাশক্তির হাত হইতে এখানে পতিত হইয়াছিল। শ্রীযুত রামপুরি নামক জনৈক গোসাঞি শ্রী৺বিশ্বনাথের পূজারি বা মোহান্ত। পূজাপাঠ বা ভোগরাগের বিশেষ জাঁকজমক নাই, সকলই পূজারীর ইচ্ছানুযায়ী। এখানে শ্রী৺পরশুরামদেবের সন্মান ও পূজার বন্দোবস্ত মন্দ নহে, কারণ তিনিই কাশীধামের রাজা আর শ্রী৺বিশ্বনাথ তাঁহার গুরু। প্রবাদ আছে যে শ্রীশ্রীপরশুরামদেব ক্ষত্রকুল ধ্বংস করিবার মানসে অস্ত্রশিক্ষার্থে এই স্থানে বসিয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, আর দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া এখানে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে অস্ত্রশিক্ষা দিয়াছিলেন, তদনন্তর তিনি স্বীয় গুরুদেবকে এই স্থানে স্থাপন করিয়া পরিচর্য্যাদি করিবার জন্য প্রার্থনা করিলে আশুতোষ শিব মরকত-

মণি সদৃশ লিঙ্গ মূর্ত্তিতে এখানে বিরাজমান হইলেন। শ্রীশ্রী-পরশুরামদেবের আর একটী বিশেষ সন্মান আছে, হিমালয়স্থ গ্রাম্যদেবতাগণকে মাঘ মাসে আসিয়া তাঁহার ভেট করিয়া যাইতে হয়, ভেট আয়মত ১০১৲ ৫১৲ ও ২১৲টাকা হারে দেও-য়ার নিয়ম আছে। আর ইহার নাম উত্তরকাশী হওয়ার আর একটী কারণ এই যে, মহর্ষি বেদব্যাস যখন নূতন কাশী রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন তখন আদ্যাশক্তি ভগবতীর মায়াবলে তাঁহার তপোভঙ্গ হয়, কাশী-পুরাধিরাজ ৺বিশ্বনাথ এই কথা জানিতে পারিয়া কাশীধামের উপর এই অভিশাপ দেন যে কলির আগমনে কাশীর মাহাত্ম্য থাকিবে না ও তথায় নানাবিধ ব্যাভিচার আরম্ভ হইবে। এই অনর্থ নিবারণার্থে কলির আগমনে মুনি-ঋষিগণ কৈলাশ পর্ব্বতে গমন করিয়া মহাদেবকে স্তবস্তুতিতে সন্তুষ্ট করেন এবং কলির আগমন ও সেই সময়ে জীবের মুক্তি কিরূপে হইবে জিজ্ঞাসা করিলে দেবাদিদেব তাঁহাদের তপস্যায় প্রীত হইয়া এই আদেশ করেন যে, তোমরা সকলে উত্তরাখণ্ডে যেখানে ভাগীরথী উত্তরবাহিণী হইয়া প্রবাহিতা হইতেছেন তথায় যাইয়া কাশী রচনা কর, আমিও কলির আগমনে ৺কাশীপুরা-ধিশ্বরী সহ তথায় বিরাজ করিয়া জীবের মুক্তি বিধান করিব। তদনুসারে মুনি-ঋষিগণ এখানে আসিয়া কাশী রচনা করেন। এখানে কেদারঘাটের পর হইতে গঙ্গা উত্তরবাহিণী। এইধামে সাধু সন্ন্যাসীর সংখ্যা তত বেশী নহে। যাঁহারা আছেন তন্মধ্যে

শ্রীমৎপরমহংস রামাশ্রম স্বামী, কেবলাশ্রম স্বামী, স্বামী বিমলানন্দ সরস্বতী, লাটস্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ তীর্থস্বামী, স্বামী সম্পদগিরিনাগা প্রভৃতি স্বনাম প্রসিদ্ধ ও স্ব স্ব আশ্রমে সাধনভজন রত। এখানে কালীকম্বলী বাবার প্রসিদ্ধ ধর্ম্মশালা, শ্রীমৎস্বজনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের ধর্ম্মশালা, ৪।৫ খানা সর্ব্বপ্রকার খাদ্য-দ্রব্য ও বস্ত্রাদির দোকান ইত্যাদি আছে। জয়পুরের শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বড়রাঠোরজির প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺অম্বাজি ও অম্বিকেশ্বরাদি একাদশ রুদ্রমূর্ত্তি ও তৎসংলগ্ন ধর্ম্মশালাদি আছে। এই মন্দিরে পূজাপাঠ ও ভোগরাগের এবং দেবতার বেশ পরি-বর্ত্তন ও শৃঙ্গারাদির বেশ জাঁকজমক আছে। বর্ত্তমান ম্যানেজার শ্রীযুত পণ্ডিত শীতিকণ্ঠ রাও দ্রাবড় মহাশয় বিশেষ দক্ষতার সহিত কার্য্যাদি পরিচালনা করিতেছেন, তিনি বেশ সজ্জন, সুবিদ্বান এবং সদালাপী। এখানে সাধুমহাত্মাদের আহারের জন্য ৬ মাস (বৈশাখ মাস হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত) কালীকম্বলী বাবার ও স্বজনানন্দ ব্রহ্মচারীর ছত্র হইতে বন্দোবস্ত আছে, আর শীতের ছয়মাস জয়পুরের শ্রীঅম্বাজিউর মন্দিরের ছত্র হইতে দেওয়া হইয়া থাকে ও যাত্রাকালীন অভ্যাগত সাধুমহাত্মাকেও আহার্য্য দান করা হয়। কিন্তু শেষোক্ত ছত্র হইতে বৈশাখমাস হইতে ছয়মাস সাধারণ ভাবে বালভোগের মত দেওয়া হয়। এখানে একটী সাধারণ মিষ্টদ্রব্যের দোকান আছে। এই-তীর্থে ১৬ ঘর পাণ্ডা আছেন তাঁহারা কার্য্যাদি করাইয়া থাকেন। বালকদের শিক্ষার জন্য একটী পাঠশালা আছে।

পণ্ডিত শ্রীযুত হরিদত্ত নোটিয়াল মহাশয় বেশ দক্ষতা সহকারে বালকগণকে প্রাতে বেদ ও সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং দ্বিপ্রহরে হিন্দিভাষা শিক্ষা দেন। পণ্ডিতজি বেশ সুচতুর। স্থানীয় হসপিটাল, এসিষ্ট্যাণ্ট ডাঃ মুনসীরাম জিউ, পোষ্টমাষ্টার লক্ষ্মীরাম, পাণ্ডা ঈশ্বরীদত্ত যোশী ও ফরেষ্ট অফিসার পণ্ডিত মহানন্দ জিউ বেশ সজ্জন ও সদালাপী। শ্রীমৎ গিরিবর ব্রহ্মচারী মহা রাজের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় আছে তিনিও বেশ সজ্জন, গরীব দুঃখীকে ঔষধ দান করেন।

এই ধামের উত্তর পার্শ্বেই বারণাবত পর্ব্বত অসি ও বরুণার মধ্যবর্ত্তীস্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত। পূর্ব্ব-কাশীধামের শ্রীবেণীমাধবের ধ্বজার মত এই পর্ব্বতের শিখরদেশে উঠিয়া নিম্নদেশে দৃষ্টি করিলে ধামের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হয়। স্থানীয় পাণ্ডাগণ এখানে জতুগৃহদাহ প্রভৃতির চিহ্ন যাত্রিগণকে দেখাইয়া থাকেন ও বলেন যে পাণ্ডবেরা এই বারণাবত পর্ব্বতেই ছিলেন ও জতুগৃহদাহ ব্যাপার এখানে সংঘটিত হইয়াছিল। এই পর্ব্বতশিখর হইতে আরও প্রায় এক মাইল উপরে শ্রী৺বিমলেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে; গ্রাম্য লোকেরাই পূজাপাঠ করিয়া থাকে। উক্তস্থান হইতে আরও দুই মাইল চড়াই করিয়া শ্রী৺বরুণেশ্বর মহাদেব দর্শন করিতে হয়, এই স্থানে আসিলে গঙ্গা ও যমুনার উপত্যকা ভূমি দেখা যায়। এই লিঙ্গমূর্ত্তি সম্বন্ধে প্রসিদ্ধি আছে যে যখন অনাবৃষ্টি হয় ও জলাভাবে সর্ব্ব-সাধারণ

বারণাবতপর্ব্বত।

বিমলেশ্বর।

অত্যন্ত কষ্ট পাইতে থাকে, তখন গ্রামবাসীরা সকলে একত্র হইয়া গরম ভাত দিয়া শ্রী৺বরুণেশ্বর শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি ঢাকিয়া ফেলে, যেই ভাত ঠাণ্ডা হইতে থাকিবে অমনি আকাশ মণ্ডলে মেঘ দেখা দেয় ও বৃষ্টি হইতে থাকে। পূর্ব্ব-কথিত স্থানগুলি দর্শন করিতে হইলে উত্তরকাশী ধাম হইতে পাণ্ডা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হয়। এখানে জ্ঞানবাপী নামকস্থানে নানকপন্থী সাধুদের একটী আস্তান ও তাহার কিছু পশ্চিমোত্তর দেশে কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসার জন্য একটী হাঁসপাতাল আছে, স্থানীয় ডিপুটী কালেক্টর ইহার অধ্যক্ষ ও হসপিটাল এ্যাসিষ্টাণ্ট চিকিৎসক। এখানে দেবদাসীর* প্রথা আছে। এই ধামে শ্রী৺বিশ্বনাথের মন্দিরের পার্শ্বে ও লক্ষে-শ্বরে দুইটী বৃহৎ চাঁপাফুলের গাছ এবং আখ্রোট, ডালিম, পিচ, আঞ্জীর, আলুবোখরা প্রভৃতি ফলের গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ, রজপুত-ক্ষেত্রী, গোসাঞি ও ডোম প্রভৃতি জাতির বাস আছে। কালীকম্বলী বাবার ছত্রে একটী লাইব্রেরী ও ঔষধালয় আছে। এখানে জয়পুরের ধর্ম্মশালাতে বাসস্থান নির্দ্দেশ করা হয় ও চারিদিন পরমানন্দে সকল স্থান দর্শন ও সাধুসঙ্গে অতিবাহিত করা হয়।

বরুণেশ্বর।

৮ই আষাঢ় বুধবার বৈকালে যমুনোত্তরী-দর্শনাভিলাষী হইয়া যাত্রা করি। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বরুণার সঙ্গমস্থিত বনেটীনামক

* কুষ্ঠাশ্রম ও দেবদাসী সম্বন্ধে পরিশিষ্টে উক্তনামীয় প্রবন্ধ দেখুন।

গ্রামের ধর্ম্মশালায় অবস্থান ও. রাত্রিতে আহারাদি করা হয়। ৯ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার প্রাতে জলযোগের পর পাহাড়ীদের পথ অনুসরণ করিয়া সাধারণ চড়াই পথে চলিতে আরম্ভ করি। বেলা ১২টার সময় উপরিকোট নামীয় গ্রামের পার্শ্বস্থিত ঝরণার ধারে স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া উক্ত গ্রামে শ্রী৺সোমেশ্বর দেবের মন্দিরসংলগ্ন ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করি। বেলা ৪টার সময় হইতে প্রবলবেগে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়া প্রায় অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঐ অবস্থায় থাকে, আমাদের আর বাহির হইবার উপায় রহিল না, এই ভাবেই রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। এই গ্রামে গ্রামবাসীদের নিকট সাধারণ আহার্য্য দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। ১০ই আষাঢ় শুক্রবার প্রাতে আহারের বন্দোবস্ত করা হয়। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে আহার করিয়া সাধারণ বিশ্রামের পর ডুণ্ডার চড়াই করিতে আরম্ভ করি।

উপরিকোট।

ক্রমশঃ চারিদিকে মেঘ হইতে লাগিল ও পর্ব্বতগাত্র ছাইয়া ফেলিল। এই পাহাড়ের নাম ডুণ্ডা। উক্ত পর্ব্বতমালার মধ্যবর্ত্তী স্থানে ডুণ্ডাতাল নামক একটী প্রকাণ্ড সরোবর আছে, পাহাড়ী লোক সঙ্গে লইয়া ঐস্থানে যাওয়া যায়। এই পর্ব্বতমালার উপরে কোন গ্রাম নাই, শীতের সময় বরফে ঢাকিয়া যায়। যত উপরে উঠিতে লাগিলাম তত বেশী ঠাণ্ডা অনুভূত হইতে লাগিল, আনুমানিক বেলা দুইটার সময় সূর্য্যদেব দেখা দিলেন আমাদেরও চড়াই

ডুণ্ডাতাল।

শেষ হইল। তদনন্তর উথরাই করিতে আরম্ভ করি; অনেক-ক্ষণ পর্য্যন্ত মেঘে ঢাকা ছিল বলিয়া দূরবর্ত্তী স্থানের দৃশ্যাদি কিছুই দেখা গেল না। পথিমধ্যে একবার জলযোগ করিয়া উথরাই করিতে আরম্ভ করি। আজ কয়েক বৎসর অতীত হইল শ্রীমৎ স্বজনানন্দব্রহ্মচারী মহাশয়ের প্রযত্নে উপরিকোট হইতে ধাঙ্গড়গ্রাম পর্য্যন্ত একটী রাস্তা তৈয়ার হইয়াছে।

ধাঙ্গড়গ্রাম। ক্রমশঃ চলিতে চলিতে সন্ধ্যা ৭টার সময় চড়াই ও উথরাইতে প্রায় ১৬ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ধাঙ্গড়গ্রামে আসিয়া উপনীত হই।

এই গ্রামেও দেবালয়সংলগ্ন একটী ধর্ম্মশালা আছে তথায় স্থান অকুলান হওয়ার দরুণ পার্শ্ববর্ত্তী এক পাহাড়ী জমিদারের ভাণ্ডার ঘরের বারান্দায় বাসস্থান নির্দ্দেশ করি। গ্রামটি যতদূর সম্ভব অপরিষ্কার ও জঞ্জালপরিপূর্ণ, এখানে সাধারণ খাদ্যদ্রব্যাদি পাওয়া যায়, জলের বন্দোবস্ত তত সুবিধা-জনক নহে। মশার উৎপাত অত্যন্ত বেশী অতি কষ্টে রাত্রিতে আহারাদি করা ও রাত্রি যাপন করা হয়। ১১ই আষাঢ় শনিবার প্রাতে গ্রামের দুর্গন্ধতার দরুণ আর থাকিতে না পারায় যথাসম্ভব শীঘ্র চলিতে আরম্ভ করি। প্রায় ১ মাইল উথরাইর পর ধরাসু হইতে যে রাস্তা যমুনোত্তরীতে গিয়াছে সেই রাস্তা পাইয়া পরমানন্দিত হই। উক্তপথে আর খানি-কটা অগ্রসর হইয়া হনুমান-গঙ্গা অতিক্রমান্তে জলযোগের বন্দোবস্ত করা হয়। পূর্ব্বদিনের চড়াই উথরাইতে সকলেই

বিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, ক্রমশঃ ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে আবার খানিকটা অগ্রসর হইয়া জলযোগ করা হয়। তদনন্তর সাধারণ চড়াই পথে খর্শালিগ্রামে যাইয়া পৌঁছি। এই গ্রামটী সাধারণ চড়াইর উপর প্রকাণ্ড একটী সমতল ক্ষেত্রে অবস্থিত। ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য বেশ সুন্দর। উত্তর পার্শ্বদিয়া যমুনা ও পশ্চিম পার্শ্বদিয়া আর একটী বড় ঝরণা বহিয়া যাইতেছে, গ্রামবাসিগণকে তাহার জল পান করিতে হয়। এখানে যমুনোত্তরীর পাণ্ডামহারাজগণের বসতি। শীতকালে যমুনাদেবীর পূজা এস্থানে হয় এতদ্ব্যতীত শনৈশ্চর ও সোমেশ্বর মহাদেবের মন্দিরাদি আছে। গ্রামের ভিতর ২টী ধর্ম্মশালা ও পূর্ব্বে পিলিভিতের রাজা শ্রীযুত ললিতাপ্রসাদের একটী ধর্ম্মশালা আছে, কালীকম্বলী বাবার পক্ষ হইতে সাধু ও অভ্যাগতগণকে তিনটি সদাব্রত দেওয়া হয়। গ্রামে সাধারণ শাক-সব্জীর চাষ দেখা গেল, সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের দোকান আছে, গ্রামের দুর্গন্ধতার দরুণ বহির্ভাগস্থ ধর্ম্মশালায় বাসস্থান নির্দ্দেশ করা হয়, মধ্যাহ্নকৃত্যাদি সমাপনান্তে আহারাদি ও বিশ্রাম করা হয়, বৈকাল বেলায় সাধারণ বৃষ্টি হয়। রাত্রিতে আহারের ব্যবস্থা ও বিশ্রাম করা হয়। ১২ই আষাঢ় রবিবার প্রাতে জলযোগের পর শ্রী৺যমুনোত্তরীর দিকে চলিতে আরম্ভ করি। প্রায় দুই মাইল সাধারণ পথ চলিয়া যাওয়ার পর একটী সাধারণ চড়াই উথরাই করিয়া আর একটী চড়াইর উপর শ্রী৺ভৈরব নাথের মন্দির পাওয়া যায়, এই দেবতাকেও ছিন্ন

খর্শালি।

কাপড় দিয়া পূজা দিতে হয়। ক্রমশঃ উক্তভাবে চলিতে চলিতে বেলা দশটার পর শ্রী৺যমুনোত্তরিধামে যাইয়া পৌঁছি। এই রাস্তাটীর সর্ব্বশেষ অংশ অতিক্রম করা কিছু কষ্টজনক। এই ধামে জুতা পায়ে দিয়া আসার নিষেধাজ্ঞা আছে, সকলকেই পশ্চিম পারস্থিত দোকান-দারের তত্ত্বাবধানে জুতা রাখিয়া যাইতে হয়। উত্তরাখণ্ডে যতগুলি তীর্থ আছে তন্মধ্যে এইটীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এখানে যাত্রি-সমাগমও অত্যন্ত কম হইয়া থাকে। ইহার কারণ একমাত্র এই যে পূর্ব্বে এখানে আসিবার জন্য কোন ভাল রাস্তাদি ছিল না। আজ ২।৩ বৎসর হইল টিহরি মহারাজ স্বব্যয়ে ধরাসু হইতে একটী রাস্তা তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু এস্থানটীর দৃশ্য অতি সুন্দর তবে পাণ্ডা মহারাজগণের দোষে অপরিষ্কার অবস্থায় পড়িয়া আছে। হিমালয়-যাত্রিদের সকলেরই এস্থানটি একবার দেখা উচিত। হিমালয়ের চারিটি প্রধান স্থানে যথা,—শ্রীবদরিকাশ্রম, শ্রীকেদারনাথ পুরী, শ্রীগঙ্গো-ত্তরী ও শ্রীযমুনোত্তরীতে, কোথায়ও বা ধামে আর কোথাও বা যাইবার পথে গরম জলের নির্ঝরিণী ও কুণ্ড আছে। কিন্তু সকল গুলির অপেক্ষা এই ধামের গরম জলের ঝরণা, কুণ্ড, ফোয়ারা ইত্যাদি দেখিতে সুন্দর ও একটী বিশেষত্বযুক্ত। অন্য কোনও স্থানের তপ্তকুণ্ডের জল ফুটিতে দেখা যায় নাই। কিন্তু এখান-কার ৪।৫টী কুণ্ডের জল রীতিমত ফুটিতেছে ও তাহাতে কাপড় বান্ধিয়া চাউল দাইল আলু ফেলিয়া দিলে বেশ অল্প সময়ের

শ্রীযমুনোত্তরী।

মধ্যে খাবার উপযোগী সিদ্ধ হয়। রুটী ফেলিয়া দিলে প্রথমে কুণ্ডের তলায় পড়িয়া যায়, তারপর যখন সিদ্ধ হইয়া যায় তখন ঘৃতে ভাজা লুচির মত তথা হইতে ভাসিয়া উঠে, খানিকক্ষণ উপরে রাখিয়া ঠাণ্ডা করিয়া বেশ খাওয়া যায়, তবে চাটুতে সেঁকা রুটীর মত কর্‌করে হয় না। অনেকটা আমাদের দেশীয় সিদ্ধ পুলী পিঠার মত হয়, খাইতেও কোন বিস্বাদ বোধ হয় না। এখানে সমাগত যাত্রীমাত্রেই উক্ত প্রকারে রন্ধনকার্য্য সমাধা করিয়া আহারাদি করেন; এখানে শ্রী৺যমুনাদেবীর মন্দির, নারদ কুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, গৌরীকুণ্ড, গোমুখী প্রভৃতি গরম জলের কুণ্ড ও ফোয়ারা এবং তাহার পার্শ্বে ২।৩ খানা ধর্ম্মশালা গৃহ আছে। যমুনার অপর পারে সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের দোকান আছে। কিন্তু অপর পারে থাকিতে হইলে দিনের বেলায় ধূনী জ্বালিতে হয় আর এপারে তপ্ত কুণ্ডের দরুণ বেশী ঠাণ্ডা অনুভূত হয় না। পাণ্ডা মহারাজগণ গোমুখী-ধারার পার্শ্বস্থ গুহাতে বাস করেন। স্নান করিবার জন্য তপ্তকুণ্ডগুলির পশ্চিম পার্শ্বে একটা চৌবাচ্চার মত স্থানে গরম জলের একটা কুণ্ড আছে, তথায় এবং গরম জলের ধারা যেখানে যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছে—যাহাকে অসিসঙ্গম বলা হয়—এই দুই স্থানে সাধারণ যাত্রীরা স্নানাদি করিয়া থাকেন। এখানে ধর্ম্মশালাতে বাসস্থান নির্দ্দেশ করা হয়। মুরাদাবাদের পুলিশ সবইন্‌স্‌পেক্টর শ্রীযুত শরৎ কুমার ঘোষ মহাশয় তাঁহার মাতাঠাকুরাণী সহ পর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন, তাঁহার সহিত দেখা হইল, তিনি বেশ সজ্জন। এখানে সাধারণ

অসুস্থতা প্রযুক্ত দুই দিন অবস্থিতি করা হয়। এখানকার পাণ্ডাগণ প্রায় নিরীহ প্রকৃতিবিশিষ্ট তবে ধূর্ত্ততা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছে।

১৪ই আষাঢ় মঙ্গলবার প্রাতে জলযোগের পর পাণ্ডা মহারাজগণকে সাধারণ বাক্যালাপে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করি। বেলা দশটার সময় খর্শালিগ্রামে আসিয়া স্নানাহার ও রাত্রিবাস করা হয়। ১৫ই আষাঢ় মঙ্গলবার প্রাতে জলযোগের পর বরাবর সোজা ও ভাল পথে চলিতে আরম্ভ করি। বেলা নয়টার সময় রাণীগাঁও নামক স্থানে যাইয়া পৌঁছি। গ্রামের ভিতরে একটী ধর্ম্মশালা ও সাধারণ খাদ্যদ্রব্যাদি পাওয়া যায়।

রাণী গ্রাম বা রাণীগাও।

এখানে এক রকম পাহাড়ী ফলের (পাহাড়ে ইহাকে চিলু ফল বলা হয়, ঠিক্ পিচ্ ফলের মত) বাগানে আসিয়া উপস্থিত হই। ফলগুলি বেশ মিষ্ট কিন্তু কাঁচা অবস্থায় টক ও কষায়। কতকগুলি পাকা ফল সংগ্রহ করিয়া খাইতে খাইতে চলিতে আরম্ভ করিয়া আরও প্রায় তিন মাইল অগ্রসর হইয়া একটী ঝরণার পার্শ্বে আহারের বন্দোবস্ত করা হয়। এই স্থানে আরও কয়েক জন সাধু ও আহারের যোগাড় করিতেছিলেন। আহারান্তে ও সাধারণ বিশ্রামান্তে যমুনার উপরিস্থিত পুল অতিক্রম করিয়া সাধারণ চড়াই পথে তিন মাইল

ওজিরি গ্রাম।

দূরবর্ত্তী ওজিরি গ্রামে পৌঁছিয়া তথাকার গ্রাম্য ধর্ম্মশালায় বাসস্থান নির্দ্দেশ করি, এখানে খাদ্যদ্রব্য ও সাধারণ

তরি তরকারী ও দুগ্ধ পাওয়া যায়। গ্রামবাসিগণ বিশেষ ধূর্ত্ত। এখানে রাত্রিতে আহারদি করিয়া বিশ্রাম করা হয় সন্ধ্যার সময় সাধারণ বৃষ্টিতে একটু কষ্ট দিয়াছিল। ১৬ই বৃহস্পতিবার প্রাতে জলযোগের পর উথরাই করিয়া দুই যায়গায় যমুনার পুল পার হইয়া সাধারণ চড়াই ও উথরাইর পর বেলা বারটার সময় গঙ্গানী নামক স্থানে যাইয়া পৌঁছি। গঙ্গানী

গঙ্গানী।

পরম সুন্দর স্থান। এখানে গঙ্গা হইতে একটী জলধারা আসিয়া যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছে। কিম্বদন্তী আছে যে এক জন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ প্রত্যহ এস্থান হইতে গঙ্গাতে যাইয়া স্নান করিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া আপন পূজা পাঠ ও অন্যান্য ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিতেন। ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ হইয়া পড়িলে চলৎশক্তি বিহীন হইয়া শ্রী৺গঙ্গাদেবীর কাছে প্রার্থনা করিলেন যে "মা! এখন অতি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি আর চলিবার শক্তি নাই। মনে এই বাসনা ছিল যে মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার পূতজলে স্নান করিতে পারিব কিন্তু তাহা হইল না।" সেই দিনই দৈববাণী হইল যে "তুমি প্রত্যহ যে স্থানে স্নান কর সে স্থান হইতে পর্ব্বতের ভিতর দিয়া একটী ধারা তোমার আবাসস্থানে গিয়া পৌঁছিয়াছে, তুমি প্রাতঃকালে তাহা দেখিতে পাইবে।" নিদ্রাভঙ্গের পর ব্রাহ্মণ ঠিক তাহাই দেখিতে পাইলেন। ব্রাহ্মণ আপন প্রত্যয়ের জন্য আবার সেই দিন গঙ্গাতে স্নান করিতে যাইয়া আপন কমণ্ডলু এই বলিয়া তাঁহার স্নানের যায়গায় রাখিয়া দিলেন যে যদি সত্য সত্যই

মা তুমি আমার বাসস্থানে গিয়া পৌঁছিয়াছ তবে তোমার সেই জলধারা এই পাত্রকে বহিয়া কল্য প্রাতে আমাকে সেখানে পৌঁছাইয়া দিবে। ব্রাহ্মণ পরদিন প্রাতে সেই স্থানে যাইয়া দেখিলেন যে তাঁহার কমণ্ডুলু আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সেই দিন হইতে ব্রাহ্মণ সেই খানেই নিত্য স্নান ও আপন কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতে লাগিলেন এবং শ্রী৺গঙ্গা ও যমুনা দেবীর মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। এক্ষণে উক্ত স্থানে বেশ পাথরে বান্ধান একটী কুণ্ড তৈয়ার হইয়াছে, জলমধ্যে অনেকগুলি মাছ ক্রীড়া করি-তেছে। ইহার পার্শ্বে পিচ্, আখরোট্, নেসপাতি, বেদানা, ডালিম পেয়ারা প্রভৃতি নানাবিধ ফলের বাগান আছে। স্থানীয় পূজারি মহারাজ সপরিবারে এখানে বাস করেন। তাঁহার একটী দোকানে সাধারণ খাদ্যদ্রব্যাদি পাওয়া যায়, টিহরি মহারাজের একটী ধর্ম্মশালা আছে এখন এইটী পূজারি মহারাজের গোশালায় পরিণত হইয়াছে। এস্থানে যথেষ্ট দুগ্ধ পাওয়া যায়। এখানে মধ্যাহ্নকৃত্যাদি সমাপনান্তে আহার ও বিশ্রাম করা হয়। সন্ধ্যার সময় হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হয়, রাত্রিতে সাধারণ মত আহারের বন্দোবস্ত করা হয় এখানে অনেক জন রামানন্দী ও কবীরপন্থী সাধুর সহিত সাক্ষাৎ হয়।

১৭ই আষাঢ় শুক্রবার প্রাতে জলযোগের পর চলিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সোজা পথে এক মাইল অতিক্রম করিবার পর একটী চড়াই সুরু হয়। এই পথটী ক্রমোচ্চ তাই চলিতে তেমন কষ্ট হইতেছিল না, কিন্তু সারা পথে জলের অত্যন্ত অভাব। বেলা

আটটার সময় হইতে আকাশ মণ্ডল ঘন মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিতে লাগিল, ক্রমশঃ মেঘ চারিদিকে এরূপ ভাবে ঢাকিয়া ফেলিল যে ১৫।২০ হাত দূরে কি আছে দেখা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল এবং বেশ ঠাণ্ডা অনুভূত হইতে লাগিল। ক্রমে ধীরে ধীরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল। সেই ঘন মেঘরাশি ভেদ করিয়া চলিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ পাঁচ মাইল চড়াইর পর মেঘ কাটিয়া গেল। পথিমধ্যে পর্ব্বতগাত্রে ডুণ্ডা নামীয় একটী গ্রাম আছে ও সাধারণ জলের একটী ঝরণা আছে। বেলা এগারটার পর হইতে উথরাই করিতে আরম্ভ করিলে পথিমধ্যে একজন ব্রাহ্মণী আমাদিগকে সাধারণ জল-খাবার যোগাইয়া দিল। পাঁচ মাইল উথরাইর পর পথিপার্শ্বস্থ ঝরণাতে স্নানাদি করিয়া জলযোগ ও সাধারণ বিশ্রামান্তে বেলা চারিটার সময় ব্রহ্মখাল চটীর নিকটবর্ত্তী গেঁওগাঁ নামক গ্রামে গ্রাম্য-ধর্ম্মশালায় বাসস্থান নির্দ্দেশ করা হয়। গ্রাম-বাসিগণ বেশ সজ্জন ও অতিথিপরায়ণ, তাঁহারা আমাদের আহাদির সব বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এই গ্রামের পার্শ্বেই উক্ত ব্রহ্মখাল চটী, তথায় সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের দোকান ও একখানা ছপ্পর ঘর ও ঝরণা আছে। আমরা আহারাদি করিয়া ধর্ম্মশালায় অবস্থান করি। ১৮ই আষাঢ় শনিবার প্রাতে জল-যোগের পর ক্রমশঃ উথরাই পথে চলিতে চলিতে বেলা ১১টার সময় ধরাসুতে আসিয়া উপনীত হই। এই স্থানটা গঙ্গার উপর অবস্থিত। এখানে কয়েক ঘর "নাথ" সম্প্রদায়ের লোকের বাড়ী, কালীকম্বলী বাবার

ব্রহ্মখাল।

ধরাসু।

একটী দ্বিতল ও আর একটী একতালা ধর্ম্মশালা, সাধু অভ্যাগতের জন্য সদাব্রতের বন্দোবস্ত ও সর্ব্ব প্রকার খাদ্যদ্রব্যের দোকান ও খানিক উচ্চ প্রদেশে টিহরি মহারাজের ২টী ডাক বাঙ্গালা আছে। এস্থানে ধর্ম্মশালার দ্বিতল গৃহে বাসস্থান নির্দ্দেশ করা হয় ও মধ্যাহ্নকৃত্যাদি সমাপনান্তে আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করা হয়। বৈকাল বেলায় শ্রীমৎ পরম-হংসদেব রামকৃষ্ণ মিশনের ব্রহ্মচারী শ্রীমং গঙ্গারামজিউর সঙ্গে দেখা হয়, তিনি বেশ উন্নতি-প্রয়াসী ও সদালাপী। এস্থানে একটী আমের বাগান আছে, এই বৎসরের প্রারম্ভে সর্ব্বপ্রথমে আমাদের এখানে আম খাওয়া হয়। যাঁহারা দেরাতুন দিয়া বা দেবপ্রয়াগ হইয়া গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরি-দর্শনাভিলাষী হইয়া আগমন করেন তাহাদিগকে এস্থান হইতে যমুনোত্তরীর দিকে রওনা হইতে হয়। এই পথে অনেকগুলি হরিতকী ও আমলকী গাছ আছে। দ্বিপ্রহরে বেশ গরম পড়িতেছিল। রাত্রিতে এক পসলা বৃষ্টি হয়। চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের কাল সমাগত ও প্রতিনিয়ত বৃষ্টি হওয়ার দরুণ বর্ষাকাল উত্তর-কাশীতে অবস্থান মানসে ১৯শে আষাঢ় রবিবার প্রাতে জলযোগের পর সাধারণ পথে গঙ্গার পাশদিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়া বেলা দশ টার সময় ৯মাইল দূরবর্ত্তী ডুণ্ডা নামক স্থানে যাইয়া উপস্থিত হই। এখানে কালীকম্বলী

ডুণ্ডা।

বাবার প্রতিষ্ঠিত একটী দ্বিতল ও একটী একতালা ধর্ম্মশালা বাড়ী, সর্ব্বপ্রকার খাদ্যদ্রব্যের দোকান ও মধ্যবর্ত্তী স্থানে জলের ঝরণা আছে। এই স্থানে খানিক উচ্চপ্রদেশে প্রকাণ্ড একটী গুহা আছে।

দ্বিতল বাড়ীতে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া মধ্যাহ্নকৃত্যাদি সমাপনান্তে আহারাদি ও বিশ্রাম করা হয়, রাত্রিতে আহারাদির পর খুব বেগে বৃষ্টি হইতে থাকে। ২০শে আষাঢ় জলযোগের পর চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতমালার শোভা দেখিতে দেখিতে বেলা দশটার সময় ৯মাইল দূরবর্ত্তী উত্তর-কাশীধামে আসিয়া শ্রীমৎ নাগাজি ও লাটস্বামী মহারাজগণের নির্দ্দেশ মত গঙ্গার তীরবর্ত্তী দশনামী আখরায় বাসস্থান নির্দ্দেশ করা হয়। হিমালয়স্থ সব প্রধান প্রধান স্থানগুলি দর্শনান্তে বর্ষাকাল সমাগত দেখিয়া বিশেষতঃ প্রায় ২মাসের উপর পার্ব্বত্যপ্রদেশে চড়াই উথরাই করিয়া ভ্রমণজনিত ক্লান্তি ও অবসাদ দূরীকরণার্থ উত্তরকাশীধামে কিছু কাল অবস্থিতি পূর্ব্বক সাধুসঙ্গ সদালোচনা ইত্যাদিতে অতিবাহিত করিবার ইচ্ছা হয়। সঙ্গীয় পরিব্রাজক মহারাজ ও পরিব্রাজিকা মাতাজিও আমার সহিত একমত হইয়া এস্থানে পরমানন্দে আপন সাধন ভজনে রত থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই স্থানে দুই মাস তেইশ দিন বাস করা হয়। প্রায় সমস্ত কালটা ব্যাপিয়া রোগীর সেবাশুশ্রূষাতে অতিবাহিত হয়। সর্ব্বপ্রথম শ্রীমৎ ব্রহ্মচারী মদনমোহনদাস জিউ নীলাংমঠ হইতে প্রত্যাগমন কালীন পর্ব্বতশিখর হইতে গড়াইয়া পড়িয়া যান, তাহাতে তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিষম ধাক্কা ইত্যাদি লাগার দরুণ তিনি কঠিনরূপে জ্বরাক্রান্ত হইয়া পড়েন এমন কি ১০।১২দিন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিলেন। তারপর নেপালপ্রদেশীয় শ্রীমৎ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী

উত্তরকাশীধামে অবস্থিতি।

জিউ যমুনোত্তরী হইতে এবং শ্রীমৎ স্বামী কেদারগিরি জিউ গঙ্গোত্তরী হইতে জ্বরাক্রান্ত হইয়া আমাদের বাসস্থানে আসিয়া পৌঁছেন, তদনন্তর সঙ্গীয়া পরিব্রাজিকা মাতাজিউ কঠিন সন্নিপাতজ্বরে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুশয্যাগত প্রায় হইয়া পড়েন, সর্ব্বশেষে একজন বৈষ্ণব সাধু শ্রীমৎ কালাকৃষ্ণদাস বাবাজী সাধারণ জ্বরাক্রান্ত হইয়া পড়েন। শ্রীশ্রীগুরুচরণ-কৃপা-বলে যথাসাধ্য কবিরাজ ও ডাক্তারের বন্দোবস্ত ও সেবাশুশ্রূষাদি দ্বারা তাঁহাদিগকে ভাল করা হয়। উক্ত সময়ে স্থানীয় ডাক্তার শ্রীযুত মুন্সীরাম জিউ ও কবিরাজ শ্রীমৎ গিরিবর ব্রহ্মচারী মহারাজ উপযুক্ত ঔষধাদি ও সৎপরামর্শদানে অনুগৃহীত করেন। এই সময়ে কালীকম্বলী বাবার ছত্রের বর্ত্তমান ম্যানেজার মহাশয় কোন দুষ্ট লোকের পরামর্শে সাধারণ মনোমালিন্যের সৃষ্টি করেন। পরে প্রকৃত তথ্য জানিতে পারিয়া আত্মকৃত কার্য্যের জন্য অনুতাপাদি পূর্ব্বক যথোচিত প্রতিকার করেন। এস্থানে অবস্থান কালে ৩২শে ভাদ্র শনিবার শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমৎগুরুদেবের শুভজন্ম তিথি উৎসব সম্পন্ন করা হয়, তদুপলক্ষে শ্রীশ্রীমতী জয়পুরের-মহারাণীর ছত্র হইতে ও শ্রীমৎ ব্রহ্মচারী মদনমোহনদাসজিউ মহারাজের নিকট হইতে প্রাপ্ত সাহায্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শুভ জন্মতিথি উৎসবোপলক্ষে উক্ত শুভদিনে, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, শ্রীশ্রীগুরুগীতা, বেদ, চণ্ডী, শ্রীকৃষ্ণেরশতনাম ইত্যাদি পাঠ ও হোমাদি কার্য্য সমাপনান্তে ভোগরাগের পর পরমহংস, সাধু-

সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব, পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ, কুমারী, বালক ও কাঙ্গালী-ভোজন করান হয়। সেই প্রীতিভোজের সময় শ্রী১০৮ শ্রীমৎ পরমহংস রামাশ্রম স্বামীজিউ মহারাজ এই উৎসবের বিশেষত্ব সমাগত সকলকে বিশেষরূপে ব্যাখ্যাদি করিয়া বুঝাইয়া দেন। ১০ই আশ্বিন আলাপাদিতে স্থানীয় সকল সাধুমহাত্মার সন্তুষ্টি বিধানপূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ১১ই আশ্বিন বুধবার প্রত্যুষে শ্রীশ্রীগুরুচরণ স্মরণ পূর্ব্বক শ্রীহরিদ্বার অভিমুখে যাত্রা করি। এই স্থানে সাধারণতঃ ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে সাধারণ লোকেরও জ্বর ইত্যাদি হয়। শ্রীমৎ-ব্রহ্মচারী মহাশয় আমার পথের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য সাহায্য প্রদান করেন। শ্রীমৎপরমহংস সম্পদগিরি, শ্রীমৎনিত্যানন্দদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীমৎকালাকৃষ্ণদাসজী প্রভৃতি সাধুগণ আমাদের সহিত রওনা হন। বেলা ১১টার সময় ডুণ্ডাতে আসিয়া পৌঁছি। অনেক দিন পরে হঠাৎ পথ চলার দরুণ পায়ে অত্যন্ত বেদনা হয় ও দুইদিন ডুণ্ডাতে অবস্থিতি ও আনন্দ করা হয়। ১৩ই আশ্বিন শুক্রবার প্রাতে জলযোগের পর চলিতে আরম্ভ করিয়া প্রায় দুই মাইল পথ চলিয়া আসিলে পর মূষল ধারে বৃষ্টি আরম্ভ হয়। পথিমধ্যে বাসোপযোগী কোন স্থান না থাকা হেতু অতি কষ্টে ধরাসুতে আসিয়া কালীকম্বলী বাবার ধর্ম্মশালার দ্বিতল প্রকোষ্ঠে বাসস্থান নির্দ্দেশ করি। তিন দিন একই ভাবে বৃষ্টি হইতে থাকার দরুণ তথায় অবস্থান করিতে হয়।

১৬ই আশ্বিন সোমবার প্রাতে জলযোগের পর বরাবর সোজা

পথে চলিতে আরম্ভ করিয়া বেলা নয়টার সময় পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী নগুণাতে আসিয়া উপনীত হই। এখানে শ্রীরামসীতা ও লক্ষণ দেবের সুন্দর মূর্ত্তি ও কালীকম্বলী বাবার ২টী বেমেরামত ধর্ম্মশালা ও সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের দোকান আছে।

নগুণা।

ইহার তলদেশ দিয়া গঙ্গা প্রবাহিতা। খানিক বিশ্রামের পর ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকি বেলা দশটার সময় তিন মাইল দূরবর্ত্তী ছাম নামক স্থানে যাইয়া পৌঁছি। চতুর্দ্দিকে হরিৎবর্ণ মাঠের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত এই স্থানটীর দৃশ্য অতি মনোরম, এখানে নেপাল রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রধান সেনাপতি বাহাদুর তাঁহার স্ত্রীর স্মরণার্থ একটী ধর্ম্মশালা গৃহ স্থাপন করিয়াছেন। বাড়ীটি অত্যন্ত সুন্দর ভাবে গঠিত ও বেশ পরিষ্কার, যুক্ত প্রদেশের ছোট লাট বাহাদুর যখন টিহরিতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন তখন তিনিও এই বাড়ীতে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। নীচের তলায় সর্ব্ব প্রকার খাদ্যদ্রব্যের একটী দোকান, পার্শ্বে পরিষ্কার জলের ঝরণা আছে, এখানে মধ্যাহ্ন-কৃত্যাদি সমাপনান্তে আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করা হয়।

ছাম।

রাত্রিতেও আহারের বন্দোবস্ত করিয়া পরমানন্দে দ্বিতলস্থ প্রকোষ্ঠে রাত্রিযাপন করা হয়। ১৭ই মঙ্গলবার প্রাতে জলযোগের পর ক্রমনিম্ন পথে চলিতে আরম্ভ করি, পথিমধ্যে অনেক স্থানে অতিরিক্ত বর্ষার দরুণ রাস্তা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অতি সাবধানের সহিত ঐ সব স্থান অতিক্রম করিয়া বেলা দশটার সময় ভাড়লান নামক স্থানে যাইয়া পৌঁছি,

এখানে কালীকম্বলী বাবার ২খানা ধর্ম্মশালা বাড়ী ও সর্ব্ব প্রকার খাদ্যদ্রব্যের একটী দোকান ও জলের ঝরণা আছে। এখানে বেশ দুগ্ধ পাওয়া যায়, মধ্যাহ্ন-কৃত্যাদি সমাপনান্তে আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করা হয়। বেলা পাঁচটার পর পাঞ্জাব প্রদেশস্থ হংসী জেলার প্রসিদ্ধ জমিদার মহাত্মা শ্রীযুত আর, এইচ, স্কিনার মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তিনি শিকার করিবার উদ্দেশ্যে মসূরি হইতে বহির্গত হইয়াছেন ও গঙ্গোত্তরী পর্য্যন্ত যাওয়ার ইচ্ছা; তিনি বেশ সদালাপী ও সাধু-প্রকৃতিবিশিষ্ট নিষ্ঠাবান ব্যক্তি। রাত্রি প্রায় নয়টা পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে নানাবিধ আলাপে পরমানন্দে অতিবাহিত করা হয়। ১৮ই বুধবার প্রাতে তিনি আমাদের ফটো তুলিয়া রাখেন ও পাথেয়ের জন্য কিঞ্চিৎ সাহায্য দান করেন; তাঁহার সঙ্গে অনেক লোক জন আছে তন্মধ্যে কেরাণী বাবু বেশ সদালাপী। এই স্থানটী বিশেষ সন্ধিস্থল, এই স্থান হইতে একটী রাস্তা প্রতাপনগরে আর একটী টিহরিতে ও অপরটী কানাতাল হইয়া মসূরি-দেরাদুনে এবং অন্য একটী উত্তর কাশীর দিকে গিয়াছে। প্রতাপ নগর এস্থান হইতে ১৪ মাইল দূরবর্ত্তী পর্ব্বত-শিখর দেশে অবস্থিত। বর্ত্তমান টিহরি মহারাজ তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃ-দেবের নামে উক্ত নগর স্থাপন করিয়াছেন ও গ্রীষ্মকালে তথায় বাস করিয়া থাকেন। উক্ত স্থান গ্রীষ্মকালেও বেশ ঠাণ্ডা এবং স্বাস্থ্যপ্রদ। ভাড়লান হইতে ১২ মাইল দূরে গড়বালের মহারাজ বাহাদুরের রাজধানী টিহরি অবস্থিত; এই স্থানকে শ্রীশ্রীবদরী

ভাড়লান।

প্রতাপ নগর।

নারায়ণের গদীও বলা হয়। কারণ গড়বাল যখন স্বাধীন ছিল তখন হিমালয়স্থ সমস্ত তীর্থস্থান ও প্রধান প্রধান স্থানগুলি তাঁহার অধীনে ছিল, ইংরেজ বাহাদুরের উক্ত স্থান দখলের পর এখন কেবলমাত্র যমুনোত্তরী ও গঙ্গোত্তরী তাঁহার রাজ্যের মধ্যে আছে আর বাকী সব বৃটিশ গড়বালের অন্তর্গত হইয়াছে। টিহরিতে টিহরির রাজবাটী, এণ্ট্রান্স স্কুল, ক্লক টাওয়ার, হাটবাজার, অনেক প্রধান প্রধান রাজ-কর্ম্মচারী ও পণ্ডিতদের বাসস্থান ইত্যাদি আছে। এখনও শ্রীশ্রী৺বদরি নারায়ণ,শ্রী৺কেদারনাথ ও শ্রীগঙ্গোত্তরী, যমুনোত্তরী প্রভৃতি স্থানের মন্দিরের দরজা খোলা ও বন্ধ করার শুভ সময় এই স্থান হইতে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। বর্ত্তমান মহারাজা শ্রীযুত সার কীর্ত্তিশা বাহাদুর কে, সি, এস্, আই মহোদয় বেশ সুবিদ্বান ও জিতেন্দ্রিয় বলিয়া বিখ্যাত। মহারাজ বাহাদুর সাধু মহাত্মার জন্য সাধারণ সদাব্রত ও কিঞ্চিৎ পাথেয়ের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ভাড়লান হইতে ক্রমশঃ চড়াই পথে চলিতে আরম্ভ করি। পথিমধ্যে টিহরি রাজ্যের বন বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুত রায় রমাদত্ত বাহাদুরের সঙ্গে দেখা হয় ও সাধারণ আলাপাদির পর চলিতে চলিতে নয় মাইল চড়াই করিয়া কানা-তালে যাইয়া পৌঁছি। এই স্থান হইতে একটী রাস্তা টিহরির দিকে চলিয়া গিয়াছে। কানাতালের পাহাড়ে যথেষ্ট পরিমাণে গোল-আলুর চাষ হয় এবং আলু নানা দেশে চালান দেওয়ার জন্য আড়ত আছে। এখানে কালীকম্বলী বাবার একটী দ্বিতল ও

টিহরি রাজধানী।

একটী একতালা ধর্ম্মশালা বাড়ী, সর্ব্ব প্রকার খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রাদির দোকান ও জলের ঝরণা ইত্যাদি আছে। রাত্রিতে বেশ ঠাণ্ডা অনুভূত হয়। এখানে সাধারণতঃ চোরের উৎপাত দেখা গেল। আহারাদি করিয়া রাত্রিতে বিশ্রাম করা হয়। ১৯শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার প্রাতে জলযোগের পর পর্ব্বত-শিখর-প্রদেশস্থ পথে ও দূরবর্ত্তী পর্ব্বত-শৃঙ্গস্থ ধবল তুষার রাশির শোভা দেখিতে দেখিতে বেলা দশটার সময় ধনোটীতে আসিয়া উপনীত হই। এখানে কালীকম্বলী বাবার ধর্ম্মশালা, টিহরি মহারাজের ডাক বাঙ্গালা, পুলিশচৌকী, সর্ব্বপ্রকার খাদ্য-দ্রব্য ও মিষ্টান্নের তিন চারিখানি দোকান আছে, এখানে জল একটু দূরদেশ হইতে আনিতে হয়। এখানে বেশ দুগ্ধ পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকগুলি বেশ আমোদপ্রিয় ও ঠাণ্ডা কানাতালের মত। এখানে মধ্যাহ্নকৃত্যাদি সমাপনান্তে আহারাদি ও বিশ্রাম করা হয়। বৈকাল বেলায় আকাশ অত্যন্ত মেঘাচ্ছন্ন হইয়া যায়, রাত্রিতে বেশ ঠাণ্ডা অনুভূত হয়।

কানাতাল।

ধনোটী।

২০শে আশ্বিন শুক্রবার অতি প্রত্যূষে চলিতে আরম্ভ করি। প্রায় ৩।৪মাইল পথ অতিক্রম করিয়া জলযোগ করা হয়, পর্ব্বত শিখ-রস্থ পথ চলিতে চলিতে অনেক দিন পরে অদূরবর্ত্তী সমতল ভূমি ও দেশের শোভা এবং হরিতবর্ণমাঠের দৃশ্য পরমরমণীয় বোধ হইতেছিল, ক্রমশঃ চলিতে চলিতে নয় মাইল দূরবর্ত্তী ঝাল্‌কীতে যাইয়া পৌছি। এখানে শ্রীমৎ মোহন্ত লছমন দাসজির একটী ধর্ম্মশালা এবং

৩।৪ খানি সর্ব্বপ্রকার খাদ্যদ্রব্য মিষ্টান্ন ও দুগ্ধের দোকান আছে। এখানে জল প্রায় এক মাইল দূর হইতে আনিতে হয়—এক কেনেস্তারা জলের দাম এক আনা। এখানে স্নানাহার ও সাধারণ বিশ্রামের পর চলিতে আরম্ভ করি। এক মাইল দূরবর্ত্তী সুবা খোলী নামক স্থান হইতে একটী পথ পার্ব্বত্য দেশ দিয়া ধরাসুতে যাওয়া যায়। মধ্যে একটী চড়াই অত্যন্ত দুরারোহ। এই স্থান হইতে তিন মাইল দূরে শ্রীমৎ মোহন্ত লছমন দাস মহারাজের জবরখেত নামীয় পর্ব্বত-শিখর দেশে একটী প্রকাণ্ড বাগান আছে। ঐ স্থানে কোন প্রকারের জীব জন্তু শীকার করা নিষিদ্ধ। তখন চারিদিকও আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন ছিল। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে উক্ত স্থান হইতে দুই মাইল দূরবর্ত্তী মসূরিতে সন্ধ্যা সাতটার সময় যাইয়া পৌঁছি। আজ কয়েক বৎসর অতীত হইল ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই স্থান টিহরি মহারাজের নিকট হইতে বন্দোবস্ত লইয়া গ্রীষ্মাবাস নির্দ্দিষ্ট করিয়া হিমালয় গাত্রে রীতিমত একটী সহর স্থাপন করিয়াছেন। এখানে গ্রীষ্মকালে অনেক ধনী, মানী, সাহেব, সুবা আসিয়া বাস করেন। সহরে সর্ব্বত্র বৈদ্যুতিক আলো, টেলিফোঁ, জলের কল ইত্যাদি আছে। বড় বড় সওদাগরের নানাবিধ মালের দোকান, সাহেবদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য স্কুল, কলেজ, গোরা-সেনানিবাস এবং সর্ব্বপ্রকারের রাজকীয় কর্ম্মচারীর আফিসাদি আছে। ছেলে-

ঝালকী।

জবরখেত।

মস্থরী।

দের খেলার জন্য স্থানে স্থানে খেলার যায়গা তৈয়ার করা হইয়াছে, পর্ব্বতগাত্রে স্তবকে স্তবকে নির্ম্মিত বাড়ীগুলির শোভা অতি মনোরম। ল্যাণ্ডোরের বাজার অতি সুন্দর এখানে সর্ব্বপ্রকার মালের ক্রয় বিক্রয় ও প্রত্যহ বাজার বসে। পর্ব্বতগাত্রস্থ রাস্তাগুলিতে ঘোড়ার গাড়ী ইত্যাদি চলিবার বেশ বন্দোবস্ত আছে। এখানে বেড়াইতে বেড়াইতে দূরবর্ত্তী সমতল দেশের শোভা অত্যন্ত সুন্দর দেখায়। অভ্যাগত সাধুমহাত্মাদের থাকিবার জন্য একটী শিবালয় ও তৎসংলগ্ন ধর্ম্মশালা এবং বিশেষ পরিচর্য্যার সহিত আহারাদির বন্দোবস্তাদি আছে। মোটের উপর এক কথায় প্রধান প্রধান সহরে যাহা যাহা থাকা দরকার এখানে তাহার সব কিছু আছে। এখানে এই সময়ে আমাদের কলিকাতা অঞ্চলের পৌষ মাসের মত শীত। ৺শিবালয়ে রাত্রিবাস ও আহারাদি করা হয়।

২১শে আশ্বিন প্রাতে চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বত গাত্রে গৃহাদির দৃশ্য ও অদূরবর্ত্তী সমতল দেশের শোভা দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ উথরাই-পথে বালুগঞ্জ ও জড়ীপানী হইয়া সাত মাইল দূরবর্ত্তী রাজপুরে যাইয়া পৌঁছি। পূর্ব্বোক্ত স্থানদ্বয়ে সর্ব্বপ্রকারের খাদ্যদ্রব্য ও মিষ্টান্নাদির দোকান আছে।

রাজপুর।

রাজপুরও ছোটখাট একটী সহরের মত। সব বন্দোবস্তই আছে। সর্ব্বপ্রকার খাদ্যদ্রব্য ও মিষ্টান্নাদির দোকানাদি আছে। হিমালয়-যাত্রিদের কাণ্ডী ঝাঁপান প্রভৃতি যানের বন্দোবস্ত এখানেই করিয়া লইতে হয়। এখানে জলযোগ করিয়া ঘোড়ার গাড়ীতে

দেরাদুনাভিমুখে রওনা হই। এখান হইতে দেরাদুন পর্য্যন্ত বরাবর ঘোড়ার গাড়ী যাতায়াত করে ও সকল সময়ে পাওয়া যায়।

দেরাদুন। দেরাদুন উক্ত নামীয় জেলার প্রধান নগর। বেলা দশটার সময় এখানে যাইয়া পৌঁছি। দেরাদুন একটী প্রসিদ্ধ সহর, এখানে সর্ব্বপ্রকারের স্কুল কলেজাদি আছে। বিশেষতঃ বনবিভাগের প্রধান আড্ডা ও এই বিভাগের প্রধান শিক্ষাস্থান। এখানে সর্ব্বপ্রকার রাজকীয় কর্ম্মচারিদের অফিসাদি আছে ও অনেক সাহেব সুবা ও বড়লোকের বাসস্থান। এখানে মোহন্ত মহারাজ শ্রীমৎ লছমনদাসজিউর প্রতিষ্ঠিত প্রকাণ্ড দেবালয় ও তৎসংলগ্ন ধর্ম্মশালাদি আছে। সাধু অভ্যাগতগণকে বিশেষ যত্ন সহকারে পরিচর্য্যাদি করা হয়। এই স্থানটী নানকপন্থী সাধুগণের একটী প্রধান তীর্থস্থান, পঞ্চমদোলের সময় অনেক যাত্রীসমাগম হইয়া থাকে। দেরাদুন আউধ্ রোহিলখণ্ড রেলওয়ের এই শাখার শেষ ষ্টেশন। রাস্তাঘাটগুলি বেশ পরিষ্কার, তবে জলের বন্দোবস্ত সর্ব্বত্র সুবিধাজনক নহে। হিমালয়-যাত্রিরা এখানেও হিমালয়গমনোপযোগী যানবাহনের বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারেন। এখানে সাধারণ বিশ্রামাদি করিয়া রেলপথে হরওয়ালা দইওয়ালা, ও হৃষীকেশরোড ষ্টেশন হইয়া বেলা সাড়ে তিনটার সময় হিমালয়-ভ্রমণ সমাপনান্তে শ্রীশ্রীহরিদ্বার ধামে আসিয়া উপনীত হই।



চতুর্থ খণ্ড

পরিশিষ্ট।

তীর্থপর্য্যটনের উদ্দেশ্য ও লাভ।

তীর্থ শব্দের অর্থ কি ও তীর্থ কাহাকে বলে, তীর্থ-পর্য্যটনে লাভ কি ও তাহাতে কি উদ্দেশ্য সাধিত হয় ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিলে বর্ত্তমানে যে ভাব জনসাধারণ গ্রহণ করে তদপেক্ষা অনেক গূঢ় রহস্য বাহির হইয়া পড়ে। প্রথমতঃ দেখা যাউক তীর্থ শব্দের অর্থ কি? ইহার প্রকৃতিগত অর্থ তীরে স্থিত, সেই জন্যই স্থানগুলির নাম সাধারণতঃ তীর্থ নামে খ্যাত হইয়াছে। এখন তীরে স্থিত বলিলে নদীর তীর বা সাগরের তীরে স্থিত বুঝায়, কিন্তু এমন অনেক তীর্থস্থান আছে যেখানে নদী বা সাগর কিছুই নাই, তবে তীরে স্থিত বলিতে আমরা কি বুঝিব? একটু ভাবিয়া দেখিলে এবং তীর্থস্থান গুলির অবস্থিতি-বিষয়ে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, সংসার-ক্লিষ্ট মানবগণের শান্তি-প্রাপ্তির ও সংসার-বিরাগী মহাত্মাগণের সংসার-ক্লিষ্ট জনগণের মনে শান্তিবিধান নিমিত্ত যে মিলন স্থান তাহারই নাম তীর্থ। এই স্থানে সংসারবদ্ধ জীবগণ দীর্ঘকাল ব্যাপী মনস্তাপাদি হইতে



চতুর্থ খণ্ড

পরিশিষ্ট।

তীর্থপর্য্যটনের উদ্দেশ্য ও লাভ।

তীর্থ শব্দের অর্থ কি ও তীর্থ কাহাকে বলে, তীর্থ-পর্য্যটনে লাভ কি ও তাহাতে কি উদ্দেশ্য সাধিত হয় ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিলে বর্ত্তমানে যে ভাব জনসাধারণ গ্রহণ করে তদপেক্ষা অনেক গূঢ় রহস্য বাহির হইয়া পড়ে। প্রথমতঃ দেখা যাউক তীর্থ শব্দের অর্থ কি? ইহার প্রকৃতিগত অর্থ তীরে স্থিত, সেই জন্যই স্থানগুলির নাম সাধারণতঃ তীর্থ নামে খ্যাত হইয়াছে। এখন তীরে স্থিত বলিলে নদীর তীর বা সাগরের তীরে স্থিত বুঝায়, কিন্তু এমন অনেক তীর্থস্থান আছে যেখানে নদী বা সাগর কিছুই নাই, তবে তীরে স্থিত বলিতে আমরা কি বুঝিব? একটু ভাবিয়া দেখিলে এবং তীর্থস্থান গুলির অবস্থিতি-বিষয়ে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, সংসার-ক্লিষ্ট মানবগণের শান্তি-প্রাপ্তির ও সংসার-বিরাগী মহাত্মাগণের সংসার-ক্লিষ্ট জনগণের মনে শান্তিবিধান নিমিত্ত যে মিলন স্থান তাহারই নাম তীর্থ। এই স্থানে সংসারবদ্ধ জীবগণ দীর্ঘকাল ব্যাপী মনস্তাপাদি হইতে

পার পাইবার জন্য আসিয়া থাকেন আর সংসার-ত্যাগী সাধু মহাত্মাগণ সংসার ত্যাগের পর যে শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তাহার আভাষ বা গুণগানের নিমিত্ত উক্ত স্থানে আসিয়া মিলিত হন, তথায় পরস্পর ভাব-বিনিময় দ্বারা কিছুকাল নানাবিধ শিক্ষা করিয়া আবার স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করেন, তাই উক্ত স্থানকে তীর্থস্থান বলে, তন্নিমিত্ত বিভিন্ন স্থানে যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন নামে ঋষিগণ বহু তীর্থ রচনা করিয়াছেন। আমাদের পূর্ব্বতন আর্য্য ঋষিগণ যে সমস্ত স্থান নির্দ্দেশ করিয়া তথায় তীর্থ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল স্থান স্বচক্ষে দর্শন করিলে মনে এক অনির্ব্বচনীয় উচ্চ ভাবের উদয় হয়। তথায় বাসের দ্বারা মানব মাত্রেরই বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক সর্ব্বপ্রকার উৎকর্ষ সাধিত হয়। যাঁহারা এই সমস্ত তীর্থাদির স্থাপয়িতা তাঁহারা যে কিরূপ মহান্ হৃদয়, উন্নত পুরুষ, তত্ত্বদর্শী ও বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিক ছিলেন তাহার প্রশংসা ও বর্ণনা করা আমার মত অদূরদর্শী লেখকের সাধ্যাতীত। এক একটী তীর্থস্থানের প্রধানত্বের তথ্য আবিষ্কার করিতে যাইয়া, বর্ত্তমান বিদ্বন্মণ্ডলিগণ নানাবিধ পরীক্ষাদির দ্বারা এক একটী বিষয়ের সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহারা পূর্ব্বতন মহাত্মাগণের এতদ্বিষয়ে সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন এবং তাঁহারা যে মহাপুরুষ ছিলেন তাহা শতমুখে প্রশংসা করিতেছেন। সাধারণ চক্ষে দেখা যায় যে, যে সকল স্থান বর্ত্তমান সময়ে তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত, সে সকল স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য,জল,বায়ু,আহার্য্য,লোকসাধারণের

চরিত্র, আচার ও ব্যবহার প্রভৃতি যে কত প্রশংসনীয় তাহা যাঁহারা একবার তীর্থগুলি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন। তবে বর্ত্তমান যুগে যে সমুদয় স্থান যেরূপ দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে তাহা দেখিলে আর তাহার পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করিতে ইচ্ছা করে না।*

তীর্থ-পর্য্যটন দ্বারা স্বাবলম্বন, ভগবানে আত্মসমর্পণ, সাধুসঙ্গ, সদ্গুরুলাভ, মনের উৎকর্ষ সাধন প্রভৃতি নানাবিষয়িণী অভিজ্ঞতা ও বৈরাগ্য লাভ ঘটে।

তীর্থপর্য্যটন দ্বারা স্বাবলম্বন।

যাঁহারা নিস্বম্বল বা স্বল্প সম্বল লইয়া পর্য্যটনে বাহির হন তাঁহাদিগকে আপন চেষ্টায় আহার্য্য দ্রব্যাদির ও বাসস্থানের উপযোগী স্থান সংগ্রহ করিতে হয়, স্বহস্তে রন্ধন, জল উত্তোলন প্রভৃতি কার্য্য করিতে হয়—আবার যাঁহার সহিত উপযুক্ত লোক জনের অভাব নাই, তাঁহাকেও ঐ সমস্ত কার্য্যাদি নির্ব্বাহের জন্য স্বয়ং সুবন্দোবস্ত করিতে হয়। ইহাতে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, মনুষ্য মাত্রেরইত এ সকল কায্য করিতে হয়, ইহাতে আবার বিশেষত্ব কি? বিশেষত্ব এই যে, আপনাপন বাড়ীতে অবস্থান কালে সকল দ্রব্যের প্রাপ্তিস্থান জানা থাকে; কিন্তু পর্য্যটনের সময় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, অপরিচিত স্থানে লোকের সহিত আলাপ ব্যবহারাদির দ্বারা ঐ সমস্ত কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিতে হয়; এই প্রকার কার্য্য করিতে সর্ব্ব প্রথমে একটু বেগ পাইতে হয় বটে

* তীর্থধামে পাণ্ডার দরকার ইত্যাদি শীর্ষক প্রবন্ধ পড়ুন।

কিন্তু তদ্দারা ভাবি মঙ্গলের দ্বার উদ্ঘাটিত হয় সুতরাং তদুপযোগী বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা করিতে হয়। ক্রমশঃ তাহার মনের তেজ ও বুদ্ধি বল এত বাড়িয়া উঠে যে, পরিশেষে একাকী ভ্রমণ করিতেও তাহার আর ক্লেশ হয় না। পর্য্যটনের সময় একাকী অথবা বহুজন সঙ্গে যে কোন অবস্থায় হউক না কেন, সর্ব্ববিষয়ে একমাত্র সহায় সেই সর্ব্বমঙ্গলনিয়ন্তা ভগবান; সুখে দুঃখে আপদে বিপদে একমাত্র তিনি রক্ষাকর্ত্তা। পর্য্যটনের সময় সহযাত্রিদের মধ্যে যদি কেহ কোন রকমের কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন, তবে প্রায়ই দেখা যায় যে, তাহার সহযাত্রীরা তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ! একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি, এই অবস্থাটী কিরূপ ভয়াবহ ও শোচনীয়! কাহারও নিজ বাড়ীতে সামান্য অসুখ হইলে তাহার জন্য শুশ্রূষাকারী লোক, ডাক্তার, কবিরাজ কতই দরকার হয়, আর এই অসহায় এবং অজ্ঞাত স্থানে, কঠিন রোগাক্রান্ত হইলে তাহার ঐ সকল সাহায্য ত দূরের কথা অধিকন্তু মনের কি প্রকার অশান্তি ও আশঙ্কার উদয় হয় তাহা ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। যাঁহারা ৺পুরিধামে শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের রথ যাত্রা দেখিয়াছেন (রেলওয়ে হইবার পূর্ব্বে) তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ঘটনা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। সত্য বটে যে প্রায় সমস্ত তীর্থ স্থানেই হাঁসপাতাল, শান্তিরক্ষক ইত্যাদি আছে কিন্তু থাকিলে কি হইবে, তাহারা ত গলি গলি, ঘর ঘর খুজিয়া রোগাক্রান্ত লোককে চিকিৎসার্থ লইয়া

যায় না। যাহারা তাহাদের শরণাগত হয় তাহারা তাহাদেরই সাহায্য করে। আর যাহারা পড়িয়া থাকে, তাহাদের সহায় একমাত্র ভগবান। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া যাঁহারা তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হন, তাঁহারা একমাত্র সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানেই আত্ম সমর্পণ করিয়া থাকেন, কোন রকমের অভাব বা অসুখ হইলেই কায়মনোবাক্যে তাঁহারই শরণাগত হইয়া থাকেন। এইরূপে এক একটী বিপদে রক্ষা পাইয়া ক্রমশঃ ভগবানের উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়। সহযাত্রিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত পথিপার্শ্বস্থ কঠিন রোগাক্রান্ত রোগীকে যে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তি বসিয়া সেবা শুশ্রূষাদি করে তাহা তাঁহার ঈশ্বর-নির্ভরতা ও তাঁহাতে আত্মসমর্পণের ফল। এইপ্রকার অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বা তদবস্থাপন্ন লোকের অদৃষ্ট ইত্যাদি দেখিয়া শুনিয়া ক্রমশঃ স্বাবলম্বন ভাব ও এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কেহ কাহারও সাথী নহে, একমাত্র ভগবানই সর্ব্বাবস্থায় সকলের একমাত্র সম্বল ও তাঁহারই কৃপাবল আমাদের বল ইত্যাদি রকমের ভাব মনে জাগরিত হইয়া নিজের অহং জ্ঞানরূপ বিষম ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহারই প্রতি ভয়, ভক্তি বিশ্বাসাদি দ্বারা আত্মার উৎকর্ষ সাধিত হইয়া ভগবৎ কৃপালাভের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায়।

তীর্থ-পর্য্যটন দ্বারা সাধুসঙ্গ ও সদ্‌গুরু লাভ হয়। সাধুসঙ্গ লাভ যে একমাত্র সাধু মহাত্মার দর্শনে বা সহবাস দ্বারা অথবা তাঁহাদের উপদেশবাণী দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সাধিত হয় তাহা

নহে; পর্য্যটনকালীন নানা প্রকার স্বভাব ও চরিত্রাদি সমন্বিত ব্যক্তির দর্শন ও সহবাস লাভ ঘটে। তাহাদের বিভিন্ন প্রকার চাল চলন, আচার ব্যবহার ও কৃতকার্য্যাদি দর্শনে আপনার ভিতর যে পরিমাণ সদ্‌গুণের অভাব আছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য ধাবিত হয়। ক্রমশঃ উক্ত পাপ কার্য্য জনিত অনুতাপাদির দ্বারা নিজের সমস্ত দোষ দূরীভূত হইয়া সদ্‌গুণের আধিক্য হইতে থাকে ও সেই দিকে মনের গতি প্রধাবিত হয়। আবার নিত্য নূতন নানা সৎকার্য্যাদির অনুষ্ঠানাদি দেখিয়া নিজের উক্ত প্রকারের সদনুষ্ঠানের ইচ্ছা জন্মে। ক্রমশঃ উক্ত প্রকারের সঙ্গদ্বারা সর্ব্বসাধারণ মাত্রেরই আপনাপন দোষ ও গুণের প্রতি লক্ষ্য পড়ে ও তদ্দ্বারা মনের উৎকর্ষ সাধিত হইয়া সমস্ত মনোবৃত্তি সৎ হইয়া যায়। যাঁহাদের উন্নতাবস্থা দর্শনে আপন অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, তাঁহারাই উক্ত বিষয়ের গুরু হন। এই প্রকারে নানা স্থানে পর্য্যটন ও নানা প্রকারের সঙ্গ লাভ দ্বারা মনের উৎকর্ষ সাধিত হইয়া যখন সুসময় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন এমন মহাত্মার দর্শন লাভ ঘটে যাঁহার কৃপাবলে মনের সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত হইয়া মুক্তি-মার্গের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায়।

তীর্থ-পর্য্যটনে সাধুসঙ্গ ও সদ্‌গুরু লাভ।

তীর্থ-পর্য্যটন কালীন স্বাবলম্বন, ভগবানে আত্ম সমর্পণ, সাধুসঙ্গ ও সদ্‌গুরু লাভ, প্রত্যহ নূতন বস্তুর দর্শন, নানা প্রকার কার্য্যাদির স্বহস্তে সম্পাদন এবং অন্য দ্বারা সম্পাদিত কার্য্যাদি

দর্শনে নানাবিষয়িণী অভিজ্ঞতা লাভ হয়। তীর্থ-দর্শন দ্বারা

অভিজ্ঞতা লাভ।

যে বৈরাগ্য লাভ ঘটে, তাহা ভগবান রামচন্দ্রের জীবন-চরিত পাঠ করিলেই দেখা যায় যে, তীর্থ-পর্য্যটনান্তে তিনি সমস্ত বিষয়ে এরূপ আস্থাবিহীন

বৈরাগ্য।

হইয়া পড়িয়াছিলেন ও এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, এই দেহ নশ্বর ও ক্ষণকাল-স্থায়ী; ইহার জন্য যত্ন করা বৃথা ও পোষণার্থে আহারাদি করিয়া কি হইবে। যাহা অনিত্য তাহার জন্য যত্ন চেষ্টাদি করা মূর্খ লোকের কাজ। প্রকৃত সত্য কি, এই তথ্য লাভ করিবার জন্য সাংসারিক সমস্ত বিষয়ে একেবারে উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহাকেই প্রবুদ্ধ করিতে ও নিত্য পদার্থ কি তাহা অবগত করাইতে যাইয়া যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ রচিত হইয়াছে ও তদ্দারা জগতের মহান্ উপকার সাধিত হইতেছে। কিরূপে বৈরাগ্য লাভ ঘটে এতদ্বিষয়ে আলোচনা করিলে দেখা যায় ও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, পর্য্যটক ও পক্ষীর ব্যবহার অনেক অংশে প্রায় এক রকম। পাখী যে প্রকার সকাল বেলা হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত আপনার আহার অন্বেষণার্থ এদিক ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়, আর যখন সন্ধ্যা হইল, তখন একটী বৃক্ষ ডালে রাত্রি যাপনার্থে আশ্রয় গ্রহণ করিল, আবার রাত্রি প্রভাত মাত্রেই আহারের জন্য বহির্গত হইয়া গেল, উড়িতে উড়িতে কোন্ দিকে চলিয়া গেল তাহার কোন ঠিকানা রহিল না; আবার সন্ধ্যা সমাগমে সম্পূর্ণ নূতন বৃক্ষে আশ্রয়

লইল, পূর্ব্ব রাত্রির আশ্রিত বৃক্ষের অবস্থিতি বা তৎকালীন সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদির কিছুই স্মৃতি মনে রহিল না, সম্প্রতি বৃক্ষে অবস্থান কালীন নূতন সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে লাগিল, সেই প্রকার পর্য্যটকও সারাদিন চলিয়া চলিয়া সন্ধ্যার সময় এক চটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং তথায় উপস্থিত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থাদি করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন, রাত্রি প্রভাতে আবার গম্য স্থান উদ্দ্যেশ্যে বহির্গত হইলেন ও সারাদিন চলিয়া চলিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে সম্পূর্ণ এক নূতন চটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, পূর্ব্ব রাত্রির আশ্রিত চটীর প্রাপ্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদির বিশেষ স্মৃতি রহিল না বা সকাল বেলায় চটী হইতে বাহির হইবার সময় তাহার দিকে একবার ভাল করিয়া নজরও করা হইল না ইত্যাদি। এইরূপে নিত্য নিত্য নূতন নূতন চটীতে আশ্রয় গ্রহণ করা, আবার রজনী প্রভাতে নূতন পথে অগ্রসর হওয়া দ্বারা ক্রমশঃ আশ্রয়-স্থানের বিস্মৃতি আসিয়া মনে উদিত হয়। এই প্রকার মনের ক্রমোৎকর্ষ সাধিত হইয়া সংসারকে একটী চটীর মত ধারণা হইয়া যাইবে। আবার চটীতে অবস্থান কালীন যেমন আহার্য্য দ্রব্যাদির আয়োজন, স্থানটী পরিস্কৃত করণানন্তর উপবেশন ও শয়নাদি করিতে হয় পরদিন প্রভাত মাত্রেই যখন উক্ত স্থানের প্রতি কোন লক্ষ্যই থাকে না। এই প্রকার যখন আপন সাংসারিক জীবনের নির্দ্দিষ্ট সময়টীকে চটীতে এক রাত্রি বাসের মত ধারণা হইবে এবং উহার প্রকৃত থাকিবার স্থান নহে, তদপেক্ষা নূতন ও সুন্দর উন্নত স্থান প্রাপ্তির

আশা মনে জাগরিত হইবে, এবং সাংসারিক জ্বালা যন্ত্রনাদিতে আবদ্ধ থাকাটা বিষবৎ ধারণা হইয়া যাইবে। এই প্রকারে উক্ত ধারণা যতই ঘনীভূত হইয়া দাঁড়াইবে, যখনই এই দেহখানিকে একটা চটী বা বৃক্ষের মত ধারণা হইবে আর রজনী প্রভাতে পাখিটা যেমন বৃক্ষটা ছাড়িয়া চলিয়া যায় সেইরূপ এই প্রাণপাখীও দেহরূপ বৃক্ষ বা চটী হইতে জীবনের নির্দ্দিষ্ট সময়রূপ রজনী প্রভাতে উহা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, মনে এই প্রকার ধারণার প্রাবল্য হইবে তখন এই দেহ নশ্বর ও বিনাশী, ইহাকে যত পরিমাণে সৎপথে টানিয়া রাখিব ততই তাহার মানসিক উৎকর্ষতা সাধিত হইবে। এই ভাব মনে জাগরিত হইবে ও ক্রমশঃ "অহং" এই অভিমানের বিলোপ হইয়া জীব শিবে পরিণত হইবে ও তদ্দ্বারা এই দেহের অস্তিত্ব বা দেহাভিমান প্রভৃতি যে সকল বিষময় ধারণা মনের ছিল তাহা অনুতাপরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সংস্কৃত হইয়া চিরশান্তিতে লয় করিয়া দিবে। এইরূপে দেখা যায় যে তীর্থ পর্য্যটন দ্বারা মনুষ্য মাত্রেরই স্বাবলম্বন শিক্ষা, ভগবানে আত্ম সমর্পণ, সাধুসঙ্গ ও সদ্‌গুরু লাভ এবং নানাবিষয়িণী অভিজ্ঞতা লাভের দ্বারা সংসারে পূর্ণ বৈরাগ্য ভাব আসে ও পরিশেষে অনন্ত মুক্তির দ্বার প্রকটিত হয়।

বর্ত্তমান সময়ও প্রকৃত প্রস্তাবে যাহারা উন্নত মহাত্মা ও সাধু, তাঁহারা প্রায় আপন নবাগত শিষ্য সেবককেও সর্ব্বসাধারণ মুমুক্ষু ব্যক্তিগণকে আপনার সত্তা কি ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কি ইত্যাদি জ্ঞান লাভার্থে, প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দেওয়ার পূর্ব্বে শরীর-

রক্ষনোপযোগী ক্রিয়া ও উপদেশাদি দিয়া তীর্থপর্য্যটনের উপদেশ দিয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের যতগুলি তীর্থস্থান আছে ও ঐ সকল স্থানে পর্য্যটনের নিমিত্ত যে বিশিষ্ট কালগুলি নির্দ্দিষ্ট আছে তদ্দ্বারা দেখা যায় যে,তীর্থ পর্য্যটন দ্বারা আর একটী বিশেষ লাভ ঘটে। সেইটী এই, শীতোষ্ণ দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা, মান অপমানে সমান জ্ঞান, উচ্চ নীচ প্রভেদ রহিত জ্ঞান ও যতপ্রকার আত্মাভিমান আছে তাহাদেরর সমস্তের লোপ ঘটে। অতএব যাহারা সংসারে আপনার সত্ত্বা কি জানিতে চাহেন, আপন কর্ত্তব্য স্থির করিতে ইচ্ছুক হন, ও সংসারে প্রকৃত সত্য পদার্থ কি জানিবার বাসনা রাখেন তাঁহারা প্রত্যেকেই তীর্থপর্য্যটন দ্বারা উক্ত জ্ঞানলাভে সমর্থ হইবেন ইহাই আমার ধারণা ও দৃঢ় বিশ্বাস। তবে বর্ত্তমান সময়ে ফাঁকি দিয়ে তীর্থের সমস্ত পুণ্য অর্জ্জন করা ও সকালে যাইয়া বিকালে উক্ত স্থান ত্যাগ করা এরূপে কোন লাভ হইবে না। কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইলে তীর্থস্থানে কিছু কাল বাস ও স্থানের মাহাত্ম্য ও স্থানস্থিত সর্ব্বপ্রকার মহাত্মাদির দর্শনাদি করিতে হইবে, কেবল মাত্র স্নান করিয়া মন্দিরস্থ দেবমূর্ত্তি দর্শনে উক্ত কার্য্য সাধিত হইবে না।

হিমালয়।

হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী ভারতবর্ষের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। স্কন্দ পুরাণোক্ত কেদারখণ্ডে উক্ত স্থানটীর বিভিন্ন নাম আছে, যথা দেবভূমি, কেদারখণ্ড ও উত্তরাখণ্ড ইত্যাদি। এই বিশাল

পর্ব্বত শ্রেণীর প্রধান চূড়াগুলি পৃথিবীর যাবতীয় পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে উচ্চতম। মহাকবি কালিদাস এই পর্ব্বতটীকে দেবতাত্মা পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয় বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। ইহার উত্তর প্রান্তে তাতার ও চীন সাম্রাজ্য, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র নদ ও সিন্ধুনদী ও দক্ষিণে আর্য্যাবর্ত্ত বা ভারত ভূমি। হিমালয়ে নেপাল ও ভূটান দুইটী স্বাধীন এবং কাশ্মীর সিকিম ও টিহরি প্রভৃতি মিত্র ও করপ্রদ রাজ্য অবস্থিত। এই বিশাল পর্ব্বত শ্রেণী হইতে তিনটী প্রধান নদী—সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র অসংখ্য উপনদীর সহিত একত্র হইয়া সাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের আমলে এই পর্ব্বত শ্রেণীর বিভিন্ন উচ্চ শৃঙ্গদেশে শৈলাবাস প্রস্তুত হইয়াছে। হিমালয়ে কোটী তীর্থ বিরাজিত আছে তন্মধ্যে পশ্চিমে, কাশ্মীরে ৺অমরনাথ, মধ্যে বা গঢ়বাল জেলায় ৺কেদারনাথ ও ৺বদ্রীনাথ, পূর্ব্বে নেপাল প্রদেশে ৺পশুপতিনাথ, উত্তরে কৈলাস পর্ব্বত ও মানস সরোবর প্রভৃতি অতিশয় প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বজন বিদিত। রাওলপিণ্ডি হইয়া কাশ্মীরস্থ ৺অমরনাথ, হরিদ্বার, দেরাদুন, রামনগর, কাটগুদাম বা কোটদ্বার হইয়া মধ্যভাগস্থ তীর্থ সমূহ, গোরক্ষপুর, জয়নগর বা জনকপুর হইয়া নেপালে ৺পশুপতিনাথ দর্শন করিতে যাইতে হয়। আর যাঁহারা সমস্ত তীর্থ এক সঙ্গে দেখিতে চাহেন তাঁহাদের পশ্চিম দিক দিয়া প্রবেশ করিয়া মধ্যভাগের সর্ব্ব তীর্থ দর্শনান্তে পূর্ব্বদিকে বাহির হইতে হয়। হিমালয় পর্ব্বত নাতি-শীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত। শীতকালে ইহার উত্তর ভাগস্থ শৃঙ্গ-

গুলি একেবারে বরফাবৃত ও দক্ষিণ ভাগস্থ শৃঙ্গদেশগুলি বরফে ঢাকিয়া থাকে। এখানকার জল ও বায়ু অতি পরিষ্কার এবং সাধন ভজনের উপযোগী। এখানে অনেক রকমের ফলমূল পাওয়া যায় যদ্দারা বিনা ক্লেশে জীবন ধারণ করা যায়। সম্প্রতি হিমালয় অঞ্চলে অনেক লোক বাস করিতেছে, পূর্ব্বে এই স্থান কেবল মাত্র সাধন ভজনের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। লোকবাসের সহিত পর্ব্বত গাত্রে বা নদীর ধারে কৃষিকার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে।

এখনও হিমালয়ের নিভৃত গুহায় ও মানস সরোবর প্রভৃতি স্থানে অনেক উন্নত সাধু মহাত্মা আপন সাধন ভজনে রত আছেন। ঐ সকল মহাত্মার দর্শন লাভ করিতে হইলে বর্ত্তমান সময়ে যে সব রাস্তা তৈয়ার হইয়াছে তাহা দিয়া সোজা সুজি যাতায়াত করিলে হয় না। আমি তথাকার কোন বিশ্বস্ত পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ করিয়া দেখিয়াছি তিনি বলেন উন্নত সাধু মহাত্মার দর্শন লাভ করা অনেক কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও অধ্য-বসায়ের দরকার। বহুদিন যাবত হিমালয়ের উত্তর ভাগস্থ গ্রামে গ্রামে বিচরণ করিতে হয় ও পর্ব্বতবাসিগণের সহিত আচার ব্যবহারে যখন তাহারা দেখিতে পাইবে যে এই লোক প্রকৃত অনুসন্ধিৎসু ও মুমুক্ষু, তখন যাহাদের সহিত আহার্য্য দ্রব্যাদি দানের দ্বারা প্রকৃত সাধু মহাত্মার সহিত পরিচয় আছে তাহারা উক্ত মহাত্মাদের অনুমতি ক্রমে তাঁহাদের দর্শন লাভ করিয়া ও অভিলষিত বস্তু প্রাপ্তি দ্বারা আপন জীবনকে কৃতার্থ করিতে পারেন। যাঁহারা মানস সরোবর প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া

আসিয়াছেন তাঁহারাও অনেকে এই রকম কথা বলেন। হিমালয় প্রকৃতির লীলা ভূমি, পৃথিবীতে যত গুলি প্রাকৃতিক দৃশ্য-সমন্বিত স্থান আছে একা হিমালয়ে তাহার সমস্তই সমষ্টিরূপে বিরাজিত। তাই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মহাত্মাগণ ও সাধারণ জনগণ স্ব স্ব বাসনা পরিতৃপ্তি মানসে হিমালয় ভ্রমণ করিতে আসিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে কেহ উন্নত পর্ব্বত শৃঙ্গে বরফস্তুপ. নানাবিধ ফল ফুল সমন্বিত নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে হরিণ, পিক, বউ কথা কও, ঘুঘু প্রভৃতির বিভিন্ন জাতীয় পশু ও পক্ষীর মধুর রবে, হিমালয়ের স্থানে স্থানে উষ্ণ প্রশ্রবণ ও ফোয়ারা ইত্যাদি দর্শন দ্বারা পর্ব্বতবাসী জনগণের স্বভাবসুলভ কোমল প্রকৃতি ও আচার ব্যাবহারে মুগ্ধ হইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। কেহ বা প্রাচীন আর্য্যঋষি বা পিতৃপুরুষগণের সাধন ভজনের স্থান সমূহের প্রকাশক ব্যাসগুহা, পরাশরাশ্রম, মুচকুন্দ গুহা, বশিষ্ঠাশ্রম, গণেশগুহা প্রভৃতি গুহা ও আশ্রম এবং তাহাদের প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন দেবদেবী মূর্ত্তি যথা ৺অমরনাথ, ৺কেদারনাথ, ৺পাশুপতিনাথ, ৺তুঙ্গনাথ, ৺বদরিনারায়ণ, ৺ত্রিযুগী নারায়ণ, ৺গঙ্গাদেবী, যমুনাদেবী, গঙ্গা এবং যমুনার অবতীর্ণ স্থান প্রভৃতি দর্শনে এবং গঙ্গাদেবী যে বিভিন্ন নামধারী দেবদেবী ও সাধকগণের নামে নাম ধারণ করিয়াছেন যথা অলকানন্দা, মন্দাকিনী ব্যাসগঙ্গা, কর্ণগঙ্গা, নন্দ গঙ্গা, গরুড় গঙ্গা, পাতালগঙ্গা, কর্ম্মনাশা গঙ্গা, নভগঙ্গা, বিষ্ণুগঙ্গা, কাঞ্চনগঙ্গা, ক্ষীরগঙ্গা, ঋষিগঙ্গা, সরস্বতী গঙ্গা, বালাস্বতী গঙ্গা, রুদ্রগঙ্গা, আকাশগঙ্গা, শৌনকগঙ্গা, ভৃগুগঙ্গা,

ভাস্কর গঙ্গা, জাহ্নবী গঙ্গা, অসিগঙ্গা, বরুণা গঙ্গা, হনুমান গঙ্গা, প্রভৃতিতে স্নানাবগাহনে ও বিভিন্ন নামধেয় প্রয়াগ তীর্থে যথা দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ, বিষ্ণুপ্রয়াগ, ঋষিপ্রয়াগ, শৌনকপ্রয়াগ ও ভাস্করপ্রয়াগ প্রভৃতি স্থাতে স্ব স্ব অভিমতানুযায়ী কার্য্যাদি সম্পাদন দ্বারা আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন, কেহ বা (শীকারিগণ) বিভিন্ন রকমের পশু ও পক্ষী শীকার দ্বারা তৃপ্তি লাভ করেন। আবার অন্যদিকে মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ অতি-কষ্ট সহিষ্ণুতা ইত্যাদির দ্বারা, সাধু মহাত্মা ইত্যাদি দর্শন, তাঁহা-দের সঙ্গলাভ ও প্রাপ্ত উপদেশাদির দ্বারা আপনাকে ভববন্ধন হইতে মুক্ত করিবার উপায় প্রাপ্ত হইয়া জীবনকে ধন্য ও কৃত-কৃতার্থ মনে করেন। হিমালয় যে প্রকার অনন্তকাল হইতে সর্ব্বংসহা হইয়া ধীর শান্ত ভাবে জগৎকে ভূত বর্ত্তমান ও ভবি-ষ্যাতের সমস্ত বিষয়ের উপদেশ করিতেছেন ও তন্নিঃসৃতা নদীগুলি যে প্রকার বিভিন্ন ধারায় জগতের উপকার সাধন করিতেছেন, এবং তাহাতে অবস্থিত সাধু মহাত্মাগণ দীর্ঘ কাল ব্যাপী সামাধি-লব্ধ জ্ঞান দ্বারা জগৎকে জ্ঞানালোকে আলোকিত করিতেছেন, একাধারে এত গুণসমষ্টি সমন্বিত স্থান এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আর কুত্রাপিও আছে বলিয়া বোধ হয় না, তাই ইহার নাম দেবতাত্মা দেবভূমি পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয় ও পৃথিবীর যাবতীয় অঞ্চলের লোক আপনাপন অভীষ্ট সাধনে এই স্থানে উপনীত হন।

-*:*-

তীর্থধামে পাণ্ডা।

পাণ্ডাগণ তীর্থ-পুরোহিত। তাঁহারা তীর্থের যাবতীয় প্রসিদ্ধ স্থানের সংবাদ রাখেন ও যেখানে যে প্রকার কার্য্যাদি করিতে হয় তদ্বিষয়ে উপদেশ দিয়া সমস্ত কার্য্য সমাধা করাইয়া দেন। পৃথিবীতে যত তীর্থ-ধাম আছে সর্ব্বত্রই তীর্থ-পাণ্ডা আছেন। পাণ্ডাগণ বা পাণ্ডার গোমস্তাগণ তীর্থ-গামী যাত্রিগণকে তীর্থ-ধাম হইতে অনেক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া কেহ কেহবা দেশে দেশে ঘুরিয়া দেশবাসিগণকে তীর্থ-পর্য্যটন করিতে উপদেশ দিয়া তীর্থ-ধামে লইয়া যাইয়া থাকেন। এই বিষয়ে শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের পাণ্ডা ও শ্রীশ্রীগয়াক্ষেত্রের পাণ্ডাগণকে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। পাণ্ডাগণ সমাগত যাত্রীদের সুখে দুঃখে সর্ব্ব বিষয়ে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন ও তাহার, স্বেচ্ছায় যে প্রকার দানাদি কার্য্য করিতেন তদ্দারা সন্তুষ্ট হইতেন। যাত্রিগণকে সর্ব্বপ্রকার কষ্ট হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের জন্য উপযুক্ত বাসস্থান নির্দ্দেশ ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির প্রাপ্তি-স্থান গুলি সর্ব্বাগ্রে আপনার লোক সঙ্গে করিয়া দিয়া জানাইয়া দিতেন। পাণ্ডাগণ স্বয়ং বা আপনার লোক দ্বারা যাত্রিগণের যাবতীয় বিষয়ের তত্ত্বাবধান করাইতেন এবং অবসর মত তাহাদের নিকট তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণন এবং সাধু মহাত্মাগণ কোথায় বাস করেন তাহার খবর দিয়া তাঁহাদের দর্শনাভিলাষিগণকে স্বয়ং

সঙ্গে লইয়া যাইতেন। তীর্থের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইলে পাণ্ডাগণ যাত্রিদিগকে তীর্থ সমাপ্তির আশীর্ব্বাদ দিয়া তাহাদের সঙ্গে অনেক দূর পর্য্যন্ত আসিয়া নানা প্রকারে সৌজন্যভাবাদি-দেখাইয়া বিদায় দিতেন। কোন যাত্রী যদি রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন পাণ্ডাগণ ধনি দরিদ্র নির্ব্বিশেষে তাহাদের সেবা শুশ্রূষার বন্দোবস্তাদি করাইয়া যাহাতে সে শীঘ্র রোগ মুক্ত হয় তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। এমন কি যদি কাহারও পাথেয়ের অভাব হয় তাহারা তখনই তাহাদিগের সেই অভাব মোচনান্তে গন্তব্য স্থানে যাওয়ার সুবিধা করিয়া দিতেন। তীর্থধাম সম্বন্ধে যাত্রিগণের সাধারণ জ্ঞান থাকে মাত্র কিন্তু পাণ্ডাগণ ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সমান যত্নের সহিত সকলের সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করাইয়া দিয়া থাকেন এই জন্য তীর্থধামে পাণ্ডার বিশেষ প্রয়োজন। সমস্ত তীর্থধামে রেলওয়ে খুলিবার পূর্ব্বে যাহারা তীর্থপর্য্যটন করিয়াছেন তাহাদের মুখে পাণ্ডাদের প্রশংসা শুনিলে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিবার ইচ্ছা স্বতঃই সকলের মনে জাগিয়া উঠে।

কিন্তু হায়! এখন আর তীর্থধাম সমূহের সেই সমুদয় সু-ব্যবস্থা নাই, সকলই কালধর্ম্মে লোপ পাইতে বসিয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে তীর্থধামে পাণ্ডাগণের সৌজন্যের অভাব, যাত্রীদের প্রতি পূর্ব্বের মত সহানুভূতি, অভাব অভিযোগের দূরীকরণে শিথিলতা, যাত্রীদের প্রদত্ত দানে সন্তুষ্টির অভাব ইত্যাদি পরিলক্ষিত হই-তেছে, আর দিন দিন কপটতা, ধৃষ্টতা, অবসর পাইলে কোন

মূল্যবান জিনিস পত্র তুলিয়া লওয়া,প্রতিপদে প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা, মিথ্যা ব্যবহার ও নিজ স্বার্থ পরিপোষনার্থে যত রকমের অসদুপায় অবলম্বন করিতে হয় এই সমুদয় তাহাদের অঙ্গাভরণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, পূর্ব্বকালে তীর্থ-পাণ্ডাগণ রীতিমত শিক্ষিত ছিলেন আর বর্ত্তমানে শতকরা নিরনব্বুই জন অশিক্ষিত আর বাকী একজন যে আছেন তিনি অর্দ্ধ শিক্ষিত। তদুপরি যত প্রকার মাদক দ্রব্য আছে তাহার প্রায় কয়টীই তাহাদের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া বসিয়াছে। একেত প্রায় সকলেই বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য তদুপরি অপরিমিত নেশা ও পানাদির দ্বারা বুদ্ধি বৃত্তি ক্রমশঃ অধোগামী হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এক্ষণে যাত্রিগণের নিকট টাকা কড়ি যাহা কিছু আছে কি উপায়ের দ্বারা তাহা বিশেষরূপে আত্মসাৎ করিবে, এ সব উপায় তাহাদের শিক্ষনীয় হইয়া উঠিয়াছে। পাঠক পাঠিকাদের অবগতির জন্য এই প্রবন্ধে হরিদ্বার, বদরিকাশ্রম, কেদারনাথ, গঙ্গোত্তরী, যমুনোত্তরী প্রভৃতি স্থানের পাণ্ডাগণের সম্বন্ধে যাহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহার কথঞ্চিৎ আভাষ প্রদান করিব।

হরিদ্বারের পাণ্ডা।

হরিদ্বারের পাণ্ডাগণের বাসস্থান হরিদ্বার হইতে তিন মাইল দক্ষিণে জোয়ালাপুর নামক স্থানে অবস্থিত; কিন্তু হরিদ্বারে প্রত্যেকের যাত্রিদের থাকিবার উপযোগী ঘর আছে। তাহারা প্রথমতঃ যাত্রিগণকে ষ্টেসন-প্রাঙ্গন কেহ বা জোয়ালাপুর হইতে গাড়ীতে উঠাইয়া নানা প্রকার

সৌজন্য ইত্যাদি দেখাইয়া একজনের যাত্রী আর একজনে ভুলাইয়া লইতে চেষ্টা করিয়া থাকেন, পরিশেষে আপন বাড়ীতে বা কোন ধর্ম্মশালায় বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া তীর্থ-কার্য্যাদি সম্বন্ধে নানা প্রকার বচনাদি বলিতে আরম্ভ করেন, তখন যে কত অমূলক দৃষ্টান্ত দিয়া বসিবেন তাহার ইয়ত্তা নাই। এই প্রকারে কতক্ষণ আলাপাদির পর যখন বুঝিতে পারিলেন যে, সে যাত্রী কি রকম কার্য্যাদি করিবে তখন তাহার সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করিবেন, অর্থাৎ যাহার সহিত বাক্যালাপে বুঝিতে পারিলেন যে, এই লোকটা বোকা গোছ, ইহাকে সহজে ঠকাইয়া যাহা খুসী তাহা করা যাইবে তখন তাহার কাছে বিশেষ আশা যাওয়া আরম্ভ করিলেন ও নূতন নূতন বুদ্ধির ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করিলেন আর যাহার সহিত আলাপে বুঝিতে পারিলেন যে তাহা দ্বারা কোন বিশেষ সুবিধা হইবে না তখন যত শীঘ্র তাহার কার্য্যাদি সমাপন করাইয়া বিদায় দিতে পারেন তাহার উপায় দেখেন; কারণ পাছে তাহাদের ব্যবহার দর্শনে বোকা গুলি চালাক হইয়া পড়ে। আমার বিশ্বাস যদি পাণ্ডারা সোজা সুজি তীর্থধামের কি বিধি ও কি কি কার্য্য করিতে হয় এই কথা যাত্রি-দিগকে বুঝাইয়া দেন তাহা হইলে উভয়েরই মঙ্গল হয় কিন্তু তাহারা তাহা না করিয়া অমুক যায়গায় এত প্রণামী, অমুক যায়গায় এত উৎসর্গ ও এত দক্ষিণা দিতে হইবে, ইত্যাদি বলিলে প্রথমেই তো যাত্রীদের ভক্তি কমিয়া আসে, সংক্ষেপে কাজ সারিবার ইচ্ছা হয় ও চুক্তি করিয়া কাজে অগ্রসর হয়। তাহার ফল এই দাঁড়ায়

যে, যেমন টাকা তেমন কাজ হয়। পাণ্ডাদের যেখানে লাভের মাত্রা কম সেখানে তাহারা শীঘ্র করুন, তাড়াতাড়ি চলুন ইত্যাদি বলিয়া তাড়া দিতে সুরু করে, যাত্রী মহাশয় মনে করিলেন ফাঁকা দিয়া কাজ সারিলাম আর পাণ্ডাজি মনে করিলেন যাহা পাই তাহা লাভ। সে কাজের দ্বারা উভয়েরই কি লাভ হইল তাহা পাঠক পাঠিকা বিচার করিয়া স্থির করিবেন।

আমি হরিদ্বারে অবস্থিতি কালে যাত্রীদের ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় উপস্থিত ব্রাহ্মণদের ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। অতি মনোদুঃখে একটী ঘটনা এখানে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম; একজন পশ্চিম অঞ্চলস্থ বণিক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে স্থির করিলে, পাণ্ডা মহারাজ তাহার নির্দ্দিষ্ট দোকান হইতে জিনিষ পত্রাদি আনিতে হুকুম করিলেন, সকলে সমবেত হইবার পর পরিবেশন আরম্ভ হইলে হঠাৎ একজন বলিয়া উঠিল— চাটনী কম হইবে আর খানিকটা আনিলে ভাল হয় অমনি যাত্রী বেচারী দোকানাভিমুখে ছুটিলেন, তথায় তাহার আপন লোক উপস্থিত ছিল না অমনি দুই তিনজন এদিক ওদিক তাকাইয়া সম্মুখস্থ পাত হইতে বেশী ভাগ খাবার কাপড়ে বান্ধিয়া সরাইয়া রাখিলেন, তারপর আহার করিতে আরম্ভ করিয়া ঐ সব জিনিষ চাহিয়া লইয়া রীতিমত আহারান্তে সংগৃহীত খাবারটী আপন চাদর ঢাকা দিয়া লইয়া চলিলেন। আমার বোধ হয় তাহারা যদি উক্ত প্রকার রীতি অবলম্বন না করিয়া সোজা সুজি কাহারও বা বাড়ার ছেলে পিলের নাম করিয়া যাত্রীদের কাছে খাবার

চাহিতেন তাহা হইলে সম্ভবতঃ নিরাশ হইতেন না। যাত্রীদের কার্য্যাদি শেষ হইলে তাহাদের বিদায় দেওয়ার পর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিল আপনার অমুক যাত্রীর নিকট কি প্রাপ্তি হইল, তদুত্তরে যাহার নিকট নিজের মতলব সিদ্ধি হইয়াছে তাহার কথঞ্চিৎ প্রশংসা ও বিশেষ কায়দায় ফেলিতে পারে নাই বলিয়া আপশোষ, আর যাহারা তদ্বিপরীত তাহাদের যত রকমের অপবাদ করিতে হয় তাহার বাদ দেন না। যদিও কোন পাণ্ডার দরকার ছিল না তথাপি শ্রীযুত দনু পাণ্ডার ছেলে স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়া আমাদের অনেক তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন, ছেলে মানুষ এখনও বিশেষ পাকিয়া উঠে নাই। বদরিকাশ্রমের পাণ্ডাগণ দেব প্রয়াগে বাস করেন, তাঁহারা হরিদ্বার হৃষীকেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া যাত্রী সংগ্রহ করিয়া থাকেন, সর্ব্ব প্রথমে তাঁহারাই যাত্রিদিগকে পথের সুবিধা অসুবিধা, চড়াই উথরাই সম্বন্ধে এমন মনোমুগ্ধকর বাক্য বলেন যে, তাহা বর্ণনাতীত। তারপর আপনার লোক সঙ্গে দিয়া তাহাকে ভাল দিন দেখিয়া পাঠাইয়া দেন। ক্রমে যাত্রিগণ দেব প্রয়াগে উপনীত হইলে অতি যত্ন ও খাতিরের সহিত বাসস্থান নির্দ্দেশ, আবশ্যকীয় সর্ব্বপ্রকার কার্য্যাদি সম্পাদন, তীর্থ-মাহাত্ম্য ও পর্য্যটনের ফল কি এই সমস্ত শুনাইয়া থাকেন, তৎপরে অবসর মত নিজের মতলব সিদ্ধির জন্য পথের সুবিধা অসুবিধার বিশেষ বর্ণন আরম্ভ করেন। তীর্থ-মাহাত্ম্য-বর্ণনকালীন সর্ব্বপ্রথম দেবপ্রয়াগ, তারপর

বদরিকাশ্রমের পাণ্ডা।

বদরিকাশ্রম, তারপর কেদারনাথ মাহাত্ম্য পর্য্যন্ত শেষ *। কেহ যদি গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন অমনি তদুত্তরে বলেন সর্ব্ব প্রথমে দেব প্রয়াগ হইতে পাঁচ মাইলের একটী বিকট চড়াই আছে, তাতে আবার পথে জলাভাব, এ রকম অনেক চড়াই উথরাই করিতে হয়, রাস্তা ভাল নহে, চটী অত্যন্ত দূরে দূরে অবস্থিত আবার তাহাতে যে সব খাদ্যদ্রব্যাদি পাওয়া যায় তাহা খাবার উপযুক্ত নহে, যদি অবসর পান পথে দুই এক স্থানে ওলাউঠা প্রভৃতি মারী ভয় আরম্ভ হইয়াছে ইত্যাদি অসুবিধা ও ভয়ের কারণ দেখাইতেও বাদ দেওয়া হয় না। প্রত্যেক কথায় বলিবে বদ্রীনাথের পথ গবর্ণমেণ্টের তৈয়ারি চড়াই উথরাই অতিশয় সুখসাধ্য। ইহার কারণ কি কেহ বুঝিতে পারিয়াছেন? কারণ এই যে, পাণ্ডাগণ প্রায় সমস্ত যাত্রীদের সঙ্গে আপনার লোক সঙ্গে দিয়া থাকেন আর ধনী যাত্রী হইলে স্বয়ংই সঙ্গে যাইয়া থাকেন, যদি যাত্রিগণ প্রথমতঃ যমুনোত্তরী ও গঙ্গোত্তরী দেখিতে যায় তাহা হইলে তাহাদের বেশী ভাগ টাকা খরচ হইয়া যাইবে সুতরাং আপন প্রাপ্তিবিষয়ে অনেক কম পড়িয়া যাইবে আর স্বয়ং বা যে গোমস্তা সঙ্গে যাইবে তাহারও তাহাদের সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কষ্ট পাইতে হইবে, এই জন্য নানা রকমের ভয়ভীতি দেখাইয়া যাহাতে যাত্রীরা উক্ত স্থানে না

* দেব প্রয়াগ হইতে গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী যাওয়ার পথ বাহির হইয়া গিয়াছে (ম্যাপ দেখুন) এই দুই স্থানের বর্ণন ভুলেও করিবেন না পাছে যাত্রীরা ঐ দুইটী স্থান দেখিতে যান।

যান তাহার উপায় করেন সর্ব্বশেষে গঙ্গোত্তরী হইতে কেদারনাথ যাইবার পথে এমন অনেক লোক হারাইয়া গিয়াছে যে, আজ পর্য্যন্তও তাহার খবর নাই; সরল বিশ্বাসী যাত্রিগণ পাহাড়ের রাস্তার খবর জানেন না বিশেষতঃ পাণ্ডা মহারাজের কথা সত্য হইবে এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া উক্ত দুই তীর্থস্থানের প্রতি বিহিত প্রকারে প্রণাম ও নিজের শারীরিক অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া তথায় যাইতে নিবৃত্ত হন। যাঁহারা নানা স্থানের পাণ্ডার ব্যবহারাদি দেখিয়া শুনিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে কোন মতেই ঠকিতে হয় না। যাত্রিগণ যখন গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী দর্শনের আশা ত্যাগ করিয়া তাহাদের মতানুযায়ী চলিতে আরম্ভ করিলেন তাঁহাদিগকে প্রত্যহ যতবার সুবিধা পাইবেন বলিতে আরম্ভ করিবেন যে কেদারনাথে অত্যন্ত শীত, ১০।.৫ মাইল বরফের উপর চলিতে হয়, চড়াই অত্যন্ত বিকট, তারপর তুঙ্গনাথের চড়াইতে পা পিছলাইয়া পড়িয়া কত লোক বছরে মারা পড়ে তার সংখ্যা নাই ইত্যাদি। ক্রমশঃ রুদ্র প্রয়াগ * পর্য্যন্ত এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিবে। কেদার-নাথের পাণ্ডাগণও হরিদ্বার কেহ বা দেবপ্রয়াগ পর্য্যন্ত আসেন, তারপর যখন কেদারনাথের পাণ্ডার বর্ণনার কাছে তাহাকে হার মানিতে হইল বা যাত্রিগণ বুঝিতে পারিলেন এই যে তীর্থধামের সমষ্টি স্থানের নাম কেদারখণ্ড এতদধিপতি কেদারনাথকে দর্শন করিতেই হইবে তখন তাঁহারাও বদ্রীনারায়ণের পাণ্ডা

* ম্যাপ দেখুন।

বা গোমস্তার কথার প্রতি অনাস্থা করিয়া অগত্যা কেদারনাথের দিকে যাইতে থাকেন। পথে যদি কোন যাত্রী কোন রকমের একটু অসুবিধার কথা বলেন অমনি বলিয়া উঠিবে কেন আমরা ত পূর্ব্বেই এই সব কথা বলিয়া দিয়াছি! এই ধমক দিতেও বাদ দিবেন না। তারপর তুঙ্গনাথের পথে † চৌবন্তা চটীতে আসিয়া বসিয়া পড়িবে এবং বলিবে বাপ্‌রে কি বিকট চড়াই তাহাতে আবার রাস্তা নাই আপনারা যান আমি সোজা পথে ভীম চটীতে যাইতেছি, আপনারা দর্শন করিয়া তথায় উপস্থিত হইবেন। এই কথা যিনি বিশ্বাস করিলেন তিনি তথায় মাথা ঠেকাইয়া তাহার অনুগমন করিলেন আর যাহার মনোবল আছে তিনি দর্শনে চলিলেন। এই সব বদমাইসি চাল দেখাইবার কারণ পূর্ব্বেও কিছু বলা হইয়াছে আগে কারণটী শুনিলে সকলে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন তাহারা এই রকম করেন কেন? কারণটী এই—যাত্রিগণকে যদি নানাবিধ ভয় দেখাইয়া একদমে বদরীনারায়ণ দর্শনে লইয়া যাইতে পারেন তাহা হইলে টাকা কড়ি (তাহাদের সাধারণ ধারণা এই যে, হিমালয় দর্শন করিতে যে সব লোক আসেন সকলেই অত্যন্ত ধনী। হিমালয়বাসীর যাত্রিগণের প্রতি সম্বোধনসূচক প্রবন্ধ পাঠ করুন) যাহা কিছু সঙ্গে আছে তাহার বিধিমত শোষণ করিতে পারিবেন। অন্য সব স্থান যদি আগে দর্শন করিয়া যান তাহা হইলে আপন অভীষ্ট সাধনে

† ম্যাপ দেখুন।

বিঘ্ন আসিবে। তাঁহারা বদরিকাশ্রমে পৌঁছিয়া প্রথমতঃ অতি যত্ন দেখাইবেন তারপর ধার্মোক্ত বিধিমত কার্য্যাদির দিকে লক্ষ্য থাকুক বা নাই থাকুক বিধিমত শোষণ রীতিটি অবলম্বন করিতে ক্রুটী করিবেন না, এমন কি একেবারে নিঃসম্বল করিতেও কুন্ঠিত হইবেন না। এখন পাঠক পাঠিকাগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন কেন সব যাত্রীদের হিমালয়ের ভিতরের সমস্ত তীর্থ স্থান দর্শন হয় না।

কেদারনাথের পাণ্ডা।

গুপ্ত কাশী * হইতে তিন মাইল পশ্চিমাংশে শোণিতপুর গ্রামে কেদারনাথের পাণ্ডাগণের বাসস্থান, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাঁহারাও রুদ্রপ্রয়াগ, দেবপ্রয়াগ, হরিদ্বার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া যাত্রা সংগ্রহ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অনেকের ব্যবহার বদ্রীনাথের পাণ্ডাদের মত, কিন্তু একটী বিশেষত্ব দেখা গেল যে যাহাদের শীত নিবারণোপযোগী তেমন গাত্র বস্ত্রাদি নাই সেই যাত্রিদিগকে দেওয়ার জন্য পাণ্ডাগণ প্রত্যেকে খুব পুরু পুরু মোটা কম্বল স্বব্যয়ে আপনার কাছে মজুত রাখেন ও যাত্রীদের প্রয়োজনমত উহা যোগাইয়া থাকেন। অবশ্য তাঁহাদের এই সদ্ব্যবহারের জন্য তাহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা দেখাইতে হয় ও তাহাদের কৃত অন্যান্য ব্যবহারাদি ভুলিয়া যাইতে হয়।

গঙ্গোত্তরীর পাণ্ডা।

ধরালীর † সম্মুখস্থ গঙ্গার অপর পারে মুখোবা গ্রামে গঙ্গোত্তরীর পাণ্ডাগণের বাসস্থান। তাহাদের ভিতরেও অন্যান্য তীর্থস্থ পাণ্ডাদের গুণাবলি ক্রমশঃ

* ম্যাপ দেখুন। † ম্যাপ দেখুন।

অধিকার লাভ করিতেছে। এই স্থানের পাণ্ডাগণ সাধারণতঃ গরীব, তদুপরি যাত্রী-সমাগম যাহা হয় তাহার বেশীর ভাগ সাধু সন্ন্যাসীর দল ও সমস্ত দরিদ্র যাত্রী। ইহাদের রাশিতে শনি রাহুর দৃষ্টি যেন অনব.চ লাগিয়া আছে। গরীব বেচারিগণ যে কখন মুক্তি লাভ কা৷িবেন তাহা বিশ্বনিয়ন্তা ভগবানই জানেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এখানে যে সব যাত্রী আসেন তাঁহারা বদ্রীনাথ ও কেদারনাথের পাণ্ডাগণের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া বা প্রকৃত সাহসের উপর নির্ভর করিয়া আসেন।

যমুনোত্তীর পাণ্ডা।

থর্সালি * গ্রামে যমুনোত্তরীর পাণ্ডাগণের বাসস্থান; এই স্থানে যাত্রী-সমাগম গঙ্গোত্তরী অপেক্ষা অনেক কম হইয়া থাকে। ব্যবহারাদি প্রায় গঙ্গোত্তরীর পাণ্ডাদের মত বদমাইসী চাল ক্রমশঃ ঢুকিতেছে, কিন্তু পাকে নাই। এস্থানে এক পাণ্ডাপুত্রের মুখনিঃসৃত কয়টী বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি তাহাতে সর্ব্ব সাধারণে বুঝিতে পারিবেন। আমাদের সহযাত্রী একজন ভদ্রলোক তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর সঙ্গে আসেন। পাণ্ডাপুত্রকে তাঁহার দানাদি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করাতে বলিল "শালা হাম্ লোগোঁকো কুছ্ নেহি দিয়া রাস্তামে মর্ যায়গা" এই ছেলের উক্তিটী এক রকম শিখা কথা ও সরলতা-ব্যঞ্জক বলিয়া আমার বোধ হইল, কারণ বদমাইসীতে পরিপক্ক হইলে এমন কথাটী সরল ভাবে বলিত না একটু রং বেরং করিয়া বলিত।

* ম্যাপ দেখুন।

এই প্রবন্ধটী লিখিবার কারণ আর কিছুই নহে একমাত্র ইহার বিহিত প্রতিকার প্রার্থনা ও পাঠক পাঠিকাগণকে যাবতীয় অবস্থা জ্ঞাপন করা। আমার সহযাত্রীদের দুরবস্থা দর্শনে আমার হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হয়। পূর্ব্বে যাঁহারা তীর্থাদি পর্য্যটন করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের মুখে শুনিতাম, তাঁহারা বলিতেন বাপু হে তীর্থ করা গরীব লোকের কাজ নহে, যাহাদের বেশী টাকা আছে তাহাদের সব তীর্থ হয় ও সব কার্য্য ঠিক মত সম্পন্ন হয়; আর যাহাদের পয়সা কড়ি কম গরিব তাহাদিগকে পাণ্ডাগণ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ত করেনই কোথায় কি ভাল করিয়া দেখাইবার কথা দূরে থাকুক সব স্থানের নাম পর্য্যন্ত শুনায় না। এবার চাক্ষুষ সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া ধর্ম্ম-পরায়ণ জনসাধারণের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, সকলে যেন ইহার বিহিত প্রতিকারের জন্য যত্নপর হইয়া পৃথিবীর মহা কার্য্য সম্পাদন করেন।

চড়াই উথরাই সম্বন্ধে মন্তব্য।

'চড়াই' এবং 'উথরাই' কথা দুটা শুনিতে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে, আর মনে মনে ধারণা হয় যে, পর্ব্বতের নিম্নতল হইতে চড়াই আরম্ভ করিয়া অমনি সোজাসুজি উপরদিকে উঠিতে হইবে এবং তদনন্তর শৃঙ্গটা লঙ্ঘন করিয়া অপর পার্শ্বে উথ-

রাই করিতে হইবে। যাহারা আজীবন পাহাড় দেখেন নাই তাঁহাদের মনের ধারণা ও বিশ্বাস এই প্রকার বটে। আবার যাঁহারা ছোট পাহাড় দেখিয়াছেন, যথা—চন্দ্রনাথপর্ব্বত, জামালপুরের পাহাড়, বৈদ্যনাথের পাহাড়, গয়ার পাহাড় ও বিন্ধ্যশৈল ইত্যাদি; তাঁহারা মনে করেন হিমালয় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী তাহার মধ্যপ্রদেশস্থ তীর্থস্থানগুলি দেখিতে হইলে অনেক উচ্চ-পর্ব্বতশ্রেণীর শৃঙ্গদেশ লঙ্ঘন করিতে হইবে। এক সময়ে হিমালয় পর্ব্বতের অন্তর্ব্বর্ত্তী তীর্থস্থান দর্শন করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার ছিল বটে, তখন কোন পথ ঘাট ছিল না ফলমূল ব্যতীত কোন রকমের খাদ্যদ্রব্যাদিও পাওয়া যাইত না, কোনও প্রকারের যানবাহনাদি মিলিত না, হিমালয়-যাত্রিদিগকে অনেক কষ্টসহ্য করিয়া তীর্থাদি দর্শন করিতে হইত, এইরকম কিম্বদন্তী আছে যাঁহারা হিমালয়-দর্শনাভিলাষী হইয়া হরিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইতেন তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার কষ্টসহিষ্ণু কিনা এইপ্রকার পরীক্ষা করা হইত। যাঁহারা তাহাতে উত্তীর্ণ হইতেন তাঁহাদিগকে জীবনধারণোপযোগী ফলমূলাদি চিনাইয়া দেওয়া হইত। সেই সময়ের লোকের ভগবৎপ্রেম, নিষ্ঠা, আত্মসমর্পণ ও নির্ভরতা এত অধিক পরিমাণে ছিল যে, তদ্দারা হিমালয়স্থ উন্নতসাধু মহাত্মাদের কৃপালাভে সমর্থ হইতেন্ এবং জীবন চরিতার্থ করিতে পারিতেন, তখন আবার অতিদীর্ঘ সময় লাগিয়া যাইত। হিমালয়ে লোকজনের বাস আধুনিক, খুব সম্ভব পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য জগদ্গুরু শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য স্বামীজিউ মহারাজের চারি-

ধামে চারিটী মঠস্থাপনের পর হইতে হইয়াছে; বর্ত্তমান হিমালয়বাসী পণ্ডিত-মণ্ডলীদের নিকট আর একটী জনশ্রুতি শোনা-যায়, তাঁহারা বলেন পূর্ব্বে আমাদের আর্য্যঋষিগণ ব্রাহ্মমূহুর্ত্তে গোমুখীতে স্নান তর্পণাদি সমাপন করিয়া কেদারনাথ ও বদরিনারায়ণ দর্শনান্তে স্ব-স্ব আশ্রমে যাইয়া মধ্যাহ্নকৃত্য করিতেন। পূর্ব্বকালে কেদারনাথ ও বদরিনারায়ণের পূজা এক পূজারি ব্রাহ্মণ দ্বারা নিষ্পন্ন হইত। এখন কালপ্রভাবে তাঁহারা আপন আপন গুহাবাসী হইয়াছেন কখন যে উক্তকার্য্য সম্পন্ন করেন তাহা কেহ বলিতে পারে না। তাঁহাদের সোজাপথ জানাছিল অথবা আপনশক্তি প্রভাবে সত্বর ঐ সবকার্য্য শেষ করিতে পারিতেন। বর্ত্তমান সময়ে কি গঙ্গোত্তরী, কি যমুনোত্তরী, কি কেদারনাথ,কি বদরিকাশ্রম সকলস্থানে যাওয়া আমাদের জন্য অতি সুন্দর চড়াইতে ক্রম-উচ্চ ও উথরাইতে ক্রম-নিম্ন সুখসাধ্য রাস্তা তৈয়ার হইয়া গিয়াছে। একমাত্র যমুনোত্তরীর রাস্তা ভিন্ন (যমুনোত্তরি-পথে চটীশীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করুন) সমস্ত পথেই ধর্ম্মশালা চটী ইত্যাদি তৈয়ার হইয়া গিয়াছে; এমন কি অশীতিপর বৃদ্ধও চেষ্টা করিলে সমস্তস্থান পদব্রজে দেখিয়া আসিতে পারেন। কেবল চারিটীমাত্র রাস্তা যথাঃ—ভাটোয়ারী হইতে ত্রিযুগীনারায়ণে আসিতে, উখীমঠ হইতে তুঙ্গনাথ হইয়া লালসাঙ্গায় আসিতে, বিজনির চড়াই ও মসূরির চড়াইতে * পর্ব্বত শৃঙ্গদেশ লঙ্ঘন করিতে হয়, আর সমস্ত

* ম্যাপ দেখুন।

রাস্তা গঙ্গার কিনারা দিয়া বা যেখানে একটু চড়াই আছে তথায় পর্ব্বতের মধ্যদেশ দিয়া ক্রম-উচ্চ ও নিম্নভাবে তৈয়ার করা হইয়াছে। যে কয়টী পর্ব্বতশৃঙ্গ লঙ্ঘনের কথা বলা হইল তাহা যে একদমে সোজা উপরের দিকে উঠিতে বা নামিতে হইবে তাহা নহে, সে সমস্ত রাস্তাও ক্রম-উচ্চ ও ক্রম-নিম্নভাবে প্রস্তুত, দুইমাইল তিনমাইল অন্তর চটী, পরিষ্কার জলের নির্ঝ-রিণী, বিজনীর চড়াইতে জলাভাব বলিয়া জলসত্র ও সকল চটীতে খাবারের দোকানাদি আছে। বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা আর একটী বিশেষ সুবিধা হইয়াছে যে, সকল চটীতে যান বাহনাদির * বন্দোবস্ত আছে হঠাৎ কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাহাকে আপন সাথী-ব্যক্তিগণকে ত্যাগ করিতে হয় না। পূর্ব্বে যে কয়টী শৃঙ্গদেশের নাম করা গেল তাহাদের উপরি-ভাগে উঠিলে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপস্থিত হয়, দেরাতুনের পথে মসূরিশৈলে উঠিলে দূরবর্ত্তী গ্রামের দৃশ্যগুলি অতীব মনোরম দেখা যায়। পৌমালির চড়াইতে উঠিয়া যে পর্ব্বত শৃঙ্গ-দেশস্থ পথটী আছে সেইটী অতিক্রম কালীন তাহার দুই-পার্শ্বে উচুনিচু অসংখ্য পর্ব্বতশৃঙ্গ দৃষ্ট হয়, তাহা দেখিয়া বোধ হয় যেন নগাধিপতি হিমালয় আপনার দাম্ভিক ও কলহ-পরায়ণ পুত্রগণকে মধ্যভাগে একটী উচ্চপ্রাচীর দিয়া যাহাতে পরস্পরে পরস্পরের মুখ দেখিতে না পারে এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। এই রাস্তার বিশেষ বিবরণ

* যানবাহন-শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করুন।

"ভাটোয়ারি হইতে ত্রিযুগীনারায়ণ" শীর্ষক-প্রবন্ধ পাঠ করুন। হিমালয়ের ভিতরে যতগুলি তীর্থস্থান আছে প্রায় সমস্তই উপত্যকা ভূমিতে অবস্থিত কেবলমাত্র তুঙ্গনাথ পর্ব্বতশৃঙ্গে আর ত্রিযুগীনারায়ণ পর্ব্বতগাত্রে অবস্থিত। পূর্ব্বে চড়াই উথরাইতে অনেক স্থানে পথ ছিল না কোথায়ও বা গাছের শিকরাদি ধরিয়া উঠিতে হইত এখন সেই সমস্তই দূরীভূত হইয়া গিয়াছে। সমস্ত পথগুলিতে রাস্তা পরিদর্শক ও কুলী-মজুর আছে কোথায়ও হঠাৎ রাস্তা ভাঙ্গিয়া গেলে মেরামত করিবার জন্য লোক মজুত আছে তাহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকল স্থান দেখিতেছে। হরিদ্বার হইতে বদরিনারায়ণ হইয়া আরও উপরে ষোল মাইল পর্য্যন্ত পাবলিক্‌ওয়ার্কস্‌এর রাস্তা আছে ও প্রতি দশমাইলে সরকারী ডাকবাঙ্গলা আছে। পাহাড়ের ভিতরে সমতল রাস্তা হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে বর্ত্তমান সময়ে যে সকল রাস্তা তৈয়ার হইয়াছে তাহাতে চলা তত কষ্টসাধ্য বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় তাঁহার কৃত হিমা-লয়ে যে বিকটভাবে চড়াই উৎরাই সম্বন্ধে বর্ণন করিয়া গিয়া-ছেন এখনকার রাস্তা দেখিলে সব অলীক বলিয়া বোধ হয়। যাহারা বিশ্বপ্রেমিক ও ভগবৎপ্রেমে মাতোয়ারা এবং সদাসর্ব্বদা ভগবৎ সৃষ্টির নূতন স্থানাদিদর্শনাভিলাষী তাহাদের নিকট চড়াই উৎরাই জনিত কোন রকমের সুবিধা অসুবিধা কিছুই অনুভূত হইবে না, তবে যাহারা সুখকাঙ্ক্ষী তাহাদের জন্য ও সর্ব্বপ্রকার যানবাহনাদির ব্যবস্থা আছে। সর্ব্বসাধারণের

প্রতি আমার এই অনুরোধ যে তাহারা কেবল-মাত্র আপনকক্ষে তাকিয়ায় হেলান দিয়া যাহা প্রবাদের ন্যায় শুনিবেন তাহা বিশ্বাস করিয়া ভীত ও পশ্চাৎপদ হইবেন না। একবার বিশ্বস্রষ্টার অসীম প্রেমে মাতিয়া অগ্রসর হউন দেখিতে পাইবেন এই অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত শক্তিমধ্যে আপনার কত অভিজ্ঞতা আছে ও তাহার সীমা কতদূর। পথে চলিতে চলিতে নিবিড় অরণ্যানীর নিভৃততম প্রদেশ হইতে হরিণ, পিক, বৌ কথা কউ, হারিৎ, ঘুঘু প্রভৃতির সুমধুর ধ্বনিতে মনে এমন একটী অপূর্ব্ব আনন্দ লহরী ছুটাইয়া দিবে যে কতখানি পথ চলিয়া গিয়াছি তাহা চড়াই কি উথরাই কিছুই মনে থাকিবে না। আবার পর্ব্বত মধ্যদেশ হইতে বা উপরে উঠিয়া দূরবর্ত্তী শৃঙ্গসমূহে তুষার স্তূপের সহিত সাদা ও কাল রঙ্গবিশিষ্টা মেঘরাণীর সহিত বৃদ্ধ নগাধিরাজের অপূর্ব্ব মিলন জনিত প্রেমাশ্রু বর্ষণ দেখিলে মনে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপস্থিত হইবে। আবার কোথাও উত্তুঙ্গ শৃঙ্গদেশে বিধূনিত তুলারাশির মত মেঘগুলি এমন ভাবে জড়িত হইয়াছে যে দূর হইতে উহা একটী বৃহৎ পুষ্করিণী বা দিঘী বলিয়া পথিকের ভ্রম উপস্থিত করিয়া দিবে আবার একটু রৌদ্রের তাপ সঞ্চারিত হইবামাত্র কোথায় সেই মেঘমালা মিলাইয়া যাইবে তাহার সন্ধানও পাওয়া যাইবে না। এই সকল দেখিতে দেখিতে মনে হয় অতিবৃদ্ধ নগাধিরাজ হিমালয় অনন্তকাল পর্য্যন্ত সমাধিস্থ যোগীর মত কত ঝড়, বৃষ্টি, কঙ্কাপাত আপনার শিরে সহ্য করিতেছেন ও তুষারাদিতে আবৃত হইয়া কত সাজে সজ্জিত

হইতেছেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোন রকমের বিকৃতি নাই, সদাসর্ব্বদা ধীর ও স্থির। মনে হয় ইহাতে জগৎবাসীকে যেন শিক্ষা দিতেছেন যে, এই বিশ্ব জগতে যিনি সর্ব্বংসহা হইতে পারিবেন অবশ্যই তিনি জগৎপূজ্য হইতে পারিবেন ও সর্ব্বকালে পরমানন্দ ভোগ করিয়া অনন্ত মুক্তি লাভে সমর্থ হইবেন। এই প্রকারে মনে যে কত অনন্ত ভাবের উদয় হইবে তাহার সংখ্যা নাই। তাই আবার পাঠক পাঠিকাগণকে অনুরোধ করিতেছি আসুন, একবার সৃষ্টির অপূর্ব্ব লীলা ও বিশ্ব-শিল্পির অনির্ব্বচনীয় অনুপম শিল্পকলা দর্শন করিয়া আপন প্রাণ মন চরিতার্থ করি। যিনি প্রকৃতপক্ষে প্রেমিক তিনি প্রকৃতির এই মাধুর্য্য দেখিতে দেখিতে আত্ম বিস্মৃত হইয়া পড়িবেন, তখন একস্থানে কত কাল গত হইয়া গেল তাহার প্রতি লক্ষ্য করিতেই পারিবেন না। চড়াই উথরাইতে যে সকল কাঠিন্য ছিল সেই সমুদয় সদাশয় মহাত্মাগণের সাহায্যে ও চেষ্টায় দূরীভূত হইয়া গিয়াছে। তাই বলিতেছি কি ধনী, কি দরিদ্র, কি বৃদ্ধ, কি যুবা সকলেই আসুন সুখে স্বচ্ছন্দে স্ব স্ব পিতৃপুরুষ আর্য্য ঋষিগণের সাধন ভজনের স্থান ও তাঁহাদের স্থাপিত দেবদেবী প্রভৃতি দর্শন করিয়া নিজ নিজ জীবন কৃত-কৃতার্থ করুন। দেখিবেন প্রকৃতি দেবীর অপূর্ব্ব লীলাদি দর্শনে প্রাণ মন পুলকিত হইয়া আত্মহারা হইয়া যাইবেন ও কি বলিয়া তাহার বর্ণনা ও প্রশংসা করিবেন তাহা খুজিয়া পাইবেন না। যে দিকে তাকাইবেন সকলই অনুপম, সকলই অপূর্ব্ব, সকলই নূতন।

পর্ব্বতোপরি লাঠির দরকার ও উপকারিতা।

সাধারণ সমতল রাস্তায় চলিবার সময় লাঠির ব্যবহার বিশেষ দরকারে আসে বলিয়া বোধ হয় না, কেবল হস্তশোভা বর্দ্ধন করে মাত্র। তবে বিনা লাঠির সাহায্যে অন্ধ খঞ্জ বৃদ্ধ লোক চলিতে পারে না, কিন্তু পার্ব্বত্য প্রদেশীয় রাস্তায় চলিতে হইলে লাঠির একান্ত প্রয়োজন দেখা যায়। চড়াই উথরাই করিতে বা বরফের উপর দিয়া চলিবার সময় লাঠি একটী লোকের সমান সাহায্য করে। এ স্থলে আমাদের হস্তশোভা-বৃদ্ধিকারী লাঠিতে কোন কার্য্য হয় না, এখানকার ব্যবহারের জন্য খুব মজবুত ও অন্ততঃ আপনাপন উচ্চতা প্রমাণ লাঠিতে বেশ কাজ পাওয়া যায়। হিমালয় প্রদেশে প্রবেশ করিবার যতগুলি পথ আছে প্রায় সর্ব্ব স্থানে তদুপযোগী লাঠি পাওয়া যায়। পথে চলিতে চলিতে সহযাত্রিগণ যদি পিছে পড়িয়া যান এবং তাহাদের জন্য চারি পাঁচ মিনিটের জন্য দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে হইলে লাঠি গাছির উপর ঐ সময়ের জন্য ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া বেশ আরাম করা যায়। হিমালয়ের যে অংশটী নাতিশীতোষ্ণ তথায় তেজবল বৃক্ষের এক প্রকার লাঠি হয়, এই প্রকার কিম্ব-দন্তী আছে যে ঐ গাছের লাঠি ধারণ করিলে শরীরে তেজ ও বলের বৃদ্ধি হয়. গাছগুলির সারা গায়ে কণ্টক পরিপূর্ণ ও খুব শক্ত। ঐ গাছের লাঠিগুলিতে কাঁটাগুলি কাটিয়া রং করিয়া লইলে বাজারের অতি উচ্চ দরের লাঠির মত বোধ হয়। পাহাড়ী

লোকদের কাছে ও যাহারা অনেক কাল হইতে হিমালয়ে বাস করিতেছেন তাঁহারা বলেন উক্ত গাছের সরু ডাল দিয়া দন্ত মার্জ্জন করিলে দন্তশূল প্রশমিত হয় ও ফলগুলি দ্বারা মুখের রুচি হয়। প্রায় সকল হিমালয়যাত্রী চিহ্নস্বরূপ উক্ত গাছের লাঠি লইয়া যাইয়া থাকেন। ঐ লাঠি রাস্তার ধারে পাহাড়ী বালকেরা বিক্রয় করিতে আনে। অনেক যাত্রী পথিপার্শ্বস্থ স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া লন।

হিমালয় ভ্রমণের সময়।

যাঁহারা হিমালয়স্থ তীর্থ-দর্শনাভিলাষী হইয়া হিমালয়ে প্রবেশ করেন, তাঁহাদের কোন্ সময়ে প্রবেশ করিলে কি রকম সুবিধা হইবে তাহার বিশেষরূপে আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। হিমালয়ের যে স্থানে সাধারণতঃ তীর্থ স্থানগুলি অবস্থিত আছে, বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত তাহার প্রায় সমস্ত তুষারে আবৃত থাকে। সূর্য্যদেব যতই উত্তর দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন ততই বরফ গলিতে থাকে। ঐ সকল স্থানে কোন্ সময়ে যাওয়া সুবিধাজনক তাহার বিশেষ বিচার ও আলোচনা করিতে হইলে প্রথমতঃ যাত্রিদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে হয় যথা (১) ভগবৎ প্রেমে মাতোয়ারা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যদর্শনাভিলাষী অথচ কষ্টসহিষ্ণু (২) সুখাকাঙ্ক্ষী অথচ ধর্ম্মপ্রাণ (৩) সাধারণ কষ্ট সহিষ্ণু অথচ সুবিধা অসুবিধার প্রতি লক্ষ্যকারি। প্রথম শ্রেণীর লোকদের যাত্রার আরম্ভে যাওয়া উচিত। বৈশাখ

মাসের শুক্লা অক্ষয়া তৃতীয়া বা তাহার পর যে কোন শুভ তিথিতে বদরিনারায়ণের ও গঙ্গোত্তরীতে গঙ্গাদেবীর মন্দিরের দরজা খোলা হয়, তাহার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে কেদারনাথের ও চারিদিন পূর্ব্বে তুঙ্গনাথদেবের মন্দিরের কপাট খোলা হয়। ঐ সকল মন্দিরে যে দিন দরজা বন্ধ হয়, সেই দিনের প্রজ্জ্বলিত দীপশিখা দরজা খোলার দিন দৃষ্ট হয়। শাস্ত্র মতে তাহা দর্শন করা মহা পূণ্যের কার্য্য। যাত্রার প্রারম্ভে পথের সমস্ত চটীতে দোকান পাঠ খুলিতে আরম্ভ করে মাত্র, অনেক স্থলে সাধারণ চটী খোলাই হয় না, বড় প্রসিদ্ধ চটীতে দুই তিন খানি করিয়া দোকান খোলে, দ্রব্যাদির মূল্যও একটু চড়া থাকে, জল-খাবারের উপযোগী মিষ্ট দ্রব্যাদি এক রকম মিলে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শীত, দেশের মাঘ মাসের মতই থাকে। ধামের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ প্রায় বরফে আবৃত থাকে, কিন্তু ঐ সময়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতীব মনোরম, দর্শন করিতে করিতে প্রাণ মন পুলকিত হইয়া উঠে, শীতের পর তুষারমুক্ত স্থান গুলিতে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও সুগন্ধ বিশিষ্ট ফুলসমন্বিত চারা গাছগুলির বর্ণনাতীত শোভা, বিশ্বস্রষ্টার অপূর্ব্ব শিল্প-কৌশল প্রকাশ করিতেছে। প্রকৃতি দেবীর মনোরম নৈসর্গিক শিল্পিকলারূপী পর্ব্বতের শৃঙ্গে বিশাল বরফ স্তুপ, উপত্যকা ভূমিতে ছোট ছোট বরফের পাহাড়, নদীর উপর বরফের সেতু, তন্নিম্নদেশ দিয়া নদীর প্রবাহাদি দর্শনে আপনার সত্তা ভুলিয়া যাইতে হয়। তুঙ্গনাথের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গদেশে উঠিলে বোধ হয়

মহারাজাধিরাজ তুঙ্গনাথ ধীর শান্ত ভাবে চতুর্দ্দিকস্থ আপনার সামন্তরাজস্বরূপ ছোট ছোট পর্ব্বত শ্রেণীগুলি কি প্রকারে স্ব স্ব সীমা রক্ষণান্তে আপনাপন মর্য্যাদা রক্ষণ করিতেছেন তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছেন, আবার কখনও মনে হয় পাঠশালার গুরু মহাশয়ের ন্যায় তিনি তাহার উন্নত গ্রীবা উত্তোলন করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকস্থ ছাত্র বা শিষ্যমণ্ডলী প্রতি স্বস্নেহদৃষ্টি রক্ষা করিতেছেন। যাহারা ধীর ও শান্ত ভাবে আপন কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতেছে তাহা দেখিয়া অতিশয় আনন্দ প্রাপ্তি দরুণ ভাবাবেশে ধীর স্থির হইয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিলে তাঁহাকে মহা সমাধিস্থ যোগীরাজের মত বোধ হয়। আবার কখনও মনে উদয় হয় বৃদ্ধ তুঙ্গনাথকে বেষ্টন করিয়া চারিদিকে নাত জামাইগণ হেট মুখে মৃদু মধুর হাসির সহিত আহার করিতেছেন আর তিনি তাহা দেখিয়া পুলকিত অন্তরে ধীর শান্ত ভাবে তাহাদিগের জীবনের ভাবী লক্ষ্য স্থির করিয়া দিতেছেন ও অদূরবর্ত্তী শুভ্র মস্তক পর্ব্বত-শৃঙ্গগুলি বৃদ্ধ তুঙ্গনাথের আনন্দে আনন্দিত হইয়া শত ধারে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতেছেন, এই প্রকার কত রকমের ভাব মনে জাগরিত হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। যমুনোত্তরী, গঙ্গোত্তরী, কেদারনাথ, তুঙ্গনাথ, বদ্রীনাথ প্রভৃতির শৈত্যাতিশয্যে যখন শরীর জড়সড় হয় তখন সর্ব্বপ্রথম যাঁহারা ঐ সকল তীর্থ স্থাপন করিয়াছেন তাঁহারা যে কত শক্তিসম্পন্ন ছিলেন তাহা ভাবিয়া কুল পাওয়া যায় না। প্রথম শ্রেণীর যাত্রিগণকে প্রথমতঃ যমুনোত্তরী হইয়া গঙ্গোত্তরী তথা হইতে কেদারনাথ, কেদারনাথ

হইতে তুঙ্গনাথ হইয়া বদরিকাশ্রমে যাওয়া বিধেয়* ; তাহা হইলে তাহারা প্রাকৃতিক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যপূর্ণ স্থান দেখিয়া আপনাপন প্রাণ মন পুলকিত করিতে পারিবেন। আর তাঁহা-দিগকে অন্ততঃ চৈত্র পূর্ণিমার পরই হৃষীকেশ হইতে যাত্রা করিতে হইবে। নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে তদনুযায়ী কষ্টও সহিতে হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রিগণের পক্ষে বৈশাখী পূর্ণিমার পরে বা জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে হৃষীকেশ বা দেরাডুন দিয়া হিমালয়ে প্রবেশ করা বিধেয়। তখন পথের কোনও স্থানে বরফাদি থাকে না, তাঁহারা প্রথমোক্ত পথে চলিতে পারেন অথবা বেশী পরিমাণে আয়াস চাহিলে দেরাডুন হইতে ধরাসু দিয়া যমুনোত্তরী আবার ঐ রাস্তায় ফিরিয়া আসিয়া গঙ্গোত্তরী, তথা হইতে টিহরি, শ্রীনগর, রুদ্র প্রয়াগ দিয়া কেদার-নাথ, তথা হইতে বদরিকাশ্রমে যাইতে পারেন† ; কিন্তু উক্ত প্রকারে অধিক দিন লাগিয়া যাইবে ও সঙ্গে যে কুলী মুটে ইত্যাদি থাকিবে তজ্জনিত খরচও অত্যন্ত বেশী পড়িবে কিন্তু সকল রাস্তা দিয়াই কাণ্ডী ঝাঁপান চলাচল করিয়া থাকে ‡ আর তখন সর্ব্বত্র চটী খোলা হইয়া থাকে, খাদ্যদ্রব্যাদি ও জলখাবারের উপযুক্ত মিষ্ট দ্রব্যাদি সমস্ত চটীতে পাওয়া যায়। সর্ব্বোপরি সকল ধামেই শীত কমিয়া যায়, পর্ব্বতের শৃঙ্গদেশ ভিন্ন কোন

* পথের বিবরণ জন্য ম্যাপ দেখুন।

† ম্যাপ দেখুন।

‡ যান বাহানাদি শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করুন।

নীচু স্থানে বরফ পাওয়া যায় না, প্রায় সমস্ত নদীর জল ঘোলা হইয়া যায়। আর যাহারা তৃতীয় শ্রেণীর দর্শনকারী তাঁহাদের কথা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাঁহারা মধ্য ও শেষ ভাগে তীর্থাদি দর্শন করিতে যান। মোটের উপর সকল স্থানগুলিও দেখা চাই অথচ বিশেষ কষ্টও পাইতে না হয়, জিনিষ পত্রাদিও একটু সস্তা দরে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ তাহাদের তীর্থদর্শন অনেকটা তাহাদের অবসরের উপর নির্ভর করে। হিমালয়ে তীর্থযাত্রা বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া হইতে আরম্ভ করিয়া ছয়মাস কাল পর্য্যন্ত থাকে, দেওয়ালি পর্ব্বই শেষ সীমা। তন্মধ্যে প্রথম ও মধ্যভাগে দেশী যাত্রি-সমাগম বেশী দেখা যায়, মধ্যভাগের শেষ হইতে শেষ সময় পর্য্যন্ত সাধু বৈষ্ণব ও স্থানীয় যাত্রীর ভাগ বেশী দেখা যায়। শেষোক্ত দলের মধ্যে যাহারা যে পথ সুবিধাজনক মনে করেন তাহারা সেই পথেই চলিয়া থাকেন। বর্ষাকালে অনেক যায়গায় রাস্তা ভাঙ্গিয়া যায় বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মেরামত করিবার লোকের বন্দোবস্ত আছে।

পর্য্যটনকারীর সতর্কতা।

হিমালয়-ভ্রমণকারীকে কি কি বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে তাহার অবগতির জন্য নিম্নে কতকগুলি নিয়মাবলি দেওয়া গেল। আপনাপন শরীরের অবস্থা বুঝিয়া এই সমস্ত প্রত্যেককে পালন করিতে হইবে। হিমালয়-ভ্রমণো-

পযোগী পরিচ্ছদের দরকার*। প্রত্যুষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে জলযোগের ব্যবস্থা ও আহার্য্য সম্বন্ধে বিচার।† আপন শক্তিমত পথ চলা উচিত। বরফের উপর চলিতে লাঠি দ্বারা গুথো দিয়া চলিবে। নগ্নপদে পথ চলিবে না। বেশী ঠাণ্ডা জলে স্নান করিবে না। কোন নদীতে বেশী জলে নামিয়া স্নান করিবে না। পথ চলিতে জলপান করিতে হইলে খালি পেটে পান করিবে না। গঙ্গাজল আবশ্যক বোধে গরম করিয়া বা কতক্ষণ পাত্রে ধরিয়া রাখিয়া পান বিধেয়। বেশী মাত্রায় টক, মিষ্ট, তীক্ষ্ণ ও রুক্ষ দ্রব্য সেবন নিষেধ। বাজি রাখিয়া পথ চলিবে না ও আহার করিবে না। যাঁহারা সকাল বৈকাল দুই বেলা চলিতে চান তাহাদের প্রাতে চারি ঘণ্টা ও বৈকালে দুই তিন ঘণ্টা পথ চলা উচিত। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে স্নিগ্ধকর দ্রব্য আহার বিধেয়। বাসি কোন জিনিষ যতদূর পারা যায় না খাওয়াই উচিত। গাছতলায় ও ভিজে সেঁথ সেঁথে যায়গায় শয়ন করিবে না। যেস্থানে ভাল ঘৃত পাওয়া যায় তথা হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখা বিধেয়। রাত্রি-ভাগে আলোর জন্য আপন বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে। যেখানে সেখানে অপরিচিত গাছের ডালে দন্তধাবন নিষিদ্ধ। এতদ্-সম্বন্ধে স্ব স্ব বন্দোবস্ত রাখাই উচিত। সাময়িক চা পান ও নেশা সেবনের দ্বারা স্বাস্থ্য হানির সম্ভাবনা। কোন পাহাড়ী

* ঐ শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করুন।

† ঐ শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করুন।

সাধুর সহিত বসিয়া কোন রকমের নেশা করিবে না। একা পথ চলিবে না। রাত্রিকালে পথ চলা নিষিদ্ধ। আপন শক্তি বুঝিয়া কাণ্ডি বা ঝাপানের ব্যবস্থা করা ভাল। প্রত্যহ ব্যবহার্য্য বস্ত্রাদি রৌদ্রে দেওয়া উচিত সুবিধা মত পরিধেয় বস্ত্রাদি সাবানাদি ক্ষার দ্বারা ধৌত করা বিধেয়। সাধারণ পেটের অসুখ, সর্দ্দি ও জ্বর ইত্যাদি নিবারণোপযোগী ঔষধাদি সঙ্গে রাখা কর্ত্তব্য। অর্দ্ধ সিদ্ধ বা কাঁচা কোন জিনিষ খাওয়া উচিত নহে। এক গাছি লাঠি সঙ্গে রাখা কর্ত্তব্য। বরাবর পথ না চলিয়া বিশেষ স্থানে দুই তিন দিন বিশ্রাম করা উচিত। আপন শক্তি মত জিনিষ পত্রাদি সঙ্গে রাখা ভাল। সহযাত্রীদের মধ্যে কাহারও শরীর অসুস্থাদি হইলে তাহাকে ফেলিয়া যাওয়া উচিত নহে। বেলা থাকিতে চটীতে আশ্রয় লওয়া উচিত, আহারান্তে মুখশুদ্ধির ব্যবস্থা স্ব স্ব অভিরুচি মত সঙ্গে থাকা বিধেয়। যাঁহারা নেশা করেন তাঁহাদের আপনাপন বন্দোবস্ত রাখিতে হয়। জ্বালানী কাষ্ঠ দ্বারা অন্নযষ্টির কার্য্য করিবে না। মোটের উপর যাহাতে স্বাস্থ্য হানি ঘটিবে এরূপ দ্রব্যাদি আহার বা ব্যবহারাদি করিবে না, সকলকেই আপন স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। চিঠি পত্রাদি লিখিবার জন্য আপন বন্দোবস্ত থাকা উচিত। চটীতে বহুদিনের তৈয়ারি মিষ্ট দ্রব্য পড়িয়া থাকে তাহা ক্ষুধার চোটে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইলেও গ্রহণ করিবে না। প্রত্যেক চটীতে মাছির সংখ্যা অতি বেশী, সর্ব্বত্রেই খাদ্য-দ্রব্য ঢাকা দেওয়া কর্ত্তব্য।

হিমালয়-পর্য্যটনোপযোগী সম্ভার।

হিমালয়-ভ্রমণকারি প্রত্যেক ব্যক্তির হিমালয়ের শীতাদি নিবারণোপযোগী পরিচ্ছদ ও নিত্য নৈমিত্তিক আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি রাখিতে হইবে। মোটামুটী যাহা দরকার নিম্নে তাহাদের নাম দেওয়া গেল। যাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছুক তাহাদের অবগতির জন্য এই তালিকা প্রস্তুত করা হইল। সাধারণ পথে চলিবার জন্য নাল বান্ধান বা সাধারণ জুতা, বরফের পথে চলিবার জন্য দড়ির তলার জুতা, হাঁটুর উপরে উঠে এমত মোটা মোজা, অথবা সাধারণ মোজা ও পটী (ইহা দ্বারা জঙ্গলী পোকার কামড় হইতে পা বাঁচে) সাধারণ কাপড় জামা, গেঞ্জি, ছাতা, (এই সকল যতদূর পর্য্যন্ত গরম অনুভূত হইবে তথাকার জন্য) শীতের উপযোগী পশমের গেঞ্জি বা তুলো ভরা জামা, পশমী কোট, গরম শীত কাপড়, মাথার জন্য পশমী টুপী বা পাগড়ী, এক গাছি লাঠি, বিছানার উপযোগী গরম কম্বল, বিছানার চাদর, পাতলা বালিশ, শীত-নিবারণোপযোগী মোটা কম্বল বা লেপ, হাতের দস্তানা। আলোর জন্য মোম বাতি, লণ্ঠন, দেয়-শলাইর বাক্স, চিঠি পত্রাদি লিখিবার জন্য দোয়াত, কলম, কাগজ, কার্ড, পেন্সিল, ব্লটীং, লেফাফা, ডাকঠিকিট ইত্যাদি। জলপাত্র একটী। যাহারা নেশা করেন তাহাদের তদুপযোগী বিশেষ সম্ভার রাখিতে হইবে। টাকা কড়ি রাখিবার বন্দোবস্ত যথা থলিয়া ইত্যাদি, যাহাদের গেঞ্জির পায়জামা থাকে তাহাদের বেশ

সুবিধা হয়। একখানা মোটা চাকু, রুটী বা লুচি বেলুনি, চিম্‌টা, একখানা চাটু (অন্যান্য জিনিষ পত্রাদির জন্য 'চটীতে অবস্থিতির নিয়ম, ইত্যাদি' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করুন।) যাহারা মাটীতে বিছানা পাতিয়া শুইতে পারেন না তাহাদের খাটের দরকার (যে খাটগুলি একটী বাণ্ডল করিয়া লওয়া যায়)।

যান ও বাহন।

হিমালয় প্রদেশে আমাদের দেশের মত পাল্কী, ডুলি, গো-শকট বা অশ্বযান প্রভৃতি কোন প্রকারের যান পাওয়া যায় না, তথায় যাইতে কাণ্ডী, ঝাঁপান বা দাণ্ডি প্রভৃতি যান বা পর্ব্বতোপরি চলনশীল অশ্বারোহনে যাওয়া যায়*। ঐ সকল যানাদি যাত্রাকালীন হরিদ্বার, হৃষিকেশ, দেরাডুন প্রভৃতি স্থানে সদা সর্ব্বদা পাওয়া যায়। সঙ্গের জিনিষ পত্রাদি-বহনশীল কুলীও ঐ সব স্থানে সকল সময়ে মজুত থাকে। পথে যদি কোন যাত্রি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন তিনি কোন এক চটাতে পৌঁছিতে পারিলে বা কিছুকাল তথায় বসিয়া থাকিলে কাণ্ডী ঝাঁপানাদির বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারেন। ঐ সকল বহনকারীরা সমস্তই পাহাড়ী। তাহারা সকল সময়ে আপনাপন কাণ্ডী বা ঝাপান সহ এক চটা হইতে অন্য চটাতে যাতায়াত করে। আর কোন চটা হইতে উক্ত যানাদির বন্দোবস্ত করিতে হইলে চটীর চৌধুরী বা প্রধানকে বলিলেই সব ঠিক করিয়া

* চিত্র দেখুন।

দিবে। পুস্তকশেষে কাণ্ডী ও ঝাঁপানের চিত্র দেওয়া গেল। কাণ্ডী একজন কুলি পিঠে করিয়া লইয়া যায় আর ঝাঁপান চারিজন কুলিতে কাঁধে করিয়া যায়। ঝাঁপানের মধ্যে যে গুলি দেরাডুনে পাওয়া যায় তাহাতে বসিতে বেশ আরাম আছে। কুলির বেতন দৈনিক বার আনা হইতে এক টাকা পর্য্যন্ত। বিশ্রাম দিনের বেতন চারি আনা। ঘোড়া ও দাণ্ডি সাধারণতঃ দেরাডুনে সুবিধামত পাওয়া যায়।

জলযোগের ব্যবস্থা ও আহার্য্য বিষয়ে বিচার।

হিমালয়-ভ্রমণের সময় প্রত্যেক ব্যক্তিকেই বিশেষরূপে প্রাতে ও বৈকালে জলযোগের ব্যবস্থা এবং মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে আহারের বন্দোবস্ত বিচার পূর্ব্বক করা উচিত। যাঁহারা বলেন পূজাপাঠ ব্যতীত সকাল বেলা জলযোগ কি করিয়া হইতে পারে? তাহার উত্তর এই যে—যাঁহারা পূজা পাঠ করিবেন তাঁহাদের সেই সময়টা সকাল বেলায় পাঁচটা হইতে ছয়টার মধ্যে সম্পন্ন করিয়া জলযোগ করিতে হইবে। সকাল বেলা চটী হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে কিছু জলযোগ না করিয়া যদি খালি পেটে বাহির হইতে হয় তবে তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ অতি শীঘ্রই হইয়া যাইবে, ইহার কারণ এই যে হিমালয়ের ভিতরে ঝরণার জল ও বায়ু এত পরিস্কার ও হজমশক্তি সম্পন্ন যে আকণ্ঠপূর্ণ আহার করিলেও জলের গুণে সব অতি শীঘ্র হজম হইয়া যায় ও ক্ষুধার উদ্রেক হয়, তদুপরি পথশ্রম তাহার সহায়তা করে।

চটীওয়ালার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিলে সকাল বেলা গরম লুচি, পেড়া ও হালুয়া ইত্যাদি পাওয়া যায়। ইহাতে অনেকে ব্যয়সাধ্য মনে করিতে পারেন কিন্তু জিনিষ টাট্‌কা ও গরম পাওয়া যাইবে। আর যাহারা আপন বন্দোবস্তে উক্ত ব্যবস্থা করিতে চাহেন, রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে লুচি, পরোটা বা হালুয়া তৈয়ার করিয়া রাখিতে পারেন, অথবা যাহাদের সঙ্গে পাচকাদি থাকে তিনি যদি গরম গরম সব জিনিষ চান তাহা হইলে তাহাকে রাত্রিতে সব যোগাড় রাখিয়া প্রাতে ৫টা হইতে ৬টার মধ্যে জলখাবার তৈয়ার করিয়া লইতে হয়। পার্ব্বতীয় বায়ু এত পরিস্কার ও শুক্‌নো যে পথ চলিতে খুব তৃষ্ণা পায় ঐ অবস্থায় কেবল জলপান উচিত নহে, জলপানের পূর্ব্বে মুখে মিশ্রি প্রভৃতি সাধারণ মিষ্ট দ্রব্য দিয়া জলপান বিধেয়। পাঠক পাঠিকাগণ! আমার দৈনিক ভ্রমণ বিবরণী পাঠের দ্বারা বুঝিতে পারিবেন যে প্রত্যহ প্রাতে চটী হইতে বাহির হইবার সময় 'প্রাতে জলযোগের পর' এই কথা গুলি লিখা আছে, আমাদের আরও একটা বিশেষ ব্যবস্থা ছিল যে জলখাবার জিনিষ কিছু পরিমাণ সঙ্গে রাখিয়া দিতাম, পথ চলিতে চলিতে নয়টার পর দশটার মধ্যে আবার তাহা খাওয়া হইত। এই জন্য আমার সঙ্গীয়-মহাত্মাগণের পথে বা হিমালয় হইতে বাহির হইবার পর কাহারও কোন অসুখাদি হয় নাই। আমরা প্রায়ই এক বেলা চলিতাম। যাহারা দুই বেলা চলেন তাহাদের বৈকাল বেলার জলখাবার বিশেষ মতে হওয়া উচিত। যাহারা ইহার অন্যথা করিয়া

চলিয়াছেন তাহাদের সকলকেই পিত্তবৃদ্ধি জনিত জ্বর ও আমাশয় রোগে ভুগিতে দেখা গিয়াছে। পথ চলিতে যাহাদের মুখ শুক্‌নো ও রোগাক্রান্ত দেখিয়াছি তাহাদের সকলকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি, তাহারা সকলেই বলিতেন ভোরবেলা চটী হইতে বাহির হইয়া পথে মল মূত্রাদি ত্যাগ ও মুখ ধোয়া হয় তারপর চটীতে যাইয়া স্নান ও পূজা পাঠাদি সমাপনান্তে রন্ধনাদি করিয়া আহার করা হয়, ইহাতে বুঝিতে পারেন যে জলখাবারের ব্যবস্থা আদৌ নাই। আমার সাধ্যমত সকলের কাছে আমরা যে উপায়ে সুস্থ আছি তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিতাম ও তাহার ফলস্বরূপ আমাদের সকলের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য করিতে বলিতাম এবং তাহাদের মত পরিবর্ত্তনের জন্য 'প্রবাসে নিয়ম নাস্তি' এই মহা বাক্যের আবৃত্তি করিতাম ও তাহারা সকলে অনিয়মে চলিয়া অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন এ সকল কথা ভাল করিয়া বুঝাইয়া কারণ নির্দ্দেশ করিয়া দিতাম। প্রত্যেক যাত্রীকেই আপন অভিরুচি মত আহার করিতে হইবে। কিন্তু তাড়াতাড়ি অৰ্দ্ধ সিদ্ধ করিয়া কোন জিনিষ খাইবে না। সর্ব্ব সাধারণ সকল চটীতে মশলা ও সৈন্ধব লবণ পাওয়া যায় না এই সকল প্রধান প্রধান চটী হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত। খাওয়ার জন্য মুগ ও কলাইর দাইল যাহা মিলে তাহা সব খোসা শুদ্ধ থাকে, আবার অনেক ছোট চটীতে তরি তরকারি মোটেই পাওয়া যায় না, তজ্জন্য যেখানে সুবিধাজনক বোধ হইবে তথা হইতে ধোয়া দাইল ও আলু প্রভৃতি সংগ্রহ

করিয়া রাখা বিধেয়। যেখানে খোসা সহ দাইল খাইতে হইবে সেখানে এই প্রথা অবলম্বন করিয়া আমরা অনেকটা সুবিধা পাইয়াছি। প্রথমতঃ চটীতে আসিয়া দাইল লইয়া ভিজাইয়া রাখিতাম ও স্নানাদি করিয়া সর্ব্বাগ্রে তরকারি ভাত রুটী ইত্যাদি করিয়া তারপর দাইল ভাল করিয়া ধুইয়া তৈয়ার করিয়া লইতাম। বরফ গলা জলে দাইল সিদ্ধ হয় না, যে খানে সাধারণ ছোট ঝরণা আছে তদ্দ্বারা রন্ধন বিধেয়। প্রত্যেক ধামের নীচে অন্ততঃ ৩০ মাইল নীচে পর্য্যন্ত গঙ্গা জলে দাইল সিদ্ধ হইবে না; যেখানে বরফ গলা জল ভিন্ন উপায়ান্তর নাই তথায় বেশনের বড়া ইত্যাদি দ্বারা ডাল্না বা ঝোল তৈয়ার করিয়া খাওয়া বিধেয়। হিমালয়ের ভিতরে এক বেলা ভাত ও আর এক বেলা লুচি পরোটা বা রুটী খাওয়ার ব্যবস্থা ভাল, তাহা হইলে স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে। সকল চটীতে দুধ পাওয়া যায় না, যেখানে দুধ পাওয়া যায় তথা হইতে লওয়া উচিত। চটীতে যে সকল রন্ধন ও ভোজন পাত্র পাওয়া যাইবে (চটীতে অবস্থিতির নিয়ম শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করুন) তাহা ব্যবহারের পূর্ব্বে একবার মার্জ্জন করা উচিত। আহার্য্য দ্রব্যাদি যথাসম্ভব বাছিয়া পরিষ্কার করিয়া লওয়া উচিত। রন্ধনান্তে জিনিষ ঢাকিয়া রাখার কোন ব্যবস্থা না থাকিলে অন্ততঃ এক খানা পাতলা কাপড় দিয়া হইলেও ঢাকা কর্ত্তব্য তাহাতে মাছি ও উপরের ঝুল পড়া হইতে রক্ষা করিবে। হিমালয়-ভ্রমণান্তে যাহারা দেশে আসিয়া রোগাক্রান্ত হইয়াছেন বা ভ্রমণের সময় পথে অসুস্থ

হইয়া পড়িয়া থাকেন তাহার একমাত্র কারণ পূর্ব্বোক্ত বিধি-লঙ্ঘনজনিত, তাই যাহারা হিমালয় ভ্রমণ করিতে আসিবেন তাহারা সকলে যদি পূর্ব্বোক্ত মতে সতর্কতা অবলম্বন পূর্ব্বক চলেন তবে তাঁহারা বরাবর পথে ও দেশে আসিয়া সুস্থ থাকিবেন সন্দেহ নাই।

চটীতে অবস্থিতির নিয়ম এবং রন্ধন ও ভোজন পাত্রাদির সরবরাহ।

চটীতে যিনি যে গৃহে অবস্থান করিবেন তাহাকে সেই গৃহ-স্বামী বা চটীওয়ালা বা লালাজি হইতে আপনার আহার্য্য সমস্ত দ্রব্যাদি কিনিয়া লইতে হইবে। যাঁহারা কোন জিনিষ পত্রাদি ক্রয় করিবেন না তাঁহারা গৃহে অবস্থান করিতে পারিবেন না। চটীতে আশ্রয় লওয়া একটু সকালে হইলে সকল রকমের সুবিধা ঘটে ও আপন দরকার মত স্থান দখল করিতে পারেন। চটী-ওয়ালাগণ আবশ্যক মত সকল যাত্রীকে রন্ধনপাত্র, জলপাত্র, ও ভোজন পাত্রাদি যোগাইয়া থাকেন। তজ্জন্য নিজের কোন বন্দোবস্ত রাখিতে হয় না; কিন্তু যাঁহারা অন্যের ব্যবহৃত পাত্র ব্যবহার করিতে রাজি নহেন, তাঁহাদের আপনার বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে। কেবল মাত্র যমুনোত্তরীর পথে সকল জায়গায় চটী খোলা হয় নাই বলিয়া মাঝে মাঝে একটু অভাব বোধ করিতে হয়, কিন্তু গ্রামের ধর্ম্মশালায় যাহার নিকটে জিনিষ লওয়া যায় সে

প্রায়ই যোগাইয়া থাকে। (যমুনোত্তরী-পথে চটী-প্রবন্ধ পাঠ করুন) বদরিনারায়ন, কেদারনাথ ও গঙ্গোত্তরীর পথে কোন সময়ই পাত্রাদি সম্বন্ধে বেগ পাইতে হয় না।

হিমালয়ে উৎপন্ন দ্রব্য ও জীব জন্তু।

হিমালয়ে উৎপন্ন দ্রব্য ও জীব জন্তু প্রভৃতি দেশের সহিত অনেক পার্থক্য আছে, আবার দেশে যে সকল জিনিষ পাওয়া যায় তাহা তথায় মিলে না এবং পাহাড়ে হে সব জিনিষ বা পশু পক্ষী আছে তাহা দেশে নাই। আমি যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি আদি সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহাদের নাম প্রদত্ত হইল।

দেশীয়	পাহাড়ী
শস্য—ধান, যব, গম, মুগ, কলাই, ভূট্টা, তিল, সর্ষপ, ঝিঙ্গোরা, চিনা, কুটু, মাণ্ডূয়া ইত্যাদি।	ফাপরা, গায়েত ও চোলাই ইত্যাদি।
তরকারি—আলু, কুমড়া, লাউ, বেগুন, ঢেঁরস, ঝিঙা, শষা, কাঁকড়ি, পেয়াজ।	কোন নাম পাই নাই।
শাক—বেথো, মেথি, পালং, নোটে।	লেঙ্গড়া, ঢেঁকী।
ফল—আঙ্গুর, পেয়ারা, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, লেবু, আখরোট,	চিলু, লোকাট্, হিসার, ঝিঙ্গোর, পাপামুল,

দেশীয়	পাহাড়ী
নেসপাতি, আঞ্জীর, সিউ, পীচ, আলবোখরা, ডালিম, আনার, বেল, কুল ইত্যাদি।	বিকোল, ভূজোল, সিরোল ইত্যাদি।
ফুল—গাঁদা, গোলাপ, করভী, স্থবর্ণ-কলি, ধূস্তুর, দ্রোণ, চাঁপা, মন্দার, চামেলী, যুঁই, বেল, মালতী।	ব্রহ্মকমল, লেছর, পাজু, মাসি, লেদ্র, ভেরকন্দ, ইন্দ্রকমল, স্বর্ণকমল, ভূবাস ইত্যাদি।
খণিজ দ্রব্য—স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, সীস, গন্ধক, দস্তা, লবণ, অভ্র।	শিলাজতু, শ্লেট পাথর, স্ফটীকমণি।
বৃক্ষ—বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, নিম, বেল, শাল, শিমূল, শিশু, পলাশ, ইত্যাদি।	চির, দীপতরু, সান্ধন, তুঁদ, তেজবল, ভূতকেশ, ভূর্জ্যপত্র, চা, তেমলু, অর্‌কিট্‌ ইত্যাদি।
পশু—মেষ, ছাগল, গরু, মহিষ, খচ্চর, গাধা, ঘোড়া, কুকুর।	জবব্‌, চমরি, থাড়ু, প্রভৃতি গৃহ পালিত। বন্য পশু—বাঘ, ভল্লুক, হাতী, গণ্ডার, হরিণ, কস্তুরি, মৃগ, শেয়াল, বরল, জড়াল, থের, কৃষ্ণসার ইত্যাদি।

দেশীয়	পাহাড়ী
পাখী—কুক্কুট, শালিক, বৌ কথা কও, পিক, ঘুঘু, পায়রা, চড়ুই, কাক, চিল, শকুনি, ইত্যাদি।	জলচর পক্ষী, খগলাস, তিতর,মোলান,ইত্যাদি।

শিল্পদ্রব্য--কাঠের ঘটী, বাটী, থালা, গ্লাস, চিরুণী, বাকস্ ইত্যাদি, শ্বেত চামর, কম্বল, পশমী জুতা, লুই, পোট্টু, কাণ্ডী, ঝাম্পান, লাঠি, আটা পিসার কল। কাঠের জিনিষ তৈয়ার করিবার কল ইত্যাদি।

হিমালয় পর্ব্বতে নাতি শীতোষ্ণ মণ্ডলে যে সকল জিনিষ উৎপন্ন হয় ও পশুপক্ষী ইত্যাদি আছে তাহারা সমস্ত প্রায় দেশের মত, যে ভাগটীতে অত্যন্ত শীত তথায় অনেক রকম ফুল ফল পাখী ও পশু ইত্যাদি আছে তাহা প্রায় দেশে দেখা যায় না তাই দেশীয় ও পাহাড়ী দুইটী ভাগে সমস্তকেই বিভক্ত করা হইয়াছে। পর্ব্বতের উপরিভাগের যে সকল অংশ পাঁচ ছয় মাস পর্য্যন্ত বরফাবৃত থাকে তথায় গাছ পালা কিছুই হয় না বরফ গলিয়া গেলে এক রকম চারাগাছ ও নানাবিধ ফুল জন্মে। যে সমস্ত পাহাড়ী ফুলের নাম দেওয়া গেল সে সমস্ত এত সুগন্ধময় যে তাহার গন্ধে অনেক সময় আত্মহারা হইয়া যাইতে হয়। ভূতকেশ নামীয় যে চারাগাছ জন্মে তাহা আগুনে জ্বালাইতে আরম্ভ করিলে এক অভূতপূর্ব্ব গন্ধ বাহির হয়, এ রকম কিম্বদন্তী আছে তদ্দারা ভূতের উপদ্রব নাশ হয় সাধারণ জ্বর ও মাথা ধরার অনেক শান্তি করে।

যেখানে শীত অত্যন্ত বেশী তথায় গমের চাষ হয় দেখা যায় অন্য শষ্য ভাল ফলে না। বর্ত্তমান সময়ে অনেক স্থানে দেশের মত অনেক জিনিষের চাষ আরম্ভ হইয়াছে তন্মধ্যে নাইনিতাল ও কালাতাল পাহাড়ের গোল আলু সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও অত্যধিক পরিমাণে এ দেশে রপ্তানী হয়। এখানকার ভাঙ্গের গাছ দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, নাতি শীতোষ্ণ ভাগে রাস্তার দুই ধারে ও যথা তথায় তাহার গাছ আপনা হইতে জন্মে। ভাঙ্গ পাহাড়ীগণের সাধারণ নেশা, তাহারা উক্ত গাছ হইতে চরস উৎপাদন করিয়া পান করে। এখানে বিভিন্ন রঙ্গের হরিণ পাওয়া যায় কিন্তু ভল্লুক গণ্ডার প্রভৃতি হিংস্রক জন্তু চলাচলের পথে কখনও দেখা যায় না। গঙ্গোত্তরী প্রদেশে মোলান জাতীয় পাখী দেখা যায় তাহার পাখা ইউরোপীয় মহিলাদের শিরোভূষণের প্রধান শোভার জিনিষ। আমরা যখন গঙ্গোত্তরীতে গিয়াছিলাম তখন একজন ইউরোপীয় মহাত্মা ঐ পাখী শীকার করিয়া তাহার পাখা সংগ্রহ করিতেছিলেন। যাহারা হিমালয়ের ভ্রমণে আসেন তাহাদের দেশে লইয়া যাইবার প্রধান জিনিষ, শ্বেত চামর, শিলাজতু, দেবধূপ ইত্যাদি। এখানে কাঠের জিনিষগুলি বেশ সুন্দর; পাহাড়ীদের আগে উহাই প্রধান পাত্র ছিল। আমাদের দেশে যে সকল ভূর্জ্য-পত্র পাওয়া যায় তাহা সমস্তই হিমালয়ে উৎপন্ন। বদরিকাশ্রমে অনেক ঘর ভূর্জ্যপত্রের ছাউনি বিশিষ্ট। শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে কাণ্ডী, ঝাম্পান, কম্বল, লুই ও পশমী জুতা বেশ প্রশংসনীয়। আটা ভাঙ্গার কল ও কাঠের জিনিষ তৈয়ারির কল দেখিলে

পাহাড়ীদের শিল্প-নৈপুণ্যের অতি প্রশংসা করিতে হয়। এখানকার দীপ তরুর মধ্যঅংশই পাহাড়ী লোকের প্রদীপের কার্য্য করে, এখানে অন্য কোন রকমের আলোর বন্দোবস্ত পূর্ব্বে ছিল না, সম্প্রতি নানাবিধ রকমের আলো যাহা দেশে আছে তাহা সভ্যতার প্রভাবে প্রবেশ করিতেছে। এখানকার প্রাচীন ওজনের জিনিষগুলি বেশ সুন্দর ও ডমুরু আকারে প্রস্তুত। অনেক লোকে এখনও যে তুলাদণ্ডের দ্বারা ওজন হয় তাহা জানে না তবে ক্রমশঃ দেশী বেণেদের প্রভাবে এ সব শিক্ষা হইতেছে।

মালের আমদানী ও অধিক মূল্যের কারণ।

হিমালয়ের ভিতরে কি কি জিনিষ আছে তাহা সকলে অবগত হইয়াছেন, তাহা ব্যতীত আর যে সকল খাদ্যদ্রব্য এখানে পাওয়া যায় সমস্ত দেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে। হিমালয়ের নাতি শীতোষ্ণ ভাগ পর্য্যন্ত গাধা ও খচ্চরের পিঠে মাল পত্রাদি বোঝাই করিয়া আনিতে হয় তারপর শীতপ্রধান স্থানে যাইতে হইলে, মেষ ও ছাগলের পিঠে বোঝাই করিয়া লইয়া যাইতে হয়, এ জন্য মালের ধোলাই খরচ অনেক বেশী পড়িয়া যায় তৎপরে অধিকাংশ দোকানদারই বেণে, তাহারা জিনিষের দামের সঙ্গে ধোলাই খরচ, টাকার সুদ, ঘর ভাড়া, লাভ এই সকল যোগ দিয়া মাল বিক্রয় করে। তদুপরি যে সকল জিনিষ দেশ হইতে যায় তাহার ধূয়া তুলিয়া পাহাড়ের উৎপন্ন দ্রব্যাদিরও দাম চড়াইয়া

দেয়। অনেক খরচ পড়িয়া যায় বলিয়া এখানে যত অগ্রসর হইতে থাকিবেন ততই জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।

হিমালয়বাসী যাত্রীদের প্রতি সম্বোধন ও প্রার্থনা।

হিমালয়ের ভিতরে সাধারণ দোকানদারগণ দেশ হইতে সমাগত যাত্রিমাত্রকেই শেঠজি বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গেলে দেখা যায় যে, পথে যে সকল ধর্ম্মশালা ইত্যাদি স্থাপিত আছে তাহা সমস্ত বড় বড় শেঠদের কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত আর প্রথমতঃ যাহারা বেশী টাকা পয়সা খরচ করিতে পারিতেন তাহারাই হিমালয়ের সমস্ত তীর্থাদি দেখিতে যাইতেন। বর্ত্তমান সময়ে যত কীর্ত্তি আছে তাহা সকল শেঠদেরই, আর যাঁহারা দেশ হইতে পর্য্যটন করিতে যান তাঁহারা সকলেই বড় লোক বা শেঠ এই ধারণাতে সর্ব্বসাধারণকে দোকানদার কুলি মজুর সকলেই শেঠজি বলিয়া সম্বোধন করে।

হিমালয়ের ভিতরে বর্ত্তমান সময়ে যে সকল লোক বাস করিতেছে তাহাদের অধিকাংশই পঞ্জাব ও রাজপুতনা অঞ্চলের লোক বলিয়া বোধ হয়; কারণ ব্রাহ্মণ মাত্রেই গৌড় বা সারস্বত আর ক্ষত্রিয়েরা সকলেই রাজপুত এবং তাহারা ধর্ম্মবিপ্লবের সময়ে দেশ হইতে পলাইয়া পাহাড়ে আশ্রয় লইয়াছে।

রাজপুতনা অঞ্চলের পূর্ব্বকার যাহারা বড় লোক ছিলেন তাঁহাদের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে সাধারণ লোকে তাঁহাদিগকে রাণা ও তাহাদের গৃহিণীদিগকে রাণী বলিয়া সম্বোধন করিত। বর্ত্তমান সময়েও পাহাড়ী ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে পরস্পরে বা অপরিচিতকে ঐ প্রকার সম্বোধন করিতে শুনা যায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে পাহাড়ের ভিতর যে সব লোক বাস করে তাহারা দেশ হইতে আহূত যাত্রিগণকে অত্যন্ত ধনবান বড় লোক মনে করে। পথে চলিবার সময় দেখা গিয়াছে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা এক এক স্থানে দল বান্ধিয়া দাড়ায়, যাত্রিগণকে আসিতে দেখিলে তাহাদের সাম্‌নে সাম্‌নে নাচিয়া নাচিয়া বদ্রীনাথের, কেদারনাথের ও গঙ্গাদেবীর স্তোত্রাদি পাঠ করে, স্তোত্র পাঠ শেষ হইলে পুরুষ ছেলেদের রাণা ও মেয়েদের রাণী সম্বোধন করিয়া বলে আমাদিগকে সূঁচ, সূতা, সিন্দুর, বিণ্ডি দাও। সরল প্রকৃতি পাহাড়ী বালক বালিকাদের সুমধুর কণ্ঠে অঙ্গভঙ্গী সহ স্তোত্র পাঠ শুনিলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগকে কিছু না কিছু দিতে ইচ্ছা হয় ; যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত জিনিসগুলি সঙ্গে রাখেন ও তাঁহাদিগকে প্রদান করেন তাহাতে যে তাহারা কত খুসী হয় তাহা বর্ণনাতীত। অতএব হিমালয় যাত্রিমাত্রেরই ঐ সমস্ত দ্রব্যগুলি সঙ্গে রাখা উচিত। এস্থলে বিণ্ডি জিনিষটির একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বোধ করিলাম। বিণ্ডি সাধারণতঃ হিন্দুস্থান অঞ্চলের মেয়েরা কপালে পড়িয়া থাকে। এখানকার ছেলে মেয়েদের একটা পয়সা দিলেই সন্তুষ্ট হয় অথবা একটী সূঁচ, আট বা দশ হাত সূতা, একটু পরিমাণ সিন্দুর বা একটী

বিণ্ডি দিলে আরও খুব সন্তুষ্ট হইবে, ইহার কারণ এই যে হিমালয়ের ভিতরে সূঁচ, সূতা সিন্দুর ও বিণ্ডি পাওয়া যায় না। তাই তাহারা ঐ সকল জিনিষই প্রার্থনা করিয়া থাকে। এতন্মধ্যে সূঁচ সূতা সর্ব্বসাধারণে চায় কিন্তু মেয়েরা যদি সিন্দুর ও বিণ্ডি পায় তাহা হইলে আর তাহাদের আহ্লাদের সীমা থাকে না।

হিমালয়বাসী।

হিমালয়ে সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ডোম (শূদ্র) এই তিনটী প্রধান জাতির বাসস্থান। ব্রাহ্মণগণ অধিকাংশই গৌড়দেশীয় এবং সারস্বত। কান্যকুব্জী ব্রাহ্মণ অতিশয় কম। সম্প্রতি ব্যবসায় উপলক্ষে অনেক দেশীয় বৈশ্য পাহাড়ী মেয়ে বিবাহ করিয়া ২।১ পুরুষ হইতে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কাহাকে বলে তাহা অনেকের ধারণাও নাই। হিমালয়ের যে সব স্থানে এখন সাহেব সুবা আছেন তথায় মুসলমানও দেখা যায়। এখনকার ক্ষত্রিয়গণ রাজপুত ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত। ডোম হইতে কামার, কুমার, মেথর, মুচি, সূত্রধর প্রভৃতি জাতির সৃষ্টি হইয়াছে; ইহারা সকলেই জলাচারের বহির্ভূত। হিমালয়বাসীর স্বাবলম্বন আচার ব্যবহার, সমাজনীতি, বিবাহ-পদ্ধতি, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করিলে দেখা যায় তাহাদের স্বাবলম্বন অত্যন্ত প্রশংসনীয়। সকলেরই স্ব স্ব ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যাদি তৈয়ার করিতে দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে

বিশেষ ধনী কেহ নাই প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত ও জমিদার বলিয়া কথিত হয় তাহাদিগকে আপনাপন গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অন্য কাহারও মুখাপেক্ষী হইতে হয় না। ইহাদের মধ্যে পুরুষগণ অপেক্ষা মেয়েরা অত্যন্ত কর্ম্মিষ্ঠা। যাহার যত কাজ বেশী তাহারা কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য তত বেশী পরিমাণে বিবাহ বা জাতি নির্ব্বিশেষে রক্ষিতা স্ত্রী গ্রহণ করিয়া থাকেন। মেয়েদের সকলকেই আপনাপন জমিতে কাজ করিতে হইবে, জঙ্গল হইতে জ্বালানি কাঠ * গরুর জন্য ঘাস সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহাতে ধনী দরিদ্র বাদ নাই, জাতি নির্ব্বিশেষে সকলেরই করিতে হয়। মাঠে ধান বুনা হইতে আরম্ভ করিয়া ঘরে আনিয়া চাউল তৈয়ার পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য স্ত্রীলোকের করিতে হইবে কেবল মাত্র জমিতে চাষ দেওয়া ও জলের লহরি কাটিয়া আনা পুরুষের কার্য্য। এখানকার ক্রিয়া কলাপ সব বৈদিক মতে সম্পন্ন হয়। বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় জাতির প্রতি তত লক্ষ্য নাই; বিশেষ লক্ষ্য কন্যাপণের দিকে। যত রকমের বিবাহ-পদ্ধতি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রচলিত আছে সব মতেই হয়। কন্যাপণ পিতার অভিরুচিমত যিনি দিতে পারিবেন তিনিই সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন। এখানকার বিবাহ আদালতে রীতিমত রেজিস্টার করা হয়। বিবাহান্তে স্ত্রী স্বামীর বা স্বামী স্ত্রীর মনোমত না হইলে পরস্পর পরস্পরকে আদালতের অনুমতি লইয়া ত্যাগ করিতে পারেন, ইচ্ছামত অন্য পতি বা পত্নী গ্রহণ

* পুরুষেরা কাঠ চিরিয়া দেয়।

করিতে পারেন,উক্ত কার্য্যও যতবার ইচ্ছা ততবার হইতে পারে। টাকা হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ানী, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণী গ্রহণ করিতে পারেন। তবে তাহাদের গর্ভজাত সন্তান ব্রাহ্মণ বংশে প্রথমেই ব্রাহ্মণ বলিয়া গ্রহণীয় হইবেন না, ব্রাহ্মণোচিত সকল সংস্কার কার্য্যাদি হইবে, ক্রমশঃ সেই ছেলের তৃতীয় পুরুষে ব্রাহ্মণ বলিয়া গ্রহনীয় ও সমাজে বসিয়া আহারাদি করিতে পারিবে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মহাশয়ের সকলেরই আপনাপন জাতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য আছে। এমন কি তাহারা উপনয়ন সংস্কারের পর আপন গর্ভধারিণীর পক্কান্ন গ্রহণ করিবেন না, ফলাহারি সব জিনিষ খাইতে আপত্তি নাই। তার পর বিবাহ করিয়া সেই স্ত্রীর ও পক্ক ডাল ভাত অগ্রাহ্য,মাত্র রুটী লুচি তরকারি গ্রহণীয়; অনেকে রুটীও খান না। যাহাদের আর্থিক অবস্থা ভাল নহে তাহাদের মধ্যে কয়েক ভাই মিলিয়াও এক স্ত্রী গ্রহণ ও জাত ছেলেগুলির মালিক সকলেই হয়। পাহাড়ী মেয়েদের বৈধব্য যন্ত্রণা ভুগিতে হয় না, বড় ভাইয়ের স্ত্রী, স্বামীর মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ ভাইয়ের গৃহিণী বা আপন ইচ্ছামত অন্য কাহারও গৃহিণী হইতে পারেন। এখানে স্ত্রী, স্বাধীনতা বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয় ও স্ত্রীলোকের পর্‌দা অবগুণ্ঠন প্রথা নাই,যে স্ত্রীলোক যত স্বাধীন ভাব দেখাইতে পারেন তিনি তত গৌরব মনে করেন। মেয়েরা বেশ নাচ গান পটু। সর্ব্ব সাধারণ বড় অপরিষ্কার ও স্নান করা বৎসরের বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে হয়। কিন্তু সকলেই দেবদেবী ভক্ত, গ্রামস্থ দেবালয়াদি দেখিলে তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া

যায়। সাধারণ লোক-চরিত্র বর্ত্তমান কালানুযায়ী বেশী ইন্দ্রিয়াসক্ত ও ভীরু স্বভাব। হিমালয়বাসীরা অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ও সাধু সন্ন্যাসী ভক্ত; কাহারও বাড়ীতে সন্ন্যাসী উপস্থিত হইলে কি রকমে সৎকার করিলে সাধু সন্তুষ্ট হইবেন তজ্জন্য পরিবারস্থ সকলেই ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পড়েন। এখানকার কথিত ভাষা হিন্দি ভাষার অপভ্রংশ। কিন্তু পাঠশালাদিতে হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষা ও জ্যোতিষ পড়ান হয়। বর্ত্তমানে অনেক স্থানে ইংরাজী শিক্ষারও সুবন্দোবস্ত হইয়াছে ও শিক্ষার্থিগণ ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, ব্রাহ্মণগণকে সাধারণতঃ অন্য জাতি অপেক্ষা শিক্ষিত দেখা যায়। গ্রামগুলি দেখিলে দ্বিতীয় নরক বলিয়া বোধ হয় *। সর্ব্ব সাধারণই মেষ, ছাগল ও কুকুর পুষিয়া থাকে, প্রথমোক্ত দুইটার লোম দ্বারা তাহাদের পরিধানের ও অন্য ব্যবহার্য্য বস্ত্রাদি তৈয়ার হয়। এই বয়নাদি কার্য্যও স্ত্রীলোকেরা সম্পন্ন করে, কেবল পুরুষেরা লোমগুলি পাকাইয়া সূতা তৈয়ার করিয়া দেয়; আর কুকুর তাহাদের পাহারাওয়ালা। মেষ ও ছাগল গরু ইত্যাদি সব জঙ্গলে ঘাস খাইবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইল তাহাদের রক্ষক এবং পাহারাদার কুকুর; এমন কোন হিংস্র জন্তুর সাধ্য নাই যে কুকুরের সামনে তাহার রক্ষিত একটা জীবের উপর অত্যাচার করে, অমনি সে তাহার প্রতিকার করিবে অর্থাৎ তাহাকে তাড়াইয়া দিবে। পাহাড়ী কুকুর এত বলবান হয় যে

* গ্রামের শোচনীয় অবস্থাশীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন।

দুইটী একত্র হইয়া একটী বড় বাঘ মারিয়া ফেলিতে পারে। দেশ হইতে অনেক সাধু ভেকধারি বাবাজিগণ এখানে আসিয়া সাধুত্বের ষোল আনা বজায় রাখিয়া অনেকে গ্রামে বা গ্রাম-পার্শ্বে আস্তানাদি করিয়া সাধুগিরির ফল উৎপাদন করিতেছেন। তাহাদের উপযুক্ত বংশধরেরাও আপনাকে সাধু নামে পরিচয় দিয়া ধন্য হইতেছেন আর আস্তানধারীরা দেবালয়ের মোহন্ত বাবাজিদের ত কথাই নাই তাঁহারা উক্ত নামের কলঙ্কস্বরূপ হইয়াছেন। নাথ সম্প্রদায়, গিরিপুরি, নম্বুরী, লিঙ্গ নামধারী হিমালয়বাসী গৃহস্থ সাধুগণ ইহার বিশেষ পরিচয় দিতেছে। এই সকল কলঙ্ক কখন্ যে দূরীভূত হইবে তাহা একমাত্র তিনিই জানেন।

পরিচ্ছদ ও বাসগৃহ।

হিমালয়বাসীর পরিধেয় বস্ত্রাদি ও বাসগৃহ সবই বিচিত্র রকমের দেখা যায়। পুরুষদের বিশেষ পোষাক—কম্বলের একটী পায় জামা, একটী গায়ের জামা ও মাথায় কম্বলের টুপি; কিন্তু ইহা সকল সময়ে পরিবে না। সাধারণতঃ পুরুষেরা একখানা লেংটী, গায়ের জামা ও মাথার টুপী পরিয়া থাকে, অনেকে টুপিতে গাছের কচিপাতা বা ফুলের থোবা পরিতে ভালবাসে। সকলেরই হাতে এক গাছি করিয়া লাঠি থাকে। বর্ত্তমান সময়ে যাহারা সুতার কাপড় পরিতেছে তাহা নব্য শিক্ষা, সভ্যতা ও দেশীয়

লোকের সহিত সংসর্গের ফল। মেয়েদের সাধারণ পোষাক—একটী জামা, গায়ে একখানি কম্বল জড়াইয়া বা কুচি করিয়া পরা, মাথার চুলগুলি বেশ বিনাইয়া খোপার অগ্রভাগে একটী উলের ফুল ও মাথায় পাগড়ি বাঁধা, তবে তাহাদেরও মধ্যে অনেকে সূতার কাপড় ঘাঘরা ইত্যাদি পরিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহাও পূর্ব্বোক্ত সভ্যতার ফলমাত্র। কি পুরুষ, কি স্ত্রী দ্বিতীয় বস্ত্র কম লোকের আছে। তবে যাহাদের ভিতর এখন শিক্ষার আলোক প্রবেশ করিয়াছে তাহাদের ত কথাই নাই, এক দমে অনেক মহাশয়েরা ইংলিশ কোট ও গলাবন্ধ ইত্যাদিতে পদার্পণ করিয়াছেন। তবে তাহাদের প্রশংসা এই যে, তাহারা রোজ গরম জলে হউক বা ঠাণ্ডা জলে হউক স্নানাদি করিয়া শরীরাদি পরিষ্কার করিতে শিখিয়াছে। পাহাড়ী লোকেরা আপন কাপড় পরিষ্কার করিবার জন্য এক রকম চারা গাছের (আনারস গাছের মত) মোটা পাতার ভিতরের অংশ ব্যবহার করিয়া থাকে।

হিমালয়ে একতালা গৃহে কেহ বাস করে না। সকলেরই দুইটী ঘর আছে। একটী ভাণ্ডার ঘর, অপরটি বাসের ঘর, কিন্তু দুইটীই দোতালা, কেহ কেহ একটী তেতালাও করিয়া থাকে। ভাণ্ডার ঘরে উপরের তালায় সমস্ত খাদ্যদ্রব্যাদি ও নীচে জ্বালানি কাঠ ও ঘাস থাকিবে আর বাসগৃহের নীচে গো, মহিষ, মেষ, ছাগল প্রভৃতি যত গৃহপালিত জন্তু আছে তাহাদের স্থান। উপরের তালায় রন্ধনাদি সব কার্য্য, আহার বিহার শয়নাদি করিবে, কিন্তু কুকুর-গুলি প্রায় উপর তালায় দেখা যায়, কেহ কেহ মেষ

ছাগলও উপর তালায় রাখে। তাহারা অতিথিকে আপন ঘরে বা ভাণ্ডার ঘরের বারান্দায় স্থান দেয়, বেশী লোক হইলে গ্রাম্য দেবালয়ে স্থান করিয়া দেয়। অধিকাংশ গৃহ পাথরের দেওয়াল ও ছাউনি বিশিষ্ট, কোন কোন স্থানে কাঠের ঘরও আছে। ভাণ্ডার ঘর সর্ব্বত্র কাঠের দেওয়াল বিশিষ্ট। বর্ত্তমানে স্থানে স্থানে টীনগৃহও তৈয়ার হইতেছে।

বিল্বপত্র, তুলসী ও শিব মৃত্তিকা।

যাহারা নিত্য নৈমিত্তিক বিধিমতে পূজা পাঠাদি করেন বিশেষতঃ সেই প্রকার যাত্রিদের জন্য এবং সর্ব্ব সাধারণের অবগতির জন্য হিমালয়ের প্রধান তীর্থস্থানে বিল্বপত্র, তুলসী ও প্রায় সর্ব্বত্রেই শিবলিঙ্গ তৈয়ার করিবার জন্য বিশুদ্ধ মৃত্তিকার অভাব বর্ণন করিতে বাধ্য হইলাম। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী মাত্রেই জানেন যে,বিনা বিল্বপত্রে ৺শিবপূজা ও বিনা তুলসীপত্রে ৺নারায়ণ-পূজা হয় না। বদরিনারায়ণের পথে পিপল চটী পর্য্যন্ত, কেদার নাথের পথে গুপ্তকাশীধামের তিন মাইল নীচে পাণ্ডার গ্রাম পর্য্যন্ত, গঙ্গোত্তরীর পথে ধরাসু পর্য্যন্ত বিল্বপত্র ও তুলসীগাছ দৃষ্ট হয়। উত্তরকাশীতে কখনও তুলসী দেখা যায় *। যাঁহারা নিত্য সঙ্কল্পিত বা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বিল্বপত্রে শিবার্চ্চনা বা তুলসী পত্রে নারায়ণার্চ্চনা করেন বা ঘৃত বিল্বপত্র যোগে নিত্য হোম করেন

(*) ম্যাপ দেখুন।

তাঁহাদের প্রত্যেককে পূর্ব্ব কথিত স্থান বা যেথানে উক্ত জিনিষের আধিক্য দেখিবেন তথায় সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে লইতে হইবে, না হয় তাহাদিগকে স্বীয় সঙ্কল্প-ধ্বংশজনিত মনস্তাপ ভুগিতে হইবে। ফুল সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। সমস্ত ধামেই ফুল ও এক রকম বন্য পত্রের দ্বারা পূজা হয়। ঐ সব স্থানে উক্ত জিনিষের অভাব হইবার কারণ শীতাধিক্য। ঐ সকল গাছ নাতিশীতোষ্ণ দেশেই বেশী জন্মে, অতি কষ্টে শীতপ্রধান স্থানে গ্রীষ্মকালে উৎপাদন করিলেও শীতকালে মরিয়া যায়। শিবমাটী সম্বন্ধে এই বলা যায় যে যাঁহারা নিত্য মৃন্ময় শিব পূজা করেন তাঁহাদিগকে তদনুযায়ী ভালমাটী রাখিতে হইবে। পাহাড়ে যে সকল মাটী পাওয়া যায় সবই বেলে মাটী ও কাঁকর মিশ্রিত। যাহারা আপন কার্য্য বিনাবিঘ্নে সম্পাদন করিতে চাহেন তাহাদের উক্ত জিনিষের ব্যবস্থাও রাখিতে হইবে। শীতপ্রধান স্থানে দুর্ব্বাও পাওয়া যায় না।

পিশু, ছারপোকা, মশা মাছি ও জঙ্গলা পোকার উৎপাত।

হিমালয়ের ভিতরে রাস্তার সমস্ত চটীতে পিশু, ছারপোকা ও মাছি আর পথের যে স্থানের উপর দিয়া ছোট ছোট প্রস্রবন বহিয়া গিয়াছে তথায় মশা, আর যে পথের দুইধারে বরাবর জঙ্গল তথায় জঙ্গলী পোকার উৎপাত দেখা যায়। পিশুগুলি দেখিতে

উকুনের মত কিন্তু রং পরিস্কার সাদা। পিশু ও ছারপোকা সূতার কাপড়ে বিশেষতঃ ময়লা কাপড়ে বিশেষভাবে আশ্রয় করে, পশমী বা রেশমী কাপড়ে তত আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না, ইহার কারণ বোধ হয় শেষোক্ত কাপড়ের সূতাগুলি অতি মসৃণ; আর রৌদ্রে যখন কাপড় গরম হয় তখন পড়িয়া যায়। পথের সকল চটীতে পিশু ত আছেই ছারপোকা সকল স্থানে নাই। মধ্যে মধ্যে কাপড়গুলি গরম জল ও সাবান দিয়া ধোয়া উচিত; তাহা হইলে পিশু ও ছারপোকা বিশেষ আধিপত্য করিতে পারিবে না। আর মাছি গঙ্গোত্তরী, যমুনোত্তরী, কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রম ব্যতীত সব চটীতে এত অধিক পরিমাণে আছে যে তাহা বর্ণনাতীত। রান্না করিয়া তাহার উপর যাহা কিছু ঢাকা দিয়া রাখা হয় তাহাতে এত মাছি বসিবে যে সে পাত্রটী আদৌ দেখা যায় না ঠিক একটী মাছির স্তূপের মত দেখা যায়, আহারান্তে কাহাকেও বিশ্রাম করিতে হইলে তাহাকে আপাদ মস্তক চাদর মুড়ি দিয়া শুইতে হইবে, খানিক পরে দেখা যাইবে তাহার উপর এত মাছি আসিয়া বসিয়াছে যে কাপড়টীর সর্ব্বত্রই যেন মাছির আকৃতি বিশিষ্ট বুটাদার করা হইয়াছে। একবার কাপড়খানি নাড়া চাড়া দিলে এক অভূতপূর্ব্ব ধ্বনি শ্রুত হইবে। এত বেশী মাছি হইবার কারণ 'গ্রামের শোচনীয় অবস্থা' শীর্ষক প্রবন্ধে পাইবেন। যাহারা কাপড়ে সুগন্ধি দ্রব্যাদি ছড়াইয়া থাকেন ও সদা সর্ব্বদা সুগন্ধি জিনিস ব্যবহার করেন তাহারা উক্ত উৎপাত হইতে রক্ষা পাইতে পারেন। গঙ্গোত্তরী, যমুনোত্তরী, ভাটোয়ারী হইতে

ত্রিযুগী নারায়ণ, কেদারনাথের পথে ও উখীমঠ হইতে লাল সাঙ্গার পথে যে সব স্থানে বিশেষ জঙ্গল আছে ও তাহার ভিতর দিয়া রাস্তা চলিয়া গিয়াছে তথায় এক রকম জঙ্গলী পোকার ছোট ও বড় উভয় জাতীয় পোকা আসিয়া এমন ভাবে কামড়াইয়া দেয় যে তথায় চুলকাইতে চুলকাইতে ঘা হইয়া যায়, তাই সমস্ত শরীর বিশেষ আবৃত করিয়া চলা উচিত। যমুনোত্তরী ও গঙ্গোত্তরী পথের জঙ্গলে এই রকম এক বিষাক্ত মাছি আছে যে তাহাদের কামড়ের চোটে রক্ত বাহির হয় ও পরে ঘা হইয়া অনেক কাল ভুগিতে হয়। যাঁহারা অনাবৃত শরীরে পর্য্যটন করেন তাঁহাদের দুর্দ্দশার অবধি থাকে না; ঐ সব বিষাক্ত ঘায়ের ঔষধ—রোজ গরম জলে ধৌত করা, মাছি বসিতে না দেওয়া ও বিভূতি লাগান। ঐ সব পথে চলিতে হইলে পায়ে মোজা ও পট্টি বাঁধিতে হয়, গায়ের কোন অংশ যাহাতে অনাবৃত না থাকে তাহার ব্যবস্থা করিয়া যাইতে হয়।

নিঃস্বম্বল পর্য্যটন।

হিমালয়ের ভিতর নিঃস্বম্বল পর্য্যটন তত সুবিধাজনক নহে। প্রথম কারণ এই যে, বর্ত্তমান সময়ে পর্য্যটকদিগের তেমন নির্ভরতা দেখা যায় না; তদনন্তর গ্রামে বা চটীতে ভিক্ষা করিয়া সুস্থ শরীরে চলিয়া যাওয়া ঘটিয়া উঠে না। উক্ত প্রকারের পর্য্যটক-দের মধ্যে যাহারা কোন বড় লোকের সাহায্য পান আর তিনিও

যদি রীতিমত যত্নাদি করেন তবে এক রকম চলিয়া যায়। ঐ প্রকারের অনেক মহাত্মাকে আমাদের পর্য্যটনের সময় দেখা গিয়াছে তাহারা, চটীতে যখন যাত্রীরা রন্ধনাদি করিয়া আহারের জন্য প্রস্তুত হইত উক্ত সময়ে মাধুকরি করিতেন, কখনও কখনও কোন উদারচেতা একেবারে বসাইয়া আহার করাইয়া দিতেন। আবার অনেককে দেখিয়াছি তাহারা জাতভিখারির মত এক গ্রামে সর্ব্বত্র ভিক্ষা করিয়া চারি পাঁচ দিনের সঞ্চয় করিয়া লইলেন, তার পর পথ চলিতে লাগিলেন, আবার যেখানে ফুরাইয়া গেল তথায় আবার উক্ত বন্দোবস্ত করিলেন, কিন্তু শেষোক্ত দুই প্রকার ব্যক্তিকে রাত্রিকালে চটীতে স্থান পাইতে বেগ সহ্য করিতে হয়। যেখানে ধর্ম্মশালা আছে ও সদাব্রতের ব্যবস্থা আছে সেখানে বেশ স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে পারে। তবে নিঃস্বম্বল পর্য্যটন করিতে আসিয়া পূর্ব্বোক্ত সকল প্রকার লোকেরই একটী না একটী পথ অবলম্বন করিতে দেখা গিয়াছে। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রবিধিতে ভিক্ষা করিবার যে সকল বিধান আছে পদে পদে তাহার অবমাননা ত হইলই, পরন্তু ক্লেশেরও সীমা রহিল না, এখানে সংক্ষেপে ভিক্ষার নিয়ম লেখা হইল।

যিনি ভিক্ষা করিবেন তাহাকে কেবলমাত্র এক বেলার উপযোগী খাদ্যদ্রব্য যোগাড় হইলেই বিরত হইতে হইবে, তাহা কাঁচা হউক বা পক্ক হউক কিছুতেই দ্বিধা করিতে পারিবেন না। ভিক্ষালব্ধ যাহা মিলিবে তাহা ভগবৎপ্রেরিত ও সেই দিনের মত তাহার জন্য উক্ত প্রকারই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এই রকম বিবেচনা করিয়া

গ্রহণ করিতে হইবে অন্যথা করিলে তাহাকে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে। এবম্প্রকার নির্ভরশীল ও ত্যাগী মহাত্মা বর্ত্তমান সময়ে অতি বিরল। তারপর আহারান্তে পথ চলিতে আরম্ভ করিলে জল ও বায়ুর গুণে এত শীঘ্র হজম হইয়া যাইবে সুতরাং সেই সময়ে তাহার অন্য উপায় নিতান্ত দরকার হইয়া পড়ে, তখন তাহা হইতে পশ্চাৎপদ হইলে অসুখ হইয়া পড়িবে। আমাদের বর্ত্তমান স্বাস্থ্য ও শারীরিক অবস্থা, মনের বল সমস্তই নিঃস্বম্বল পর্য্যটনের বিরোধী; তাই হঠাৎ কোন সাময়িক বৈরাগ্যবান মহাত্মা যদি উক্ত পথ অবলম্বন করেন তাহাকে সাবধান করিবার জন্য এই প্রবন্ধ রচিত হইল ও ভিক্ষার নিয়ম বর্ণিত হইল। পাছে হঠাৎ বাহির হইয়া পড়িয়া দুই নৌকায় পা দিয়া মাঝখানে হাবু ডুবু খাইতে না হয়। নিঃস্বম্বল-পর্য্যটন দেশে হইতে পারে কিন্তু এতদ্দেশে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, তবে পূর্ব্বে যাঁহারা আসিতেন তাঁহারা উক্ত বিষয়ে দক্ষ হইয়া ও অনেক পাহাড়ী ফল মূলাদি চিনিয়া লইয়া আসিতেন। এখন আর তেমন দিন বা ব্যবস্থাদি কিছুই নাই।

গব্যঘৃত ও গব্যদুগ্ধ।

হিমালয় প্রদেশে গো, মহিষ যথেষ্ট পরিমাণে আছে কিন্তু দুগ্ধ দেশের গো মহিষের মত পাওয়া যায় না। এখানকার লোকেরা গরু ও মহিষের দুধ একত্র মিলাইয়া দধি পাতে বা ঘৃতাদি তৈয়ার

করিয়া থাকে, স্বতন্ত্র ভাবে করে না বা করিবার দরকারও উপলব্ধি করে না, এখানে চেষ্টা করিলে অর্থাৎ গরু দোহন করিবার আগে যদি গরুর মালিকের নিকট যাইয়া বলা হয় বা দাড়াইয়া থাকা হায় তবে খাটী গব্যদুগ্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু খাটী গব্যঘৃত পাওয়া অসম্ভব। যাহারা গব্যঘৃত খাইয়া থাকেন বা গব্যঘৃতের দ্বারা নিত্য হোমাদি কার্য্য করেন তাঁহাদের দেশ হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে আপনাপন বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে হইবে। এখানকার লোকেরা গব্যদুগ্ধ বা গব্যঘৃতের যে কি গুণ আছে তাহা বোঝে না। তবে সর্ব্বত্র সব চটীতে ঘৃত ও দুগ্ধ কম ও বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহা দৈনিক ডায়েরি বা চটীর বিবরণ পাঠে জানিতে পারিবেন।

পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস।

হিমালয়ের ভিতর গঙ্গোত্তরী, যমুনোত্তরী ও কেদারনাথের পথে পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিসের অত্যন্ত দরকার, একমাত্র হরিদ্বার হইতে সোজাসুজি বদরিনারায়ণ পর্য্যন্ত রাস্তায় দশ মাইল অন্তর ডাক বাঙ্গালা, পোষ্ট অফিস, কোথায়ও বা চিঠির বাক্স দেখা যায়, টেলিগ্রাফ অফিস উক্ত রাস্তায় প্রধান প্রধান স্থানে আছে। এমন কি বদরিনাথ পর্য্যন্ত সাময়িক পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস আছে। কেদারনাথের পথে গুপ্তকাশীতে গঙ্গোত্তরীর পথে উত্তর কাশীতে, নালা চটী হইতে লাল সাঙ্গার পথে উখী মঠে

কেবলমাত্র পোষ্ট অফিস আছে, যমুনোত্তরীর পথে কিছুই নাই। শেষোক্ত তিন পথের গুপ্তকাশী, উত্তরকাশী ও উখী মঠ পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফ ও পোষ্ট অফিস হওয়া বিশেষ দরকার। মেলার সময় যমুনোত্তরীর পথে ধরাসু ও থর্শালিতে সাময়িক শাখা অফিস গঙ্গানি ও যমুনোত্তরীতে চিঠির বাক্স, গঙ্গোত্তরীর পথে ভাটোয়ারি হরশিলা বা ধরালী ও গঙ্গোত্তরীতে সাময়িক শাখা অফিস, ভাড়-লান গঙ্গানল ও ভৈরব ঘাটে চিঠির বাক্স, কেদারনাথের রাস্তায় ফাটা চটী, গৌরীকুণ্ডে চিঠির বাক্স ও কেদারনাথ পুরিতে সাময়িক শাখা পোষ্ট অফিস হওয়া বিশেষ দরকার *। উক্ত পথে যাত্রি-দের চিঠি পাওয়া বা দেওয়া বিষয়ে অত্যন্ত কষ্ট ও অভাব ভুগিতে হয়। হিমালয়ভ্রমণান্তে যাঁহারা উক্ত অভাব বোধ করিয়াছেন ও যাঁহারা বর্ত্তমানে হিমালয়-দর্শনাভিলাষী তাঁহারা সকলে মিলিয়া যদি বিশেষ চেষ্টা করেন তবে সর্ব্ব সাধারণের নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞতাভাজন ও আশীর্ব্বাদের পাত্র হইবেন।

যমুনোত্তরীর পথ।

যমুনোত্তরী যাওয়ার জন্য পূর্ব্বে বিশেষ কোন রাস্তা ছিল না যাত্রিগণকে পাহাড়ী লোকের সাহায্যে বা সঙ্গে লইয়া উক্ত স্থানে যাইতে হইত। প্রায় ৫।৬ বৎসর অতীত হইতে চলিল শ্রীমান্ টিহরি নরেশ বাহাদুর ধরাসু হইতে যমুনোত্তরী পর্য্যন্ত একটা

* চটীর স্থান নির্দ্দেশের জন্য ম্যাপ দেখুন।

ভাল রাস্তা তৈয়ার করাইয়া দিয়াছেন ও শ্রীমৎ স্বজনানন্দ ব্রহ্মচারি জিউ মহারাজের প্রযত্নে হনুমান গঙ্গার খানিক দক্ষিণস্থ প্রদেশ হইতে ধাঙ্গব গ্রাম, ডুণ্ডার চড়াই করিয়া উপরিকোট পর্য্যন্তও একটা রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে। শেষোক্ত স্থান হইতে বরাবর উত্তর কাশীতে আসা যায় * উক্ত দুই পথের কোথায়ও চটীর বন্দোবস্ত হয় নাই। যাত্রিগণকে পথিপার্শ্বস্থ গ্রামের ধর্ম্মশালাতে বা কাহারও বাড়ীতে আশ্রয় লইতে হয়, ধরাসুর পর ব্রহ্মথাল নামক স্থানে সম্প্রতি একটা চটী বসিয়াছে। এই পথে ভাল রাস্তা তৈয়ার হওয়া সত্বেও যে চটীর বন্দোবস্ত শীঘ্র হইতেছে না তাহার কারণ এই যে তীর্থে যে সমস্ত যাত্রি আসেন তাহাদের শতকরা নব্বুই জন সাধু আর বাকী গরীব যাত্রি। প্রথমোক্ত মহাত্মারা গ্রামে ভিক্ষার দ্বারা আহারাদি করেন, আর শেষোক্তেরা গ্রামস্থ লোকের নিকট খাদ্যদ্রব্যাদি কিনিয়া লন, কিন্তু সব গ্রামে উক্ত জিনিস পাওয়া যায়, বিশেষ তরিতরকারি পাওয়া যায় না। উক্ত পথে গঙ্গানী ও খর্শালিতে ধর্ম্মশালা আছে। প্রথমোক্তটী তথাকার পাণ্ডা মহারাজের গোশালাতে পরিণত আর শেষোক্তটী মেরামতের অভাবে নষ্টপ্রায়। এই তীর্থের গরম জলের ফোয়ারা, প্রস্রবণ ও উক্ত জলে দাইল, ভাত, আলু, রুটী ইত্যাদি রন্ধন করা যায়। এই আশ্চর্য্যজনক খবর শুনিয়া অনেক যাত্রী উক্ত স্থান দেখিবার জন্য যাইতে আরম্ভ করিয়াছে, ক্রমশঃ সব স্থানে

---

* ম্যাপ দেখুন।

চটীও বসিয়া যাইবে। কোন বড় লোক যাত্রিকে যাইতে হইলে পথ চলিবার উপযোগী ছোট তাঁবু বন্দোবস্ত রাখিলে বিশেষ সুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা।

ভাটোয়ারী হইতে ত্রিযুগী নারায়ণ পর্য্যন্ত পথের বিবরণ। *

ভাটোয়ারী হইতে ত্রিযুগী নারায়ণ পর্য্যন্ত যে পথটী আছে সেইটী পাহাড়ীদের চলাচলের পথ। যে সব যাত্রী গঙ্গোত্তরী হইয়া কেদারনাথ দর্শনে আসেন তাঁহাদিগকে উক্ত পথে আসিতে হয়, ঐ পথটাতে এখন বেশী যাত্রী আসা যাওয়া করিতেছে দেখিয়া ৪।৫ মাইল অন্তর অনেক চটা বসিয়াছে। উক্ত পথে দুধ অতি বেশী পরিমাণে পাওয়া যায় ও পথের অন্য সব স্থান হইতে সস্তাও মিলে। ঐ পথটী ভাটোয়ারীর খানিক দক্ষিণ পশ্চিম স্থান হইতে গঙ্গার পুল পার হইয়া প্রায় গ্রামের মধ্য বা পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গিয়াছে। কয়েক বৎসর হইতে উক্ত রাস্তাটী ভাল করিয়া তৈয়ার করিবার ব্যবস্থা হইতেছে, জরিপাদি হইয়া গিয়াছে এরকম খবরাদি শুনা গেল।

উক্ত পথে একাকী আসিতে নাই কারণ পথ ভুল হইয়া গেলে একটু বিপদগ্রস্ত হইতে ও গণ্ডগোলে পড়িতে হয়। ঐ পথটী পাহাড়ী কুলিরা বেশ ভাল করিয়া জানে। যাহারা

* পথ ম্যাপ দেখুন।

একাকী হিমালয়ে পর্য্যটন করিতে যান তাঁহাদের ঐ প্রকার লোকের বন্দোবস্ত রাখিবার সংস্থান না থাকিলে, যাহাদের সঙ্গে পাহাড়ী কুলি আছে তাহাদের সঙ্গে যাওয়া উচিত। কিন্তু এই পথটীর প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। এই পথে বুড়া কেদার নামক স্থানে ৺বুড়া কেদারনাথ শিব ও তথা হইতে অদূরবর্ত্তী পর্ব্বত-গহ্বরে বশিষ্ঠাশ্রম প্রভৃতি আছে। কালীকম্বলী বাবা, স্বজনা-নন্দ ও রাজারাম ব্রহ্মচারীর কীর্ত্তিস্বরূপ যথাক্রমে বুড়া কেদার, রঘুনাথ বা গুপ্ত চটীতে পোঁমালিতে ও ত্রিযুগী নারায়ণে, পাঙ্গরাণা ও মঙ্গু চটীতে, এবং ছুনা চটীতে ধর্ম্মশালা ও সদাব্রত ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে। স্বজনানন্দ ব্রহ্মচারীর ধর্ম্মশালাতে কোন সদাব্রত নাই। এই পথটী পাকা তৈয়ার হইয়া গেলে সর্ব্ব সাধারণ যাত্রিদের বিশেষ সুবিধা হইবে। এই পথে কোন হিংস্র জন্তুর ভয় ইত্যাদি নাই।

পথ আবিষ্কারক।

হিমালয়ের ভিতরে যে সব তীর্থধাম আছে পূর্ব্বে ঐ সব স্থানে যাওয়া সাধারণ লোকের ঘটিয়া উঠিত না, যাহারা যাইতেন ক্বচিৎ কেহ ফিরিয়া আসিতেন। হিমালয় যাত্রা এক রকম মহা-প্রস্থানই ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যাঁহাদের বুদ্ধি কৌশলে, কষ্ট-সহিষ্ণুতায় ও দক্ষতা গুণে দিন দিন সুগম রাস্তা তৈয়ার হইয়া যাইতেছে, তাঁহাদের কার্য্যের প্রশংসা করিয়া শেষ করে

আমার এই ক্ষুদ্র লেখনী সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ। চড়াই করিতে ক্রম-উচ্চ ও উথরাইতে ক্রমনিম্ন রাস্তা পর্ব্বত গাত্র বা মধ্যদেশ দিয়া কি বিচক্ষণতার সহিত তৈয়ার করা হইয়াছে তাহা ভাবিতে গেলে কুল পাওয়া যায় না। তাঁহাদিগকে কথায় ধন্যবাদ দিয়া বা পারিশ্রমিকের পুরস্কার দিয়া বা দক্ষতার প্রশংসা করিয়া যে কেহ আপনি তৃপ্ত হইতে .পারিবেন এমত বোধ হয় না। পথ চলিবার সময় স্বয়ং কত কিছু বলিয়া ফেলিয়াছি, সহযাত্রিগণের কত ভূয়সী প্রশংসা শুনিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। সুধু পথ তৈয়ার করিবার জন্য প্রশংসা নহে পথিমধে যে সব ঝুলা বা পুল তৈয়ার করা হইয়াছে তজ্জন্যও যে কত কষ্ট পাইতে ও কত বেগ সহ্য করিতে হইয়াছে তাহাও সম্পূর্ণরূপে অতুলনীয়। পথ চলিতে চলিতে আনন্দে বিভোর হইয়া অনেক সময়ে বসিয়া পড়িতাম ও কায়মনোবাক্যে সেই সর্ব্বশক্তি-প্রদাতা মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করিতাম, প্রভু! তোমার সৃষ্টির অনন্ত চাতুর্য্য, অনন্ত মহিমা, অনন্ত কীর্ত্তিকলাপ সমস্তই অনন্ত, যে দিকে তাকাই তাহার অন্ত পাই না। প্রভু! যাঁহাদের বুদ্ধিকৌশল, কষ্টসহিষ্ণুতা ও কার্য্য-দক্ষতাগুণে আমরা এই সুযোগ ও সুবিধা প্রাপ্ত হইয়া তোমার অনন্ত কীর্ত্তিকলাপ ও শিল্পচাতুরি দেখিতে অগ্রসর হইতেছি তুমি তাহাদের অন্তরের অভ্যন্তরে যদি কোন রকমের ময়লা থাকে তাহা দুরীভূত করিয়া দিয়া চিরশান্তি ক্রোড়ে স্থান দান কর—তাঁহারাই প্রকৃত পক্ষে শান্তি প্রাপ্তির অধিকারী। যাঁহারা এই মহান কার্য্যের আবিষ্কারক তাঁহাদের এই কীর্ত্তি-

কলাপ সৃষ্টির অনন্ত সময় পর্য্যন্ত অনন্ত কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে।

গ্রামের শোচনীয় অবস্থা।

সর্ব্ব প্রথম আমি যখন হিমালয়ের অভ্যন্তরীণ গ্রামের ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতেছিলাম তখন চারিদিকের নানা রকমের ময়লা, পূতিগন্ধ, অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্নতাদি দেখিয়া মনে হইল, পুরাণাদিতে নরকের নাম শুনিয়াছিলাম আজ স্বর্গের পথে নরক দর্শন করা হইল, তাই আমি এই প্রবন্ধটীর নাম 'নরক দর্শন' করিব স্থির করিয়াছিলাম পরে আমার এক বন্ধুর অনুরোধে গ্রামের শোচনীয় অবস্থা দেওয়া হইল। গ্রামবাসীরা এত অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন যে তাহা বর্ণনাতীত। যাহারা নিজে অপরিষ্কার তাহারা কি করিয়া পরিষ্কার স্থানে বাস করিতে শিখিবে। অপরিষ্কার কিসে হয় সংক্ষেপে তাহা এখানে লিখিতে বাধ্য হইলাম। মেষ ছাগলের লাদ, গো-মহিষের গোবর, বিষ্ঠা, ভাতের ফেন ইত্যাদি যথায় তথায় পড়িয়া আছে, পাহাড়ী অঞ্চলে রৌদ্রের তাপ খুব কম কিন্তু সাধারণতঃ বৃষ্টি আকাশে মেঘ দেখিলেই হয়, তারপর ঝরণার জলের লহর গ্রামের ভিতর দিয়া বহিয়া যাইতেছে, উক্ত প্রকারের জলের দ্বারা পচিয়া এমন একটী দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে তাহা আর কি বলিব। যাহারা দেখিয়াছেন তাহারাই অনুভব করিয়াছেন। ছেলে পিলেরা যেখানে সেখানে মলমূত্রাদি

ত্যাগ করে এবং তাহা পরিষ্কার করার কোন ব্যবস্থা নাই। ঐ সব কারণেই সমস্ত গ্রামে বা চটীতে মাছি অত্যন্ত বেশী ইহা পূর্ব্বেও বর্ণনা করা হইয়াছে। গ্রামের ভিতর দিয়া যে সব স্থানে রাস্তা চলিয়া গিয়াছে তথায় নাকে কাপড় বান্ধিয়া বেগে চলিয়া যাইতে হইবে না হয় গন্ধের চোটে অন্নপ্রাশনের অন্ন পর্য্যন্তও বাহির হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। গ্রামের ভিতরস্থ রাস্তা অতিক্রম করিবার সময় সঙ্গে কর্পূর বা কোন সুগন্ধি জিনিষ রুমালাদিতে বান্ধিয়া শুকিতে শুকিতে যাওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু দূর হইতে পার্ব্বত্য গ্রামগুলির দৃশ্য অতি মনোরম বোধ হয়, কিন্তু গ্রামের ভিতর প্রবেশ মাত্রই তাহার প্রশংসা এক দমে যে কোথায় উড়িয়া যাইবে তাহার ইয়ত্তা থাকে না। দূর হইতে যে রকম সুন্দর দেখায় ভিতরে যদি তেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইত তাহা হইলে গ্রামগুলিকে স্বর্গস্থান ভিন্ন অন্য নাম বোধ হয় দেওয়া যাইতে পারিত না। বর্ত্তমান সময়ে যাহারা একটু লিখা পড়া শিখিতেছে তাহাদিগকে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নও দেখা যাইতেছে ও সেই সব দেশের অবস্থাও ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন হইতে চলিয়াছে। যে সব স্থানে সরকারি কোন কাছারি ইত্যাদি আছে তথাকার অবস্থাও তত ভাল নহে।

কন্যা বিক্রয় ও দাস প্রথা।

হিমালয় অঞ্চলে কন্যা বিক্রয় প্রথাটী সর্ব্বত্র সমান ভাবে প্রচলিত আছে। টাকা বেশী পরিমাণ পাইলে জাতি নির্ব্বিশেষে কন্যা বিক্রীত হয়। মেয়ে যত বেশী সুন্দরী হইবে. তাহার মূল্যও তত বেশী হইবে। পশ্চিম দেশীয় বণিক সম্প্রদায়ের অনেকে ঐ সব স্থান হইতে মেয়ে ক্রয় করিয়া আনিয়া বিবাহ করেন, অনেক পেন্সন প্রাপ্ত সাহেবও সুন্দরী মেয়ে ক্রয় করিয়া লইয়া আসেন। আর বর্ত্তমান সময়ে যে সব বণিকসম্প্রদায় হিমালয়ের বিভিন্ন স্থানে ব্যবসা করিতেছে তাহারা সকলেই উক্ত প্রকারে পাহাড়ী মেয়ের পাণিগ্রহণ করিয়াছে। হৃষীকেশের উত্তর পার্শ্বে যে পর্ব্বতশ্রেণী আছে তাহা লছমন ঝুলা পার হইয়া লঙ্ঘন করিয়া গেলে যে সব গ্রাম পাওয়া যায়, তথায় ৺নীলকণ্ঠেশ্বর শিবালয় আছে, তথায় মেয়ে বিক্রয় করিবার অনেক আড়কাঠী আছে। তাহারা হিমালয়ে যাত্রী-সমাগমের সময় হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থানে আসিয়া ব্যবসার বন্দোবস্তাদি করে। পূর্ব্বে সব স্থান হইতে মেয়ে ক্রয় করিয়া দেশে লইয়া আসিতে পারিত। বর্ত্তমান সময়ে টিহরি রাজ্যের এলাকাধীন গ্রামে কন্যা বিক্রয় হইতেছে বটে ও বিদেশীয়েরা ক্রয়ও করিতেছেন, তবে ক্রেতাকে সেই গ্রামে বা উক্ত রাজ্যের যে কোন স্থানে আপন পছন্দ মত স্থানে বাস করিতে হইবে এই প্রকার নিয়ম বর্ত্তমান শ্রীমান টিহরি নরেশ বাহাদুর করিয়া দিয়াছেন। হিমালয়ের ভিতর কেহ

কখনও টাকা ধার করিবার সময় আপন বিত্ত সম্পত্তির উল্লেখ-কালীন আপনার কয়টী সুন্দরী মেয়ে আছে তাহারও বিশেষ বর্ণনা করিয়া থাকেন। তবে বর্ত্তমান সময়ে যাহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বা বড় জমিদার তাহারা উক্ত প্রথার বিরোধী হইয়া উঠিতেছেন। এখানে যাহারা অন্ত্যজ জাতীয় অথচ ছেলে মেয়ে বেশী আছে রীতিমত খাইতে পরিতে দিতে পারে না, তাহারা ছেলে মেয়ে উভয়ই কোন লোকের কাছে বিক্রয় করিয়া ফেলে, তাহারা আজীবন সেই ব্যক্তির কার্য্যাদি করিয়া জীবন-পাত করিবে। যিনি একটা ছেলে ক্রয় করিলেন তিনি আর একটি মেয়ে ক্রয় করিয়া তাহার বিবাহ দিয়া সপরিবারে আপনার চিরকালের জন্য দাস করিয়া লইলেন. পূর্ব্বে এই প্রথাও অতি সাধারণ ছিল, সম্প্রতি উক্ত বিষয়ে অত্যন্ত কঠোরতা হইয়াছে। এখন প্রকাশ্য ভাবে ঐ সব কার্য্য কেহ করিতে পারেন না। এই দুইটি প্রথা বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ে অত্যন্ত নিন্দনীয়।

হিংস্র জন্তুর নিরুপদ্রব ও চুরি ডাকাতির নির্ভয়তা।

হিমালয়ের ভিতরে সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গণ্ডার, বন্য হস্তী প্রভৃতি অনেক হিংস্র জন্তু আছে বটে, তাহারা সব সময়ে গভীর অরণ্য মধ্যে থাকে। যখন শীত বেশী পরিমাণে পড়ে, বরফ জমিতে আরম্ভ হয় তখন তাহারা ঝরণার ধার দিয়া নীচে নামিয়া আসে, গ্রীষ্মপ্রধান সময়ে তাহারা প্রায় যেখানে একটু বেশী ঠাণ্ডা

অনুভব করে তথায় চলিয়া যায়। হিমালয়ে যখন দেশীয় যাত্রীরা যায় তখন গ্রীষ্মকাল তাই কোন রকমের হিংস্র জন্তু দেখা যায় না বা উপদ্রব করে না, তবে যে সব স্থানে আপাততঃ ঠাণ্ডা বোধ হয় তথায় রাত্রিকালে মাঝে মাঝে গ্রামের ভিতর বা পার্শ্বে ছোট বাঘ ও ভল্লুকের উপদ্রব শোনা যায়। তাই হিমালয়ের ভিতরে রাত্রি ভাগে চলা নিষিদ্ধ। এযাবত কোন যাত্রী ভল্লুক বা বাঘ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে এমত শোনা যায় নাই। এতদঞ্চলে চুরি ডাকাতির ভয় আদৌ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গ্রামবাসীরা অত্যন্ত ভীরুস্বভাব, শান্ত ও বিনীত। তাহাদের ভিতরে কোন রকমের মন্দবুদ্ধি নাই। যে সব স্থানে এখন দেশীয় ইতর লোকগুলির আনাগোনা হইতেছে তাহার কোন কোন স্থানে অসাবধনতার সহিত যদি কোন জিনিস পড়িয়া থাকে তবে তুলিয়া লইয়া যায়। পাহাড়িগণ প্রাণান্তেও অন্য কাহারও জিনিষ স্পর্শ করিবে না। এরকম কিম্বদন্তী আছে পাহাড়ে প্রবেশ করিবার সময় যদি কোন চটীতে বা অন্য স্থানে কেহ কোন জিনিষ ফেলিয়া যায় ফিরিয়া আসিবায় সময় ঠিক সেই অবস্থায় সেই স্থানেই পাওয়া যাইবে।

মাদকতা।

হিমালয়-বাসিগণ সব্ব সাধারণেই নেশা করিয়া থাকেন, ভাঙ্গ, চরস ও মদ্য এই তিনটীই এতদঞ্চলে প্রধান নেশা।

বর্ত্তমান সময়ে অনেক স্থানে তামাকের চাস হইতেছে। ভাঙ্গ তথাকার সাধারণ নেশা, যাহারা একটু উচ্চে উঠিয়াছেন তাহারা মদ্য ও চরস ধরিয়াছেন। আর মদ্য বড় লোকের নেশা ও সর্ব্বসাধারণের বিবাহ সাদিতে ও পর্ব্বাদি উপলক্ষে ব্যবস্থা হইয়া থাকে। কোন রকমের নেশাতে আশক্ত নহে এমন লোক অতি কষ্টে খুজিয়া পাওয়া যাইতে পারে। স্থানীয় কোন পণ্ডিত মহাশয়কে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন শীতকালে অতি মাত্রা ঠাণ্ডা অনুভূত হয় তজ্জন্য এত নেশার সেবনাধিক্য ঘটিয়াছে। প্রধানতঃ সাধারণ লোক মাত্রেই অশিক্ষিত, বেশী মাত্রা নেশা করার যে কি দোষ তাহা সহজে বুঝিতে পারে না। তাহাতে আমি বলিলাম আপনাদের দেশে শিক্ষিত লোক নাই বলিয়া আপনি এই কথা বলিয়া দোষ কাটাইতে গেলেন যে দেশের লোক বেশী ভাগে লিখা পড়া করিয়াছে তথায়ও তদ্রূপ অবস্থা দেখা যায়। তবে বর্ত্তমান সময়ে বৈজ্ঞানিক চর্চ্চার উন্নতির প্রাবল্যের সহিত সব শিথিল হইয়া যাইতেছে। তবে মোটের উপর দেখা যায় তথাকার লোকে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা ভোগ করে বলিয়া অতিরিক্ত পরিমাণ নেশা করে।

স্রোতের বেগে গম পেষা ও কাঠের জিনিস তৈয়ার করা।

জলের স্রোতের বেগে যাঁতা ঘুরাইয়া তাহাতে গম ভাঙ্গা ও স্রোতের বেগে কাঠ মসৃণ করা ও খোদিয়া কাঠের থালা, ঘটী, বাটী, কমণ্ডলু ইত্যাদি তৈয়ার করার কল বা যন্ত্র হিমালয়-বাসীর একটি প্রধান শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচায়ক। তাহারা কেহ কখন হাতে যাঁতা ঘুরাইয়া গম ভাঙ্গে না। গম ভাঙ্গার যাঁতা-খানি একটি গোল কাঠের ভিতর দিয়া একটি মোটা লৌহ দণ্ড অন্ততঃ দুই হাত নীচে ও উপরে প্রায় সেই পরিমাণ থাকে এবং যাঁতার নীচের খণ্ডের মধ্যদেশ দিয়া উপরের খণ্ডের সহিত বিশেষ ভাবে আঁটা, চতুষ্পার্শ্বে পাখা বিশিষ্ট—দেখিতে আমাদের পাড়া-গাঁয়ের চরকাতে যে সূতা কাটা হইত অনেকটা সে রকম দেখায়, তবে চরকার মধ্যস্থিত কাঠের চতুষ্পার্শ্বে যে সব পাখা আছে তাহা গোল ও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া একটার পরে অন্যটি গাথা নহে কিন্তু গম ভাঙ্গা কলের পাখার কাঁটাগুলি পাতলা ও চওড়া ও বক্রভাবে অবস্থিত। যেখানে উক্ত যন্ত্র বসান হয় তথায় উহা বেশ ঘুরিতে পারে এমত একটি গর্ত্ত খোদা হয়, তারপর জলের স্রোতটি অন্ততঃ দুই কিম্বা তিন হাত উচ্চ হইতে একটু বক্রভাবে তাহার উপর পতিত হইতে থাকে, তাহার বেগে মধ্যস্থিত পাখা বিশিষ্ট কাঠ খণ্ড ঘুরিতে আরম্ভ করে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ঐ কাঠখণ্ডের ভিতর দিয়া একটি লৌহখণ্ড আছে, সেইটি নীচে সমান পাথরের উপর

কাঠ দিয়া তাহার ভিতরে প্রবেশ করান আর উপরি ভাগে যাঁতার উপরি খণ্ডের সহিত বিশেষ ভাবে আঁটা,। বর্ত্তমান সময়ে নানা-স্থানে উহগুিং মিল হইতেছে, উক্ত মিল বায়ুর বেগের দ্বারা ঘুরে আর কথিত কল জলের স্রোতের বেগে ঘুরে, তুইটার পাখা প্রায় এক রকমই। গম ভাঙ্গা কলে ২৪ ঘণ্টায় দেড় মণ হইতে তুই মণ পর্য্যন্ত গম ভাঙ্গা হয়। পাহাড়ের ভিতরে যেখানে বড় ঝরণা আছে বা প্রায় সমস্ত নদীর ধারে উক্ত রকমের কল দেখা যায় এবং তদ্দ্বারা তাহার গম পিষিয়া আপনার খাবার উপযুক্ত করে। যাঁতার মধ্যে গম হাতে দিতে হয় না, গম দেওয়ার জন্যও খুব বড় সানাইর আকৃতি বিশিষ্ট এক বংশ নির্ম্মিত পাত্র আছে, তাহার একটিতে ১৫ সের হইতে ৩০ সের গম একেবারে দেওয়া হয়। যে দিকের মুখ ছোট সেই দিকটি ঘুর্ণায়মান যাঁতার ঠিক মধ্য স্থলে, যে স্থানে গম দেওয়ার স্থান আছে তাহার সঙ্গে লাগা থাকে ও আস্তে আস্তে গম পড়িতে থাকে। উক্ত প্রকার পাখা বিশিষ্ট কাঠে কাঠ মসৃণ ও খোদিবার যন্ত্র বসাইয়া কাঠের জিনিস তৈয়ার হইয়া থাকে। অশিক্ষিত হিমালয়বাসীর এই তুইটি কল তৈয়ার করিবার দক্ষতা সর্ব্ব সাধারণের প্রশংসনীয় ও ধন্যবাদার্হ। হিমালয়ের ভিতরে প্রবেশ করিবার পর গুলরচটী হইতে চলি-বার সময় দক্ষিণ পার্শ্বের নদীতে প্রথমতঃ গমপেষার কল দেখা যায়, কাঠের জিনিস তৈয়ার করার কল, যমুনোত্তরি, গঙ্গোত্তরি কেদারনাথ ও তুঙ্গনাথের পথে সাধারণতঃ কয়েকস্থানে আছে। সর্ব্বপ্রথমেই হিমালয়বাসীরাই ইহার আবিষ্কারক বলিয়া বোধ হয়।

রাওলসাহেব।

৺বদরিনারায়ণের মোহন্তমহারাজ ও ৺কেদারনাথের মোহন্ত-রাজ রাওলনামে অভিহিত হন। সাহেব শব্দটী যে সংযুক্ত হইয়াছে এইটী বর্ত্তমান হিন্দুস্থানের কায়দা বিশেষ, হিন্দু-স্থানের বড়লোকের উপাধির শেষে সাধারণতঃ সাহেব শব্দটী যোগ করা হয়, ইহা সম্ভ্রমসূচক। রাওলমহাশয়ও একজন বেশ প্রতিষ্ঠিতলোক তাই তাঁহার নামের শেষেও সাহেবশব্দটী সংযুক্ত হইয়াছে। তাই তিনি সর্ব্বসাধারণ মোহান্তমহারাজ বা রাওলমহারাজ না হইয়া রাওলসাহেব নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এস্থানে ক্রমশঃ বর্ত্তমান রাওলসাহেব দ্বয়ের বিশেষ পরিচয় যথাসম্ভব সংক্ষেপে বর্ণন করিতে চেষ্টা করিব। পূর্ব্বে বদরিনারায়ণের রাওল ছিলেন যোশীমঠের অধ্যক্ষ জগদগুরু শঙ্করাচার্য্য মহারাজের আসনে আসীন গিরি, পর্ব্বত ও সাগরনাম-ধেয় দণ্ডীস্বামী-মহারাজগণ। তাঁহারা বদরিকাশ্রমের রাওলও যোশীমঠে জ্যোতিষি-মঠাধীশ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য জগদ-গুরু শঙ্করাচার্য্যনামে অভিহিত হইতেন, আরমঠস্থ আনন্দ উপাধিধারি ব্রহ্মচারীগণ নারায়ণের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকি-তেন। ক্রমশঃ দণ্ডীস্বামীমহারাজগণ ভ্রষ্ট হইয়া গোসাঞিনামে অভিহিত হইতে লাগিলেন ও যথেচ্ছাচারি হইয়া উঠিলেন। তারপর ব্রহ্মচারীগণও ক্রমশঃ যুয়াখেলা ইত্যাদিতে রত হইয়া নানাবিধ অবৈধ কার্য্যাদি করিতে আরম্ভ করিলেন। এরকম

কিম্বদন্তী শোনা যায় যে সর্ব্বশেষ রাওলমহারাজ যুয়াখেলাতে বদরিকাশ্রম পণ রাখিয়াছিলেনও তাহাতে হারিয়া যান, তার পর আশ্রমের দখলদিতে নাপারিয়া পলাইয়া যান, আমার দৈনিক ডায়েরিতে আছে দেখিতে পাইবেন পূর্ব্বে গঢ়বালাধিপতির গদীকে ও ৺বদরিনারায়ণের গদী বলা হইত, এখনও তাহার কিছু প্রমাণ দেখা যায় যে বদরিনাথের দরজা খোলাও বন্ধ করার দিন গঢ়বালরাজ বা টিহরিরাজ সরকার হইতে স্থিরিকৃত হয়, তদানিন্তন টিহরিমহারাজ বদরিনারায়ণের এই দুরাবস্থা দেখিয়া শারদামঠ, গোবর্দ্ধনমঠ ও শৃঙ্গেরিমঠ হইতে দণ্ডীস্বামীরাওল চাহিয়া পাঠান ও তাঁহাদের মতামত জানিতে চাহেন। পূর্ব্বোক্ত দুই মঠ কোন জবাবই দিলেন না, শৃঙ্গেরিমঠ বলিয়া পাঠাইলেন যে এখান হইতে কেহ যাইতে প্রস্তুত নহে তবে উক্তস্থানে জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যমহারাজের জ্ঞাতিবর্গের কেহ যদি বসেন তাহাতে কোন আপত্তি নাই। তাহাই হইল। এই সম্বন্ধে আরও একটু বিশেষ বিবরণ দেওয়া দরকার। শঙ্করাচার্য্য মহারাজের জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে এযাবতও এই নিয়ম প্রচলিত আছে যে একপিতার যত পুত্রই হউক না কেন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যিনি হইবেন তিনি বিধিমত দারপরিগ্রহাদি করিয়া অগ্নিহোত্রী ক্রিয়াদ্বারা জীবন যাপন করিবেন। আর বাকীসব ব্রহ্মচারি হইয়া আজীবন ধর্ম্মচর্য্যায় অতিবাহিত করিবেন। শৃঙ্গেরিমঠ উক্ত কারণে সেই বংশের একজন ব্রহ্মচারীকে ৺বদরিনারায়ণের রাওল হইতে মত দিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে রাওলদ্বয়ের বিশেষ পরি-

চয় দিব ও বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণন করিব। বর্ত্তমান সময়ে ৺বদরি-নারায়ণের রাওলসাহেবের নাম শ্রীযুতপণ্ডিতবাসুদেব নম্বুরী তিনি জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য মহারাজের জ্ঞাতিবর্গের বংশধর ও দাক্ষিণাত্য অঞ্চলের কেরোল দেশীয় ব্রাহ্মণ। তিনি শীতের ছয়মাস যোশীমঠ নামীয় গ্রামে যেস্থানে ৺নরসিংহ দেবের মন্দির আছে তৎসংলগ্ন দ্বিতল বাড়ীতে অবস্থান করিয়া নারায়ণের অর্চ্চনা করেন ও বাকী ছয়মাস যখন বদরি নারায়ণের দরজা খোলা থাকে তখন বদরিকাশ্রমে থাকিয়া নারায়ণের সেবা পূজা-র্চ্চনাদি করিয়া থাকেন। তিনি বেশ স্থূলকায় এক চক্ষু বিশিষ্ট গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ সুন্দর সুঠাম পুরুষ ও বিদ্বান। তাঁহার চেয়ারাখানি দাম্ভিকতার দ্বিতীয় মুর্ত্তি ও শিষ্টাচার বিহীন। তিনি চিরন্তন পিতৃ-বংশীয় প্রথানুযায়ী বিধি মতে দার পরিগ্রহ করেন নাই বটে কিন্তু এক সুন্দরী পাহাড়ী ক্ষত্রিয়া রমণী তাঁহার প্রকাশ্য ভাবে রক্ষিতা স্বরূপ আছে, তাহার গর্ভে ৩।৪টী সন্তান জন্মিয়াছে। সন্তানেরা সকলে রাওল সাহেবের পুত্র বলিয়া সর্ব্ব সাধারণের স্নেহ, আদর ও ভক্তির পাত্র। রাওল সাহেবও অকৃত্রিম পুত্র স্নেহের উৎকট দৃষ্টান্তাদি সাধারণ সমক্ষে প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার ব্রাহ্মণত্বের কিছু মানহানি হয় নাই, তিনি উক্ত রক্ষিতার পক্কান্ন এমন কি জলটুকু পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না, স্বহস্তে রন্ধন কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া থাকেন। তাঁহার ব্যয় নির্ব্বাহ বদরি-নারায়ণ দেবের যে সম্পত্তি আছে তাহার আয় হইতে নির্ব্বাহ হয়, আনুমানিক দুইশত টাকা পর্য্যন্ত তিনি লইয়া থাকেন। বর্ত্তমান

সময়ে ৺নরসিংহ দেবের সংলগ্ন বাড়ীতে মনস্তুষ্টি সাধন হইতেছে না বিধায় তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে পর্ব্বত গাত্রে উত্তর দ্বারী অতিরম্য বিলাস ভবন প্রস্তুত হইতেছে। তারপর তথায় বিরাজ করিবেন। তাঁহার ঔরসজাত সন্তানগণ গদীর মালিক হইবে না, তাহার দেহান্তে আবার কেরোল দেশ হইতে এক নূতন ব্রহ্মচারী আসিয়া উক্ত স্থানে বসিবেন। বর্ত্তমান সময়ে কৈলাসকীর্ত্তি-আশ্রম নামধেয় ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীমান রামচন্দ্র নম্বুরি মহাশয় ভূতপূর্ব্ব রাওলসাহেবের উক্ত রকম পুত্র। তিনি যে প্রকার আপন বন্দোবস্তে আছেন বর্ত্তমান রাওল সাহেবের পুত্রগণকেও সেই ব্যবস্থায় থাকিতে হইবে। জনশ্রুতির মত শুনা গেল বর্ত্তমান রাওলসাহেব মহোদয় নাকি পুত্রগণের ভাবী বন্দোবস্তের জন্য উক্ত বাড়ী তৈয়ার করিতেছেন এবং অন্যান্য ব্যবস্থাদিও হইতেছে।

৺কেদারনাথের রাওল সাহেব কেবলমাত্র ৺কেদারনাথ জিউর মালিক নহেন তাঁহার তত্ত্বাবধানে ৺তুঙ্গনাথ, মধ্যমেশ্বর নাথ, কল্পেশ্বরনাথ, রুদ্রনাথ ও কেদারনাথ আদি পঞ্চ কেদারনাথ, ৺কাশী বিশ্বনাথ, কালীমঠ, উখিমঠ ও মুখীমঠ প্রভৃতির মালিক। ৺কেদার-নাথের মোহন্ত মহারাজ বা রাওল সাহেব মাদ্রাজের অন্তর্গত তাঞ্জোর প্রদেশস্থ লিঙ্গায়েত জঙ্গম গোসাঞি। তাঁহারা সাধারণতঃ একটী শিবলিঙ্গ কণ্ঠায় ধারণ, শিবার্চ্চনা ও তন্নির্ম্মাল্যাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন। সকলেই রীতিমত সন্ন্যাস গ্রহণান্তে শিবার্চ্চনাদিতে ব্রতী হন ও সমস্ত ক্রিয়াদি সন্ন্যাসী মতে সম্পন্ন হয়। বর্ত্তমান

রাওল সাহেব শ্রীযুত বিশ্বলিঙ্গ মহারাজ ঐ বংশোদ্ভব, বিদ্বান, বিনয়ী, অতিথিপরায়ণ ও সাধু মহাত্মার সৎকারাদি করিয়া থাকেন। এই রাওল সাহেবের পদ পাইবার একটী বিশেষত্ব আছে। জঙ্গম গোসাঞিগণ তীর্থপর্য্যটন করিতে করিতে এস্থানে উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে প্রথমতঃ চেলারমত গ্রহণ করিয়া শিবার্চ্চনা কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়, তার পর যিনি বিশেষ উপযুক্ত হইয়া উঠিবেন সাময়িক রাওলসাহেব তাহাকে ভাবী রাওল বলিয়া ঘোষণা করিবেন, বর্ত্তমান সময়ে সমস্ত বিপরীত ভাব অবলম্বন করিয়াছে। রাওলসাহেবগণ বিবাহ করেন না কারণ তাহাতে সন্ন্যাসের অবমাননা হইবে, তবে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য রক্ষিতাগ্রহণ করিতেছেন। শ্রীমানবিশ্বলিঙ্গ রাওলসাহেবের গৃহীত রক্ষিতার দুইটী ছেলে আছে তাহারাও বদরিনারায়ণের রাওলপুত্রের মত সর্ব্বত্র সমান আদর সম্মানও স্নেহাদি পাইতেছে, আর রাওলসাহেব মহারাজের চেলাগণ কেহ একটী রক্ষিতা কেহবা একাধিক রক্ষিতা গ্রহনান্তে রীতিমত সন্তানাদি উৎপাদন করিতেছেন, কাহারও বা ৪। ৫টী ছেলে-পিলে হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে যিনি উপযুক্ত হইবেন তিনিই রাওল হইবেন। তবে রাওলপুত্র বা চেলাপুত্র কেহ মঠের মালিক হইতে পারিবেন না। বর্ত্তমান সময়ে রাওল বা চেলারাওল সকলেই স্ব-স্বপুত্র কন্যাগণের জন্য বিত্ত সম্পত্তি যোগাড় করিতেছেন। গঙ্গোত্তরি বা যমুনোত্তরিতে কোন রাওল নাই তথায় রাজ-

পুরোহিতেরাই প্রধানরূপে কার্য্যাদি সম্প্যাদন করিয়া থাকেন এস্থলে রাওলসাহেব মহোদয়গণের ব্যক্তিগত চরিত্রের ও ব্যবহারাদির আলোচনা করার প্রধান কারণ এই যে তীর্থস্থানের দুরবস্থা গুলির প্রধান কারণ নিরাকরণ করা, যখন সন্ন্যাসী রাওল ছিলেন তখন ঐসকল স্থানের কোন দুর্দ্দশা ছিলনা বর্ত্তমান সময়ে ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী নামধারী গৃহস্থরাওলগণ তীর্থস্থানের উন্নতিরদিকে চেষ্ঠা বা যত্ন করিতে সময় পাইতেছেন না, কারণ তাহাদের প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা ইত্যাদি এখন আর দেবার্চ্চনারদিকে নাই, সম্পূর্ণ বিপরীতগামী হইয়া স্ত্রীপুত্রগণের মনস্তুষ্টি সাধনে ব্যাপৃত হইয়াগিয়াছে ও তজ্জন্য স্বার্থ বা টাকা পয়সার দিকে ঝুকিয়া পড়িয়াছে। কবে যে ধর্ম্মপ্রাণ পাঠক-পাঠিকাগণ এই দুরপনেয় কলঙ্কের উম্মোচনে ব্রতী হইবেন তাহা মঙ্গলময় ভগবানই জানেন। কেহ যদি প্রতিকারে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে চাহেন এই হতভাগ্য লেখক কার্য্য সাধন করিবার সমস্ত উপায় বলিয়া দিতে পারিবে।

উত্তরকাশীধামে লাটস্বামী, সাধুস্থবাদার, কুষ্ঠাশ্রম ও দেবদাসী।

উত্তরকাশীধাম হিমালয়ের ভিতরে অবস্থিত। হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশ হইয়া ইহার দুরত্ব ১২৫ মাইল আর রেলপথে দেরাদুন, তথা হইতে মসূরি হইয়া, সর্ব্বসমেত ১৩০ মাইল। এই স্থানটী নাতি-শীতোষ্ণ। শীতকালে শীত অত্যন্তবেশী, গ্রীষ্মও বর্ষাকালে অনেকটা বাঙ্গলা দেশের মত। ইহা টিহরিমহারাজবাহাদুরের অধীন একটী মহকুমা (বিশেষ বিবরণ ডায়েরিতে দেখুন) এইস্থানে টিহরি মহারাজবাহাদুরের সনন্দ প্রাপ্ত লাটস্বামী, সাধুস্থবাদার ও প্রতিষ্ঠিত কুষ্ঠাশ্রম আছে। লাটস্বামী ও সাধুস্থবাদার এইদুইটি কথা শুনিতে সম্পূর্ণ নূতন বটে কিন্তু তাহাদের কার্য্যের বিশেষ দায়িত্ব আছে। বর্ত্তমান সময়ে উত্তরকাশীধামে অনেক সাধুমহাত্মা আশ্রমাদি করিয়া সাধন ভজনে রত আছেন। তাহাদের যাহাতে কোন রকমের অসুবিধা না হয় লাটস্বামী-মহারাজ ও সাধুস্থবাদার তাহার সুবন্দোবস্ত করিবেন। কোন সাধুমহাত্মা পীড়িত হইলে তাঁহারা তাহার তত্বাবধান করিবেন, কাহারও দেহান্ত হইলে তাঁহারা তাহার বিধিমত সমাধি দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন সর্ব্বপ্রকারের অভাব বা অভিযোগাদির মীমাংসা তাঁহাদিগকে করিতে হয়। উক্তধামের বর্ত্তমান লাটস্বামী শ্রী১০৮ শ্রীমৎ বিশ্বেশ্বরানন্দ-তীর্থস্বামীমহারাজ বেশ বিচক্ষণ বুদ্ধি সম্পন্ন, বিদ্বান ও কার্য্যদক্ষমহাত্মা। তাঁহার সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার প্রশংস-

নীয় । তিনি শ্রীমৎ সজ্জনানন্দব্রহ্মচারী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম-শালাস্থ ছত্রের একটী ঘরে অবস্থিতি করেন। উক্তধামে সাধু-সুবাদার শ্রীমৎ পরমহংসস্বামীসম্পদ্‌গিরিজিউ মহারাজ (সর্ব্ব-সাধারণে নাগাজিমহারাজ নামে খ্যাত) তাঁহার প্রধানকার্য্য উক্তধামে যে সব সাধুমহাত্মা বাস করিতে আসেন তাঁহারা প্রকৃত সাধু কিনা তাহা তত্ত্বাবধান করিবেন। ভণ্ড বা ভেক-ধারি যদি কেহ আসে তিনি তাহাকে উক্তধামে আশ্রয় গ্রহণ করিতে দিবেন না। সাধুমহাত্মার প্রতি যদি কেহ দুর্ব্যবহার করে তিনি তাহার প্রতিবিধান করিয়া থাকেন। তিনি বেশ সাধন ভজনশীল বৃদ্ধমহাত্মা ও টিহরিরাজ দরবার হইতে সমন্দ প্রাপ্ত। উক্তধামে এই দুইজন মহাত্মার প্রযত্নে কোন সাধু-মহাত্মার কোন প্রকারের কষ্ট হয় না, তাঁহারা সাধন-পরায়ণ সাধুমহাত্মাদের জন্য সর্ব্বপ্রকারের সুবন্দোবস্ত করিয়া থাকেন।

উক্ত কাশীধামের যেস্থানে জ্ঞানসু বা জ্ঞানবাপীকুণ্ড আছে তথা হইতে পোয়া মাইল পশ্চিমধারে গঙ্গার উত্তরপারে টিহরিমহারাজ বাহাদুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কুষ্ঠাশ্রম। সম্প্রতি হিমালয় অঞ্চলে কুষ্ঠব্যাধি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কুষ্ঠ-ব্যাধি হওয়ার কারণ একমাত্র অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্নতা (*) মহা-রাজ বাহাদুর উক্ত আশ্রমের জন্য সুনিপুণ চিকিৎসক, তত্ত্বাবধায়ক

(*) পূর্ব্বে হিমালয়বাসী কাহারও কুষ্ঠ রোগ হইলে তাহাকে মহাপাপী বিবেচনায় সকলেই ত্যাগ করিত। আর সেই ব্যক্তি আপন প্রাণ জলন্ত আগুণে আহুতি দিয়া পরি-তৃপ্ত হইত।

ও সেবা শুশ্রূষাকারী লোক নিযুক্ত করিয়াছেন। কয়জন চাপরাশি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে চিকিৎসার্থ তথায় লইয়া আসে। চিকিৎসক ডাক্তার শ্রীমান মুন্সীরামজিউ তত্ত্বাবধায়ক মহকুমার ভারপ্রাপ্ত শ্রীযুত পণ্ডিত মহেশানন্দজি বেশ তৎপরতার সহিত কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিতেছেন। অনেক কুষ্ঠ রোগী রোগমুক্ত হইয়া দুই হাত তুলিয়া মহারাজা বাহাদুরকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে স্ব স্ব বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতেছে, শ্রীমান মহারাজা বাহাদুর তজ্জন্য অত্যন্ত ধন্যবাদার্হ। কেহ যদি উক্ত আশ্রম দেখিতে চান তাহাকে ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া সব খবর জানিয়া লইতে হয়।

ভারতের প্রায় সমস্ত বিশিষ্ট দেবালয়ের মত উত্তর কাশী-ধামে পরশুরাম দেবের মন্দিরেও দেবদাসী আছে। কিন্তু এ স্থানের দেব দাসীকে দেবালয় কার্য্য করিতে দেওয়া যে কিছুতেই সঙ্গত নহে তাহা বর্ণন করিবার ইচ্ছায় ইহা লিখিতে আরম্ভ করিলাম। পূর্ব্বে দেবদাসীরা সকলেই বিশুদ্ধ স্বভাবা ও চরিত্রবতী হইত ও দেবালয়ের পূজার্চ্চনা ব্যতীত সমস্ত কার্য্য তাহারাই সম্পন্ন করিত এবং সদা সর্ব্বদা দেবতার প্রসাদ গ্রহণকরিয়া চির-কুমারী হইয়া সাধন ভজন দ্বারা কালযাপন করিত, এখন সমস্ত তদ্বিপরীত হইয়াছে। সাধন ভজন কাহাকে বলে তাহাত আদৌ জানে না সাধারণ বারাঙ্গনাদের সহিত তাহাদের কোন পার্থক্য নাই। যত রকমের জঘন্য কার্য্য করিতে হয় তাহাই করিতেছে। এ অবস্থা এখন সর্ব্বত্রেই একরূপ হইতে চলিয়াছি, ধর্ম্মপ্রাণ জন-

সাধারণের এইসমস্ত কলঙ্ক দূর করিবার প্রবল ইচ্ছা কখন যে কার্য্যে পরিণত হইতে দেখিব তাহা সর্ব্বমঙ্গলনিয়ন্তারই ইচ্ছা।

গলগণ্ডরোগ।

হিমালয় পর্ব্বতের ভিতরে ভ্রমণ কালীন গঙ্গা ও যমুনার উপত্যকা ভূমিতেও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে প্রায় অনেককেই গলগণ্ড রোগাক্রান্ত দেখা গিয়াছে। উত্তর-কাশীতে অবস্থিতি কালীন তথাকার হস্পিটাল এসিষ্টাণ্ট-ডাক্তার শ্রীযুতমুন্সীরামজিউ প্রমুখাৎ শোনা গেল উক্তরোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে ও বেশী লোকের মধ্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তজ্জন্য বর্ত্তমান টিহরিমহারাজ-বাহাদুর ও যাহাতে উক্তরোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ সহজে আরোগ্য লাভ করিতে পারে তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন ও নানাস্থান হইতে তৎপ্রতী-কার উপযোগী ঔষধাদি সংগ্রহ করাইতেছেন। উক্তরোগটী দেশের মধ্যে যেসকল স্থান বেশী সেঁথসেঁথে তথায় অধিক পরি-মাণে দেখা যায়। আর তাহাই যদি কারণ হয় তাহা হইলে হিমালয়ের অভ্যন্তরস্থ প্রদেশ সদাসর্ব্বদা উক্ত-অবস্থাপন্ন, তদু-পরি তাহাদের অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নতা তাহার বিশেষ সাহায্য করিতেছে।

কালীকম্বলীবাবা।

কালীকম্বলীবাবার প্রকৃত নাম শ্রী১০৮ শ্রীমৎপরমহংস বিশুদ্ধানন্দস্বামী। তিনি সদাসর্ব্বদা হৃষীকেশের তপোবনে বসিয়া সাধন ভজন করিতেন। সকল সময়ে একখানি কাল-কম্বল গায়ে দিয়া বসিয়া থাকিতেন বলিয়া সর্ব্বসাধারণে বাবা-কালীকম্বলীওয়ালে বা কালীকম্বলীবাবা নামে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। পূর্ব্বে হিমালয়ের ভিতরে তীর্থাদি দর্শন করিতে গেলে সকলকেই পাহাড়ী লোক বা সাধুসন্ন্যাসীর সঙ্গে যাইতে হইত। বর্ত্তমান সময়ে হৃষীকেশ হইতে যে সমস্ত রাস্তা, পথিপার্শ্বস্থ চটী, স্থানে স্থানে জলসত্র ও অন্নসত্র, ধর্ম্মশালা ঔষধালয়, পুস্তকালয় ও সাধু অভ্যাগতের জন্য সদাব্রত ইত্যাদির বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহা সমস্তই কালীকম্বলীবাবার কীর্ত্তি বিশেষ। তিনি যখন হৃষীকেশের তপোবনে তপস্যায় রত ছিলেন সেই সময়ে কলিকাতা বড়বাজারের মাড়োয়ারি বণিক শ্রেষ্ঠরায়বাহাদুর শ্রীমান শেঠ সূরজমলশিবপ্রসাদ-ঝুনঝুনওয়ালা তাঁহার বৃদ্ধ, মাতাঠাকুরাণীকে হইয়া বদরিকাশ্রমতীর্থ দর্শনাভিলাষী হইয়া তথায় উপস্থিত হন। একদা তপোবনে বেড়াইতে বেড়াইতে কালীকম্বলীবাবার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলেন যে মহারাজ সেবকাধমকে অনুমতি করুন যে এদেহের দ্বারা আপনার কি সেবা হইতে পারে? এইরকম দুই তিন বার জিজ্ঞাসা করিবার পর তিনি উত্তর করিলেন যে আমার এখন

কিছু অভাব বা দরকার দেখিতেছি না। তোমার এইভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে তুমি একজন ধর্ম্মশীলমহাত্মা ও কোন একটী বিশেষ সৎকার্য্য করিবার জন্য বার বার আমার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছ। হৃষীকেশক্ষেত্রে অনেক সাধুমহাত্মা আপনাপন সাধন ভজনে রত আছেন তাহাদের আহারাদির কোন বন্দোবস্ত নাই আমার বোধ হইতেছে তুমি ভগবৎ আদিষ্ট ও প্রেরিত হইয়া এস্থানে সেই সৎকার্য্যটী কি ও কিরূপে সম্পাদিত হইবে তজ্জন্য আমার নিকটে আসিয়া আমার অনুমতি ও সাহায্য প্রার্থনা করিতেছ। কাল প্রভাবে বর্ত্তমান সময়ে এমন দুরাবস্থা উপস্থিত হইয়া পড়িয়াছে যে এখন কেহ সাধুমহাত্মাগণ যে কিকষ্টে কাল যাপন করিতেছেন তাহার দিকে লক্ষ্যও রাখেন না। এতকাল পরে বুঝি ভগবান তাঁহাদের প্রতি কৃপা-দৃষ্টি করিলেন ও তোমাকে এস্থানে প্রেরণ করিয়াছেন। আমিও ভগবৎ আদিষ্ট হইয়া এই অনুমতি করিতেছি যে যাহাতে হৃষীকেশস্থ সাধুমহাত্মাগণ সুখে স্বচ্ছন্দে সাধন-ভজন করিতে পারেন তাহার উপায় কর। তাঁহার আদেশক্রমে মহাত্মাসূরজমলও ধর্ম্মশালা স্থাপন ও তদনুযায়ী সমস্ত ব্যবস্থাদি করিলেন। (*) তদনন্তর তিনি উক্তশেঠ প্রবরসহ উত্তরাখণ্ডের সমস্ত প্রধানতীর্থ স্থানগুলি পর্য্যটন করেন ও যে যে স্থানে যে যে রকম ব্যবস্থা করা দরকার

(*) দৈনিক ডায়েরিতে হৃষীকেশের বিবরণী পাঠ করুন।

তাহার পত্তন করিয়া আসেন। তাঁহার প্রত্যাগমনের পর হইতে তাহারই নামেও উক্তশেঠপ্রবরের চেষ্টা ও যত্নে সকলস্থানে ও ভারতের বিভিন্ন স্থানের ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মাগণ, ধর্ম্মশালা, অন্নসত্র, সদাব্রত, জলসত্র ইত্যাদি স্থাপিত করিয়াছেন ও সর্ব্বত্র সুগম রাস্তা ইত্যাদি তৈয়ার হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে হিমালয়ের ভিতরে ওপথে সত্যনারায়ণ, হৃষীকেশ, লছমনঝুলা, ব্যাসঘাট, দেবপ্রয়াগ, শ্রীনগর, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, লামগড় বদরিকাশ্রম, তুঙ্গনাথ, উখিমঠ, ত্রিযুগীনারায়ণ, কেদারনাথ, বুড়াকেদার, গঙ্গোত্তরি, উত্তরকাশী, ডুণ্ডা, ছাম, নগুনা ভাটোয়ারী, ধরাসু, খর্শালী, ভাড়লান, কানাতাল, ধনোটী প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্মশালা সদাব্রত ইত্যাদি স্থাপিত ও বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। সমস্ত ধর্ম্মশালাতে লেখা আছে কালীকম্বলীবাবার আজ্ঞানুসারে অমুকশেঠ দ্বারা স্থাপিত ইত্যাদি। ইতিপূর্ব্বে অনেক মহাত্মা হিমালয় দর্শন করিতে গিয়াছেন বটে কিন্তু কালীকম্বলীবাবার মত এরূপ অদ্ভুতকীর্ত্তি কেহ স্থাপন করিয়া আসেন নাই। তাঁহার ঐ সমস্তকীর্ত্তি কলাপ অনন্তকাল পর্য্যন্ত তাঁহার নাম সর্ব্বসাধারণে স্মরণ করাইয়া দিবে ও সর্ব্বসাধারণে আদর্শ স্বরূপ থাকিয়া সকলকে উক্তপথে টানিয়া লইবে ও সৎপথে মতিগতি প্রদান করিবে। আজ কয়েক বৎসর হইতে তাহাও কার্য্যে পরিণত হইতেছে, যথা শ্রীমৎ রাজারাম ব্রহ্মচারীজিউর প্রযত্নে রাজপুতনা জয়পুরের মহারাণী উত্তরকাশীতে ও ধরালীতে, পিলিভিতের শেঠেরা গঙ্গানন্দী ও ছুনাচটীতে ধর্ম্মশালা ও সদাব্রতের ব্যবস্থা করিয়াছেন, শ্রীমৎ সজ্জনানন্দব্রহ্মচারিজিউর চেষ্টায় উত্তরকাশী, মানেরী, লোহারিনাগপাঙ্গরাণা, মঙ্গুচটী প্রভৃতিস্থানে ধর্ম্মশালা স্থাপিত হইয়াছে।

সূরজমল।

সূরজমলের পূর্ণনাম রায়বাহাদুর শ্রীমান শেঠসূরজমল-শিবপ্রসাদঝুনঝুনওয়ালা। তিনি কলিকাতা বড়বাজারের মাড়োয়ারি বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং বিপুল বিত্ত ও ঐশ্বর্য্যের অধিকারী এবং অনেক মাড়োয়ারি সভাসমিতির সভাপতি হিমালয়ের ভিতরে কালীকম্বলীবাবার নামীয় যে সমস্ত ধর্ম্মশালা, অন্নসত্র জলসত্র, ঔষধালয়ও দেশের মধ্যে কাশীক্ষেত্রে, গয়াধামে, প্রয়াগ, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, কলখল প্রভৃতিস্থানে যে সকল ধর্ম্মশালা ও অন্নসত্র আছে ও ঐ সমস্তের কার্য্যাদি নির্ব্বাহের জন্য যে সমিতি আছে তিনি তাহার সভাপতি ও প্রধান অধ্যক্ষ এবং তাঁহারই তত্ত্বাবধানে ঐসব-স্থানের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে। এতন্মধ্যে হরিদ্বার ও হৃষীকেশ-ধামে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মশালা ও ৺সত্যনারায়ণদেবের মন্দিরে পর সাউঙ্গনদীর উপর লৌহসেতু এবং লছমনঝুলা তাঁহার কীর্ত্তি অনন্তকাল ঘোষণা করিবে। তাঁহার মাতৃভক্তি অতীব প্রশংসনীয়। তাঁহার উত্তরাখণ্ডে যাত্রাকালীন তাঁহার রত্নাগর্ভা-মাতাঠাকুরাণীর আদেশক্রমে সাউঙ্গনদীর উপর পুলও লছমনঝুলা তৈয়ার করিয়াছিলেন, শ্রীমৎ কালীকম্বলীবাবার জীবনবৃত্তান্তেও হরিদ্বার হৃষীকেষের ও লছমনঝুলার বর্ণনে তাঁহার অনেক কীর্ত্তিকলাপ বর্ণিত হইয়াছে (*) এখানে দ্বিরুক্তি জনিত দোষ পড়িবে বিধায় আর অগ্রসর হইলাম না। পরিশেষে সর্ব্বমঙ্গলময় ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা যে তিনি যেন অনন্তকাল পর্য্যন্ত অনন্তধামে বাস করিয়া কৃতকৃতার্থ হন।

হরি ওঁ শান্তিঃ।

(*) ডায়েরিতে উক্তকথিত স্থানের বর্ণনা পাঠ করুন।